এক্ষণ ॥ শারদীয় সংখ্যা ॥ ১৩৭৬

756·3
004/6

এক্ষণ

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক

সম্পাদক শৈলেন চট্টোপাধ্যায়
নির্মাল্য আচার্য

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

মুক্তি আসন্ন

সত্যজিৎ রায়ের ছবি

অরণ্যের দিনরাত্রি

মূল কাহিনী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রযোজনা নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত

প্রিয়া ফিল্মস্ নিবেদিত

বিশ্ব পরিবেশনা পিয়ালী ফিল্মস্

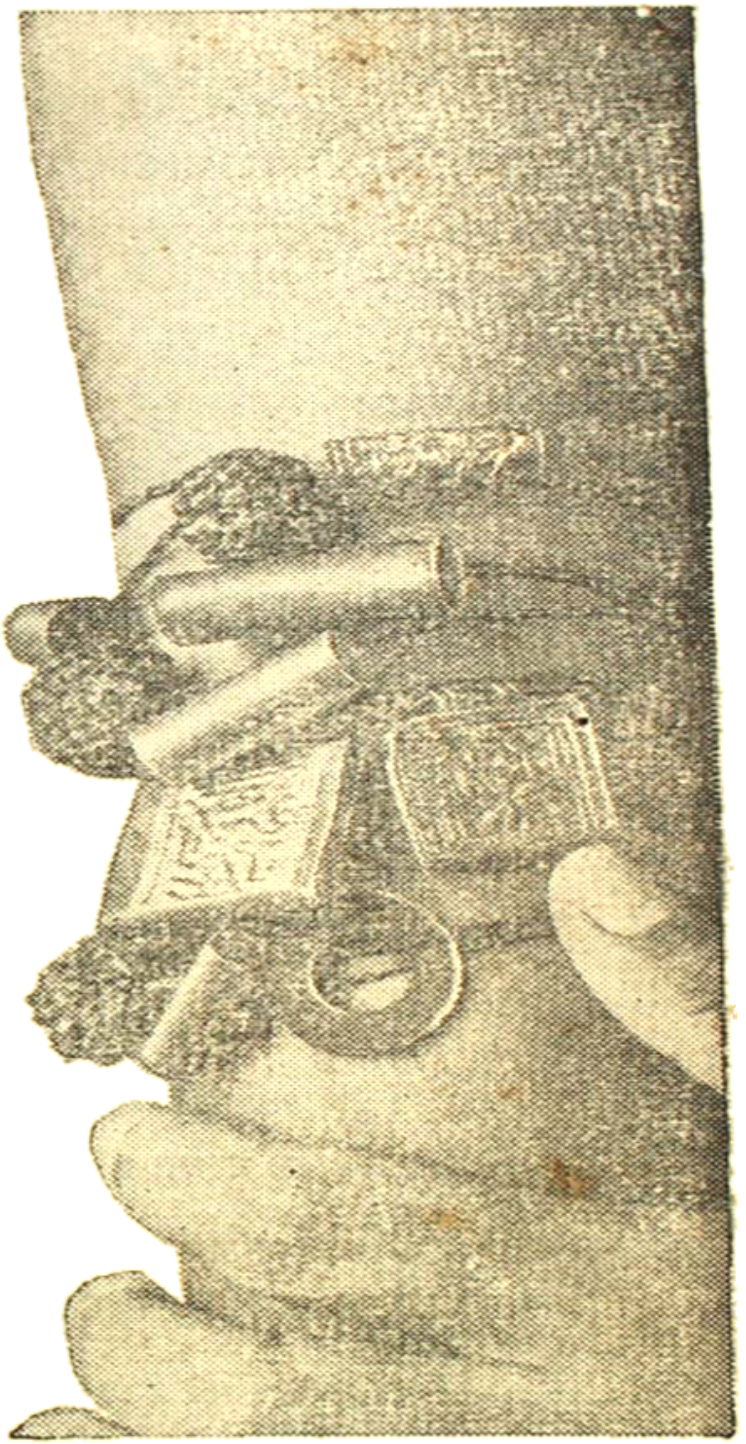

ভেল্‌কির যুগ কবে পার হয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি চিকিৎসার জগতে এনেছে বিপ্লব, দিয়েছে সুস্থ আর নীরোগ থাকার আশ্বাস। শারীরিক সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্য দেশে বিদেশে পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই তৎপরতা মানুষের ভবিষ্যৎকে আরো নিশ্চিন্ত ও আনন্দময় করে তুলবে।

ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড কলিকাতা ১৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

এখন অনেক বেশী লোক পড়ছেন

বর্তমানে প্রচার-সংখ্যা ১২,০০০

বিক্রয়-সংখ্যা

প্রতি সপ্তাহে

অগস্ট, ১৯৬৬

অগস্ট, ১৯৬৭*

অগস্ট, ১৯৬৮

অগস্ট, ১৯৬৯*

(* যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে)

আপনিও নিয়মিত পড়ুন

প্রতি সংখ্যা ঃ দশ পয়সা

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দেওয়া হচ্ছে

বিজ্ঞাপন প্রচারের একটি উপযুক্ত মাধ্যম 'পশ্চিমবঙ্গ'

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন

বা যোগাযোগ করুন :

বিজনেস ম্যানেজার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ,

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা ১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ২৯৪৫/সা. ৬৯

পূজোয়

অথবা যেকোন দিন

তৃপ্তিতে সিজার্স তুলনাহীন

দুটি বা তিনটি সন্তানের পরিবার গড়ে তুলুন
দুটি সন্তানের মধ্যে তিন-চার বছরের ব্যবধান রাখুন

পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে গিয়ে
বিনামূল্যে চিকিৎসকের
পরামর্শ গ্রহণ করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

ব্রুক বণ্ড
তাজমহল
বাজারের সেরা CTC চা

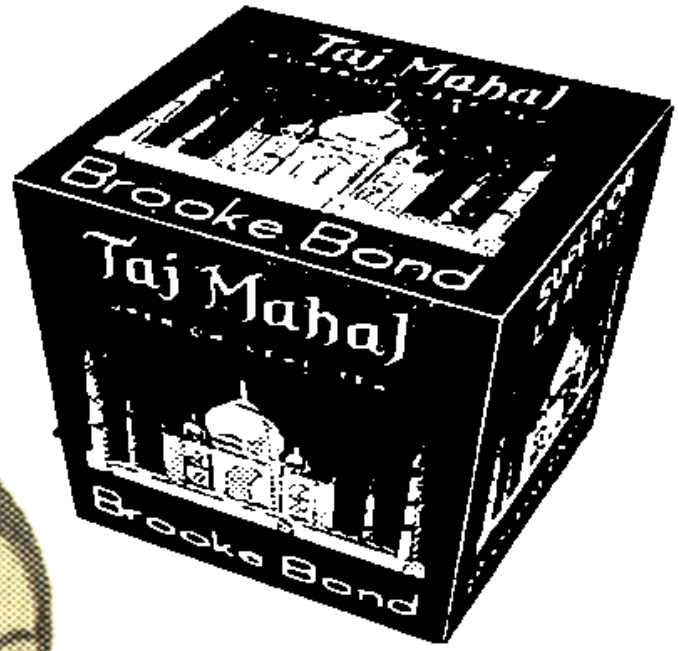

অপূর্ব স্বাদ, সুন্দর গন্ধ,
চমৎকার লিকার,
খেয়ে ও খাইয়ে সমান তৃপ্তি

BB 4871A

Allied Resins & Chemicals Limited

Registered Office
10/1, ELGIN ROAD, CALCUTTA-20
Phone : 44-0747

Head Office
13, CAMAC STREET, CALCUTTA-17
Phone : 44-7671 (4 lines)

Manufacturers of :

Formaldehyde, Paraformaldehyde, Pentaerythritol, Hexamine, Urea Formaldehyde Resin, Phenol Formaldehyde, Melamine Formaldehyde, Resorcinol Formaldehyde, Epoxy Resin and Synthetic Tanning Agent.

Unit No. 1 : 47, Hyde Road Extension, Calcutta-27.
Phone : 45-4751-52

Unit No. 2 : Rampur (On Budge Budge Trunk Road).
Phone : 45-5364

Unit No. 3 : Bulk Oil Storage Installation, Budge Budge.
Phone : BU-269

চুলের সৌন্দর্য
কতদিন ?

মাথাভর্তি সুন্দর চুলের অধিকারী হতে সকলেই চান।
কিন্তু চুলের সেই সহজাত সৌন্দর্য বেশীদিন ধরে
রাখতে পারেন ক'জন ? অযত্ন আর অবহেলার ফলে
চুলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ক্রমশঃ ম্লান হয়ে যায়।

অথচ সামান্য যত্ন নিলেই চুলের স্বাস্থ্য আর শ্রী
বেশীদিন স্থায়ী হয়। জবাকুসুম ব্যবহারে চুলের
সহজাত সৌন্দর্য শুধু পূর্ণ বিকাশই লাভ করেনা,
সেই সঙ্গে তার স্থায়ীত্বও বর্দ্ধিত হয়।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস - কলিকাতা-১২

ত্রিপুরার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।
ভারতের অন্যতম প্রাচীন রাজ্য ত্রিপুরা আধুনিকতা ও সমৃদ্ধির
পথে দেশের তালে এগিয়ে চলেছে।
ত্রিপুরার 'রুদ্রসাগর হ্রদ' 'ডুম্বুর জলপ্রপাত'
'উনকোটি পাহাড়' বা 'জম্পুই পাহাড়' দেখলে বেশ
আনন্দ পাবেন। আপনার অর্থব্যয় সার্থক হবে।

ত্রিপুরায় আসুন

দেশের ও একালের ত্রিপুরা দেখুন

প্রচার বিভাগ : ত্রিপুরা সরকার

ছোটদের জুতো চাই আজীবন খুশি পায়ে চলতে

বাটার ছোটদের জুতো বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি। এমনই এদের নকশা ও নির্মাণ-বৈশিষ্ট্য যে দুটিতে চলতে অবাধ সহজ। সামনে আঙুল মেলার যথেষ্ট জায়গা, বাঁকানো গোড়ালির গড়ন, আর এমন জুতোর তলি যা অনায়াসে পা সঞ্চালনের সহায়ক। টুকটুকে রঙ, ঝলমলে নকশা, আর আরামে পায়না জুড়ি—এমন জুতোই এখন চলছে বাটার দোকানে। আজই নিয়ে আসুন আপনার বাচ্চাদের, এদের খুশি পায়ে শুধু হোক শরতের শোভাযাত্রা।

Bata

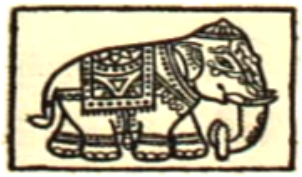

"Self-reliance would build up an independent, swadeshi economy and give us the necessary prestige, pride and power."

Lal Bahadur Shastri

IPL/31/69

First to establish an automobile factory—1942

First to put on road a car partially manufactured in India—1949

First to achieve production of over 20,000 vehicles annually—1964

First to produce the 200,000th vehicle—1967

First to achieve 99% indigenous content in motor cars—1968

FIRST EVEN TODAY

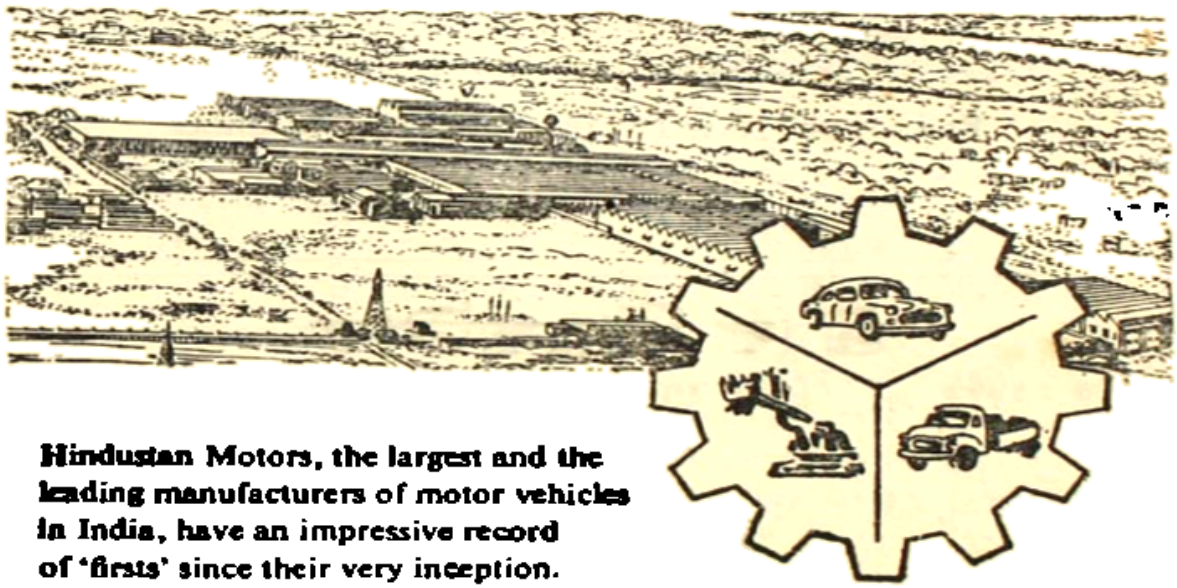

Hindustan Motors, the largest and the leading manufacturers of motor vehicles in India, have an impressive record of 'firsts' since their very inception.

Even today they maintain the lead, not only in production, but also in diversifying their activities, generating employment, boosting the development of raw material production and ancillary and allied industries.

Hindustan Motors are confident of maintaining this unbeaten lead.

HM **HINDUSTAN MOTORS LIMITED, CALCUTTA**

ASP/HM. 4/68

With compliments from

MERCURY TRAVELS (INDIA) LIMITED

HOTEL OBEROI GRAND, CALCUTTA-13

BRANCHES : NEW DELHI – BOMBAY – MADRAS

ষ্টার থিয়েটার

স্থাপিত : ১৮৮৩ [শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা] ফোন : ৫৫-১১৩৯

নূতন নাটক

শর্মিলা

অভিনব সৃষ্টির অপূর্ব রূপায়ণ।

॥ রচনা ও পরিচালনা ॥

দেবনারায়ণ গুপ্ত

দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু **সুর : কালিপদ সেন**

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায়

প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়

॥ রূপায়ণে ॥

অজিত বন্দ্যো ॥ অপর্ণা দেবী ॥ শুভেন্দু চট্টো ॥ নীলিমা দাস ॥ সুব্রতা চট্টো ॥ সতীন্দ্র ভট্টা ॥ গীতা দে ॥ জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ শ্যাম লাহা ॥ প্রেমাংশু বোস ॥ শৈলেন মুখো ॥ শিবেন বন্দ্যো ॥ অশোক দাশগুপ্তা ॥ আশা দেবী ॥ পঞ্চানন ॥ সুখেন দাস ॥ তাপস চট্টো ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

এই তব
শুভ আশীর্বাদ !

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে গান্ধিজী কথাপ্রসঙ্গে প্রিয় শিষ্য শ্রীসতীশ দাশগুপ্তকে বলেছিলেন, তাঁর বড় ইচ্ছে যে একটি সত্যিকারের ভালো স্বদেশী কালি তৈরী হয়। দেশের মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত দুই তরুণ "মৈত্র" ভ্রাতা তখন সবে জেল থেকে বেরিয়েছেন। সতীশ বাবু তাঁদের দুজনকে ডেকে এই মহৎ কাজের ভার দেন। সহায় সম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই, তবু শুধু নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম সম্বল করেই তাঁরা দুজন এই দুঃসাধ্য ব্রতের ভার মাথায় তুলে নেন। আজকের বিশ্ববিখ্যাত সুলেখা ফাউন্টেন পেন কালির এই হল গোড়ার কথা।

সুলেখার আজ যে এই সুনাম ও সমাদর, এটা গ'ড়ে উঠতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে নিরলস গবেষণা, কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং জন-সাধারণের শুভেচ্ছা ও সমর্থনে এই বিপুল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

যাঁর প্রেরণা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু, সেই জাতির জনকের পুণ্য জন্মশতবর্ষে, তাঁর উদ্দেশ্যে বিনত নমস্কারে নিবেদন করি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

Progressive/WB-8

MUKAND
IS
STEEL

HEAD THE FASHION PARADE IN

menora

KNITWEAR

Be fashion-wise this season and every season in Menora Knitwear. Take your pick of the latest styles in cardigans, pullovers and slip-overs made from the finest wool and nylon. Head for your nearest Menora dealer and head the fashion parade.

menora

knitwear for all the family

Menora Hosiery Works Pvt. Ltd.
75 Nehru Road, Bombay 57.

With Compliments of

STADMED PRIVATE LIMITED
CALCUTTA 20

শারদীয়ার অভিনন্দন

অমৃতবাজার পত্রিকা
যুগান্তর
অমৃত

রূপে যেমন গুনে তেমন- জগৎজোড়া খ্যাতি

র‍্যালে ভারতের সবচেয়ে প্রিয় সাইকেল

গড়নে যেমন সুন্দর, কাজেও তেমনি শক্ত-সমর্থ। র‍্যালে ভারতের সবচেয়ে প্রিয় সাইকেল। সেন-র‍্যালের নিখুঁত গুণমানে যাচাই করে এই সাইকেল তৈরি করা হয়েছে যাতে স্বচ্ছন্দে চলে আর টেঁকেও সবচেয়ে বেশিদিন।
র‍্যালেই ভারতের সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন সাইকেল।
সাইকেল চড়ার আনন্দ সবচেয়ে বেশি র‍্যালেতেই। আপনি নিজেও একবার পরখ করে দেখুন না।

কাটতিতে সেরা চলনে সেরা র‍্যালেই পথের রাজা

© Regd. User : সাইকেলের জগতে সবচেয়ে বিশ্বস্তযোগ্য নাম

SC-101A BEN

With Compliments from

SHIVMONI & CO.

29 STRAND ROAD
CALCUTTA 1

International Timber Works
180 Mahatma Gandhi Road
Calcutta 7

Serves Tea Industry

Gram—INDRAJAL

Phone Office 33-6713
Factory 45-7438

পূজা এসে গেল

এই আনন্দের দিনে ঘরে ঘরে চাই

তন্তুজ

বাংলার সকল সুখ্যাত তাঁতকেন্দ্রে প্রস্তুত

ধুতি শাড়ী বেডকভার
সার্টের কাপড় ইত্যাদি

দেখতে ভালো • প'রে আরাম • বেশিদিন টেকে

আপনার কাছাকাছি বিক্রয়কেন্দ্র থেকে পছন্দমত কেনাকাটা করুন

কলিকাতা : ২৩, গড়িয়াহাট রোড, গোলপার্ক (শীততাপ নিয়ন্ত্রিত)

৪০, বাগবাজার স্ট্রীট • ২০৩/৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (বিধান সরণী)
১২৯/১এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (বিধান সরণী) • ১২২/১এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড • ৯১, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড • ৮০, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড • ১৬১, বেলেঘাটা মেন রোড • ২০৮, বহুবাজার স্ট্রীট • ১২৮, হাজরা রোড • পি-৫৪৯, ব্লক 'এন', নিউ আলিপুর।

এবং পশ্চিমবাঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আমাদের ১৩টি বিক্রয়কেন্দ্র পাবেন।

সেন্ট্রাল সেল্ ডিপো :

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

৬৭, বক্সীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
ফোন : ৩৫-৩৬৫৮

Progressive/SH-19

আজকের বিন্দুই
আগামী দিনের সিন্ধু

হোক্ না প্রারম্ভ ৫৲ টাকা, তাই দিয়েই আপনার এ-সঞ্চয় হোক্ শুরু। উৎসবের আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলো সুন্দরতর হোক্ এই শুভ সূচনার মধ্য দিয়ে। ইস্টার্ন ব্যাঙ্কে প্রথমে মাত্র ৫৲ টাকা দিয়েই সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। বার্ষিক সুদ ৩½%। চেকের সুবিধে তো আছেই।

আপনার সামান্যতম অসুবিধাও যাতে না হয়,
তার জন্য আমাদের কর্মীরা
সব সময়েই সতর্ক।

দি ইষ্টার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সহিত ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

টেলিফোন : ২২-৫৪৭১/২/৩

১৪ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ১

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান মিরর হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

শব্দের খাঁচায়

অসীম রায়

'মানুষের এমন অসহায় অবস্থা : সত্যকে ধরবার জন্যে সে হাজার হাজার বছর ধরে এই ভাষা নির্মাণ করেছে, তারপর সেই যন্ত্র এখন বিরাট রাক্ষস হয়ে সত্যকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে।' জীবনের সর্বস্তরে, রাজনীতিতে, প্রেমে, কিংবা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় শব্দের এই অসহনীয় আধিপত্য থেকে আবেগের শুদ্ধতা বাঁচানোর চেষ্টাই অসীম রায়ের সাম্প্রতিক দীর্ঘ উপন্যাস 'শব্দের খাঁচায়'-এ রূপায়িত।

মূল্য ছয় টাকা

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩-বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ১২

With Compliments of

PRECISION BEARINGS INDIA LIMITED

P-29 MISSION ROW EXTENSION. CALCUTTA 13

Phone : 23-5044
Gram : 'PREBEARIND' Calcutta

Registered Office :
'NIRMAL' 14th Floor,
Backbay Reclamation.
Nariman Point, Bombay 1.

বিরাট পরিবর্তন

ইউবিআই এর ঋণদানের মাপকাঠিতে

ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগী, চাষী, খুচরা দোকানদার, পরিবহন পরিচালক বা অন্যান্য ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের যে গুণটি প্রধান ব'লে গণ্য হয় তা হ'ল ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা, যার অর্থই হ'ল

- ● কারিগরি বিদ্যা
- ●● পরিচালন পারদর্শিতা
- ●●● উৎপন্ন দ্রব্যের বা সেবার বিপণন-ব্যবস্থা
- ●●●● বাস্তিসত্ত সততা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

হেড অফিস ৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

উৎসবে কেনাকাটার জন্যে

আমাদের শো-রুমে আসুন

৪৫ গণেশচন্দ্র এভেনিউ (এক্তলা)

হাতের তাঁতে বোনা রেশম ও সুতির

রকমারি শাড়ি • সার্টের কাপড় • বিছানার চাদর

বেডকভার • স্কার্ফ • গৃহসজ্জার বস্ত্র ও উপকরণ

ঐতিহ্যপূর্ণ বিবিধ হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের

বিপুল আয়োজন

শাখাসমূহ :

কুচবিহার • শিলিগুড়ি (হিল কার্ট রোড) • জলপাইগুড়ি (শিল্প সমিতি পাড়া) • মালদহ • শিউড়ি পুরুলিয়া • মেদিনীপুর (বড়বাজার) • রাউরকেলা (শপ নং ৩, সেক্টর ৫) • নিউদিল্লী (৭০, থিয়েটার কম্যুনিকেশন বিল্ডিংস, জনপথ) • দুর্গাপুর (স্টীল মার্কেট শপ নং ৪৫০)

দি ওয়েষ্টবেঙ্গল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৪৫ গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা ১৩

পূর্বভারতের একমাত্র পরিবেশক

দেবসনস্ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা ● পাটনা ● গৌহাটি ● কটক ● জবলপুর

With The Compliments of

India Foils Limited

(Incorporated In Great Britain)

4 Mangoe Lane
Calcutta 1
Telephone : 23-9431/5

Branches at :
CALCUTTA, BOMBAY, NEW DELHI, MADRAS and BARODA

এবার দেবীর দোলায় আগমন

কিংকর আমলকী হেয়ার অয়েল

কেশ পরিচর্যায় এক সার্থক ব্যতিক্রম

প্রস্তুতকারক :
কিং এণ্ড কোং
৯০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭
১৮৯৪-১৯৬৯
(হীরক জয়ন্তী বর্ষ)
একমাত্র পরিবেশক :
আর. ডি. এম এণ্ড কোং
২১৭, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

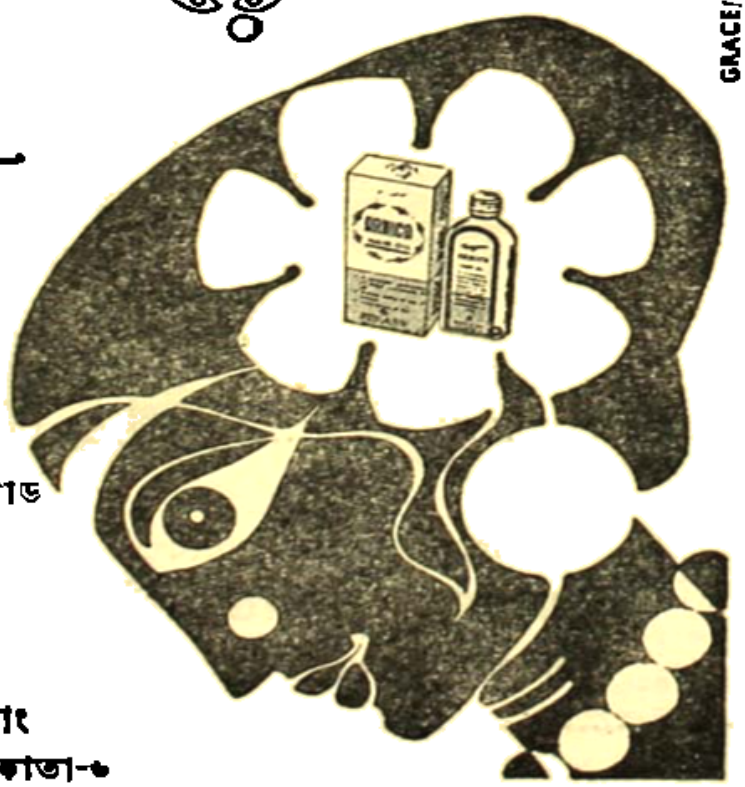

GRACE/3/P&S

এবার পূজার গান

৪৫ আর-পি-এম

এবং

এল-পি রেকর্ডে পাবেন

এই সব রেকর্ড

'ফিয়েস্টা' বা 'ক্যালিপ্‌সো'

প্লেয়ারে বাজে

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

GRACEFUL EXTERIORS—ENHANCED WITH VERSATILE

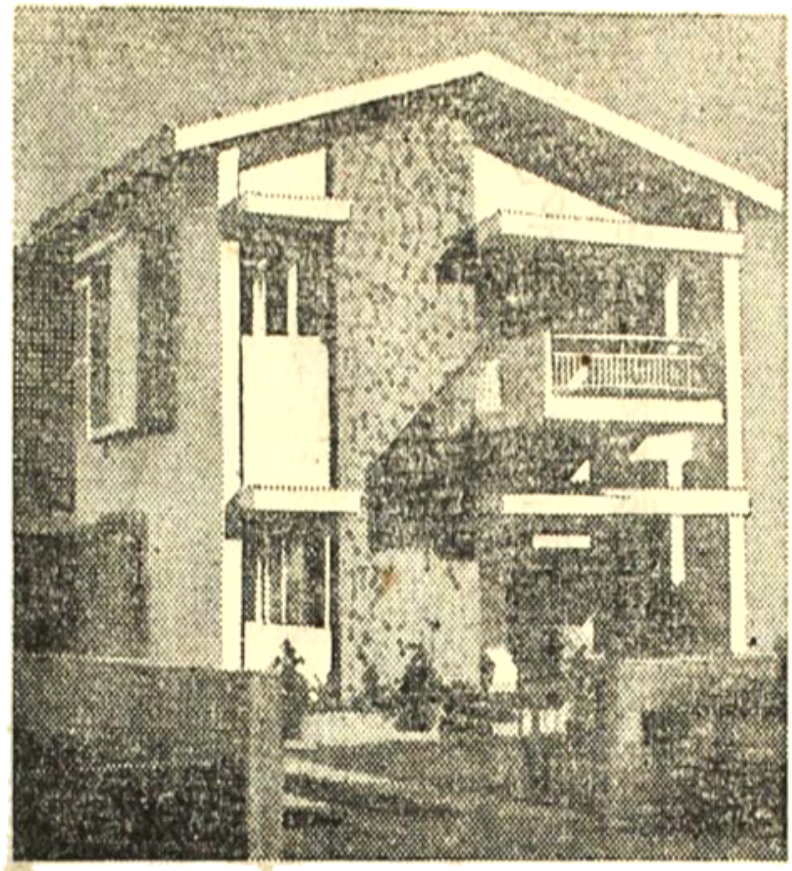

Silvicrete
ACC WHITE CEMENT

Silvicrete lends itself to numerous types of wall renderings, decorative panels, tiled or terrazzo flooring, jallis and pergolas—in pleasing patterns and shades—for exterior and interior decor of buildings and pavilions.

Silvicrete is readily available from the nearest branch of The Cement Marketing Co. of India Ltd. and their distributors.

SILVICRETE *is the basic material for the production of* SNOWCEM *and* COLORCRETE

ACC *your guarantee of top quality*

THE ASSOCIATED CEMENT COMPANIES LTD. • The Cement Marketing Co. of India Ltd.

BSTA3-CM-63

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজ হে

কলকাতা মেলা
১৯৬৯ ১৫-২৩ অক্টোবর

মিলনের সুরই বাঙালীর শারদীয় উৎসবের মর্মবাণী। সেদিন ভাইয়ের সঙ্গে মিল হয় ভাইয়ের ; মুছে যায় ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ভেদ।

এবারে পূজার সময় আমরা মহোৎসবের আয়োজন করেছি কলকাতায়, ভারতবর্ষের মহোত্তম মিলন-কেন্দ্রে। বাঙালীর সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় দান এ-উৎসবের লক্ষ্য। বাংলাদেশের সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, যাত্রা, চিত্রকলা, চলচ্চিত্রের বিচিত্র অর্ঘ্যে সাজানো হয়েছে অনুষ্ঠান-সূচী। বিদেশ থেকে এবং ভারতের নানান রাজ্য থেকে যাত্রীরা আসবেন কলকাতা-মেলায় যোগ দিতে।

ভিন্‌দেশী বন্ধুদের স্বাগত জানান। সপরিবারে ও সবান্ধবে আপনিও যোগ দিন এই সর্বজনীন মিলনোৎসবে।

বিশদ নির্দেশনার জন্য যোগাযোগ করুন

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩/২ ডালহৌসী স্কোয়ার (ঈস্ট) কলিকাতা-১

ফোন ঃ ২৩-৮২৭১ গ্রাম ঃ 'TRAVELTIPS'

WE WISH OUR CUSTOMERS AND COUNTRYMEN
HAPPINESS AND PROSPERITY AND
RENEW OUR PLEDGE TO BE OF SERVICE IN ALL
NATION-BUILDING ACTIVITIES.

UNITED COMMERCIAL BANK

HEAD OFFICE CALCUTTA

রোদ বৃষ্টি মাথায় করে সবসময় আমায়
কাজে বেরোতে হয়—কিন্তু চুল আমার
এলোমেলো হলে চলেনা—আর তাই
আমি নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখি

কেয়ো-কার্পিন তেল মোটেই চট্‌চটে না, বালিশে বা জামায় দাগ লাগে না,—আর এর মৃদুমধুর গন্ধ সারাদিন শরীর মন ঝরঝরে রাখে।

সারাদিন ছোটাছুটির মাঝেও কেয়ো-কার্পিনে আমার চুল পরিপাটি থাকে।

কেয়ো-কার্পিন
কেশ তৈল...আজ তবধি চাহার জন্য

কেশ বেরিকেল কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, বাঙ্গালোর, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, নাগপুর, সেকেন্দ্রাবাদ, আম্বালা, ইন্দোর

লিপটনের রুবি ডাস্ট গুঁড়ো চা

ঢাললেই তোফা চা

যাঁরা ভালো চায়ের সমঝদার, তাঁদেরই জন্যে লিপটনের রুবি ডাস্ট। বাজারের অন্য যে কোনো গুঁড়ো চায়ের চেয়ে ঢের বেশি কাপ চা হবে। টকটকে কড়া লিকার। তেমনি উপাদেয় স্বাদ আর মনমাতানো গন্ধ।

আর পয়সারও সাশ্রয়।

রুবি ডাস্ট চা আনন্দের খনি!

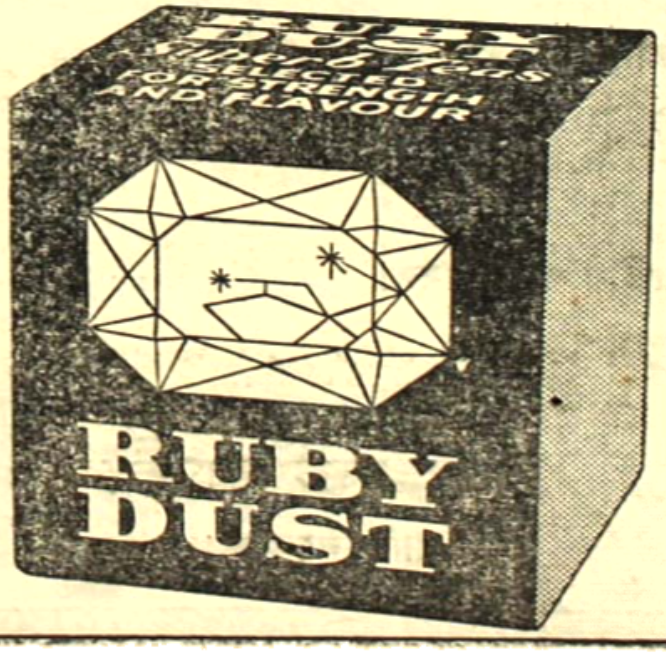

লিপটন বলতেই ভালো চা

LIPTON

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ
মহাভারতের সমাজ — বার টাকা
জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তরঃ — সাড়ে পাঁচ টাকা

নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা — বার টাকা

পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত
সাহিত্য প্রকাশিকা : ৫ম খণ্ড (দ্বাদশ মঞ্জল) — বার টাকা
চিঠিপত্রে সমাজচিত্র : ১ম খণ্ড, ১ম পর্ব — চোদ্দ টাকা
চিঠিপত্রে সমাজচিত্র : ২য় খণ্ড — পনের টাকা

দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
সাহিত্য প্রকাশিকা : ৬ষ্ঠ খণ্ড (গোপাল বিজয়) — কুড়ি টাকা

চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি সম্পাদিত
রবীন্দ্র-রচনা-কোষ : ১ম খণ্ড, ১ম পর্ব — সাড়ে ছয় টাকা
রবীন্দ্র-রচনা-কোষ : ১ম খণ্ড, ২য় পর্ব — সাত টাকা
রবীন্দ্র-রচনা-কোষ : ১ম খণ্ড, ৩য় পর্ব — আট টাকা

অশোকবিজয় রাহা সম্পাদিত
রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্য এবং জাতীয় চেতনা — পাঁচ টাকা

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার — আড়াই টাকা

অমিতাভ চৌধুরী
মাধব সংগীত — পনের টাকা

উপেন্দ্রকুমার দাস
শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা — পঞ্চাশ টাকা

শিবনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী
রসচন্দ্রিকা — ছাব্বিশ টাকা

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

JALANATH

Protector of Seafarers

Jalanath the Lord of the Sea looks after the welfare of all those who journey by water. The ships of today are made as seaworthy, safe and comfortable as science and technical advances can make them. Scindia owns the largest fleet in India, consisting of strong, modern ships to serve the country's maritime commerce with other countries and along the Indian coastline.

SCINDIA SHIPS SERVE
INDIA'S NEEDS

THE SCINDIA STEAM NAVIGATION CO. LTD. Scindia House, Ballard Estate, Bombay 1

Silpa Sree Works

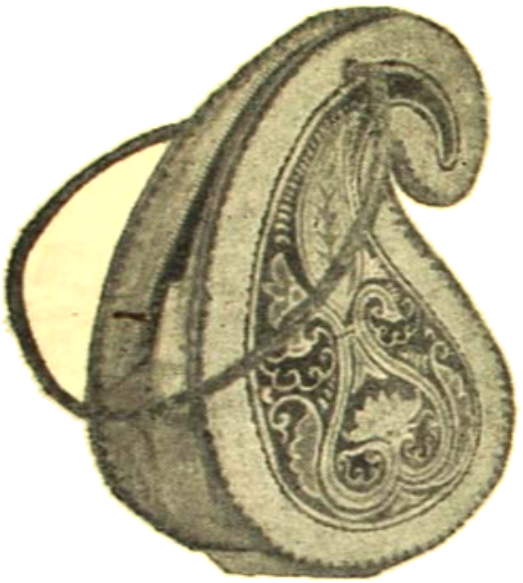

MANUFACTURERS
&
EXPORTERS

Quality Leather Purses, Wallets,
Ladies Handbags, Port-Folios,
Specialised in Straw (MAT)
Ladies Handbags & Purses etc.

Telegrams : 'JADRISHI'
Telephone 34-3734

7 SHAMA CHARAN DE STREET
CALCUTTA 12

With Best Compliments

Ma Dorina Fabrics (P) Ltd.

HOUSE OF FASHION & FABRICS

8 CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA 13

Gram 'DORINATEX' Telephone : 23-5051

'রূপা'র বই

। প্রবন্ধ ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী
(দ্বিতীয় সংস্করণ)

অশোক মিত্র
সমাজ সংস্থা আশা নিরাশা

উৎপল দত্ত
চায়ের ধোঁয়া

চিত্তরঞ্জন মাইতি
বাংলা কাব্য-প্রবাহ

ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু
নৈরাজ্যবাদ

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও
রামমোহন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও
উত্তরকাল

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্যের কথা

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার
বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা ৬·০০
রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক-মানস ৬·০০

সরোজ আচার্য
সাহিত্যে শালীনতা ও
অন্যান্য প্রবন্ধ ৬·০০

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ৫·০০

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
বাঙালী (২য় সংস্করণ) — ৭·৫০

শচীন্দ্র মজুমদার
বিবাহ-সাধনা (২য় সংস্করণ) ৩·৫০

অলডাস হাক্সলি/দেবব্রত রেজ
সাহিত্য ও বিজ্ঞান ৫·০০

আইনষ্টাইন/শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবন-জিজ্ঞাসা (২য় সংস্করণ) ১০·০০

বারট্রাণ্ড রাসেল/পরিমল গোস্বামী
সুখের সন্ধানে (২য় সংস্করণ) ৬·৭৫

উপন্যাস

বাণভট্ট/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
কাদম্বরী (২য় সংস্করণ) ১৪·০০

স্মৃতিকথা

মৈত্রেয়ী দেবী
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ১০·০০

আমাদের পূর্ণ গ্রন্থতালিকার জন্য লিখুন

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২

With compliments from

M/s Precimax Gauge & Tools Company

Manufacturers of Precision Tools such as Jigs, Fixtures, Press Tools, Gauzes etc.

128/85 DIAMOND HARBOUR ROAD
WEST BARISHA, CALCUTTA 8
Phone No. 45-3308

মনীষার কয়েকটি বই

রূপনারাণের কূলে

গোপাল হালদার

প্রবীণ সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মীর আত্মোপলব্ধির কাহিনী বিচিত্র অভিজ্ঞতামণ্ডিত জীবনের স্মৃতিকথায় বিধৃত।

৬·০০

—

বসন্তবাহার ও অন্যান্য গল্প

আনা সেগার্স, ভিলি ব্রেডাল প্রভৃতি ফ্যাসিস্টবিরোধী গণতান্ত্রিক জার্মান লেখকদের গল্পসংগ্রহ।

৩·৫০

—

শব্দের খাঁচায়

অসীম রায়

জীবনের সর্বস্তরে, রাজনীতিতে, প্রেমে কিংবা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় শব্দের অসহনীয় আধিপত্য থেকে আবেগের শুদ্ধতাকে বাঁচানোর চেষ্টাই অসীম রায়ের সাম্প্রতিক দীর্ঘ উপন্যাস 'শব্দের খাঁচায়'-এ রূপায়িত।

৬·০০

—

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

নক্ষত্রপ্রকাশ

বাংলা নাট্যসাহিত্যে অবশেষে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলো। বিষয় বিচিত্রতায়, ভিন্ন স্বাদের নবত্বে, সংলাপের কাব্যময়তায় এবং অসামান্য মুদ্রণসৌকর্যে সদ্যস্ত পাঠক ও নাট্যকুশলীর মনস্কতা ও ধন্যবাদ অর্জন করেছে…

প্রকাশিত নাটক

মৃত্যুসংবাদ ॥ মোহিত চট্টোপাধ্যায় ৩·০০

বৃষ্টি বৃষ্টি ॥ অসিত দে ৩·৫০

সওদাগরের নৌকা ॥ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩·৫০

প্রকাশপ্রতীক্ষায়

রাজা অয়দিপাউস ॥ শম্ভু মিত্র

আজ বসন্ত ॥ বিজন ভট্টাচার্য

প্রকাশক : নক্ষত্রপ্রকাশ ॥ ১১/১ কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট · কলকাতা ৪

TULIP SP. BRIEF
(UNDER WEAR)
1X1 RIBKNIT, H-SHAPE
PRICE — Rs 4·25

BREEZE-MESH
(UNDER WEAR)
EYELET-KNIT, TRAPAZE FRONT
PRICE — Rs 5·50

KING HENRY
(UNDER WEAR)
2X2 RIBKNIT, H-SHAPE
PRICE — Rs 4·50

৭০ থেকে ৯৫ সেন্টিমিটার
অর্থাৎ ২৮ থেকে ৩৮ সাইজ বয়,
স্থানীয় ট্যাক্স আলাদা ।

MARKETED BY —
SALES DIVISION
31, ROBERT ST. CALCUTTA-12

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

অবনীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীলীলা মজুমদার

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকরূপে কতটা সাফল্যলাভ করেছেন এই গ্রন্থে তা আলোচিত হয়েছে। ২·০০

অবভাস ও তত্ত্ববিচার ॥ ফ্রেন্সিস হার্বার্ট ব্রেডলি

Appearance and Reality-গ্রন্থের প্রাঞ্জল অনুবাদ। অনুবাদক : শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ৮·০০

আত্মজীবনী ॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত মহর্ষি-রচিত এই মহামূল্য গ্রন্থখানিতে অনেক নূতন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। ১২·০০

গল্পসংগ্রহ ॥ প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত আরও আটটি গল্প সংকলিত নূতন সংস্করণ। ১০·০০ ; শোভন ১২·০০

দুনিয়াদারী ॥ চারুচন্দ্র দত্ত

কয়েকটি সুপাঠ্য গল্পের সংকলন। ২·০০

নারীর উক্তি ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার, সখ্য, আদর্শ, ভদ্রতা, প্যাটেল-বিল, বঙ্গনারী—কঃ পন্থা ইত্যাদি নিবন্ধ। লেখিকার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা মুদ্রিত। ২·৫০

পুরানো কথা ॥ চারুচন্দ্র দত্ত

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ সুখপাঠ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক রচনা। গ্রন্থকারের আংশিক আত্মচরিত বা জীবনচরিত বলা যায়। প্রতি খণ্ড ৩·০০

পূর্ণকুম্ভ ॥ শ্রীরানী চন্দ

তীর্থভ্রমণের কাহিনী। অনেকটা ডায়েরির ভঙ্গিতে লেখা। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্ত ৫·০০

প্রবন্ধসংগ্রহ ॥ প্রমথ চৌধুরী

বর্তমান মুদ্রণে ইতিপূর্বে দুইখণ্ডে সংকলিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত। শোভন ১৮·০০

বাংলার স্ত্রী-আচার ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের বিবাহ-পর্ব, বিবাহকালীন ও বিবাহ-উত্তর স্ত্রী-আচারসমূহের মনোহারী বিবরণ ১·৩০

বৌদ্ধদের দেবদেবী ॥ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্র এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা। ৩·০০

সপ্তপর্ণ ॥ রাখালচন্দ্র সেন

পাকা হাতের লেখা ছোটো গল্পের সংকলন। ২·০০

হিমাদ্রি ॥ শ্রীরানী চন্দ

কেদার-বদরী ভ্রমণের কাহিনী। লেখিকার 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থের ন্যায় সুখপাঠ্য। ৩·০০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকনাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

খুঁজি

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা
সপ্তম বর্ষ ॥ ১-৩ সংখ্যা : শারদীয় ১৩৭৬

সূ চি প ত্র

পিঞ্জরে বসিয়া শুক ॥ কমলকুমার মজুমদার ১
ভূমধ্যসাগর ॥ শঙ্খ ঘোষ ১২২
ফুল···ছুঁড়ে দিই ফুল ॥ শান্তিকুমার ঘোষ ১২৪
বিপ্লব মহানগর : মধ্যবিত্ত মার্কসীয় চিন্তাধারা ॥ বিনয় ঘোষ ১২৫
সেই বুকই শুলি খায় ॥ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ১৫৭
যৌবন অথবা প্রেম অথবা প্রত্যয় ॥ কবিতা সিংহ ১৫৮
দেখি, কে হারে ॥ শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৬০
'প্রেমের হাল কে বোঝে শালা !' ॥ অসীম রায় ১৬১
বাংলাদেশ : ১৯৭১ ॥ অশোক মিত্র ১৮৪
স্বপ্নদর্শন : বিজ্ঞানবিষয়ক ॥ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ১৯৪
গ্রাম্যচি ও বুদ্ধিজীবী ॥ নিত্যপ্রিয় ঘোষ ২০০
দুর্লভ ॥ বিজয়া মুখোপাধ্যায় ২১২
ঠিক শুদ্ধতা নয় ॥ মোহিত চট্টোপাধ্যায় ২১৩
আকাশ আমার কাছে ॥ কাজল ঘোষ ২১৩
বিলম্বে মনস্থন ॥ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ২১৭
অনেক দিন পর ॥ শিবশম্ভু পাল ২১৫
প্রহরী ॥ নিমাই চট্টোপাধ্যায় ২১৬
পর্ণমোচী অরণ্য ॥ কণিভূষণ আচার্য ২১৭
বিবিজানের মূর্তি ॥ সুব্রত চক্রবর্তী ২১৮
সমাজী ॥ রক্তের হাজরা ২১৯
বীজমন্ত্র করে যায় ॥ দেবারতি মিত্র ২২০
দুপুরে ॥ ভাস্কর চক্রবর্তী ২২০
মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে ॥ দেবী রায় ২২১
এখানে এখন ॥ যোগব্রত চক্রবর্তী ২২২
দুই স্তবক ॥ সামসুল হক ২২৩
পাহাড়ের স্মৃতি থেকে ॥ অরূপকুমার চট্টোপাধ্যায় ২২৩

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়
সম্পাদক : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ নির্মাল্য আচার্য

কার্যালয় : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

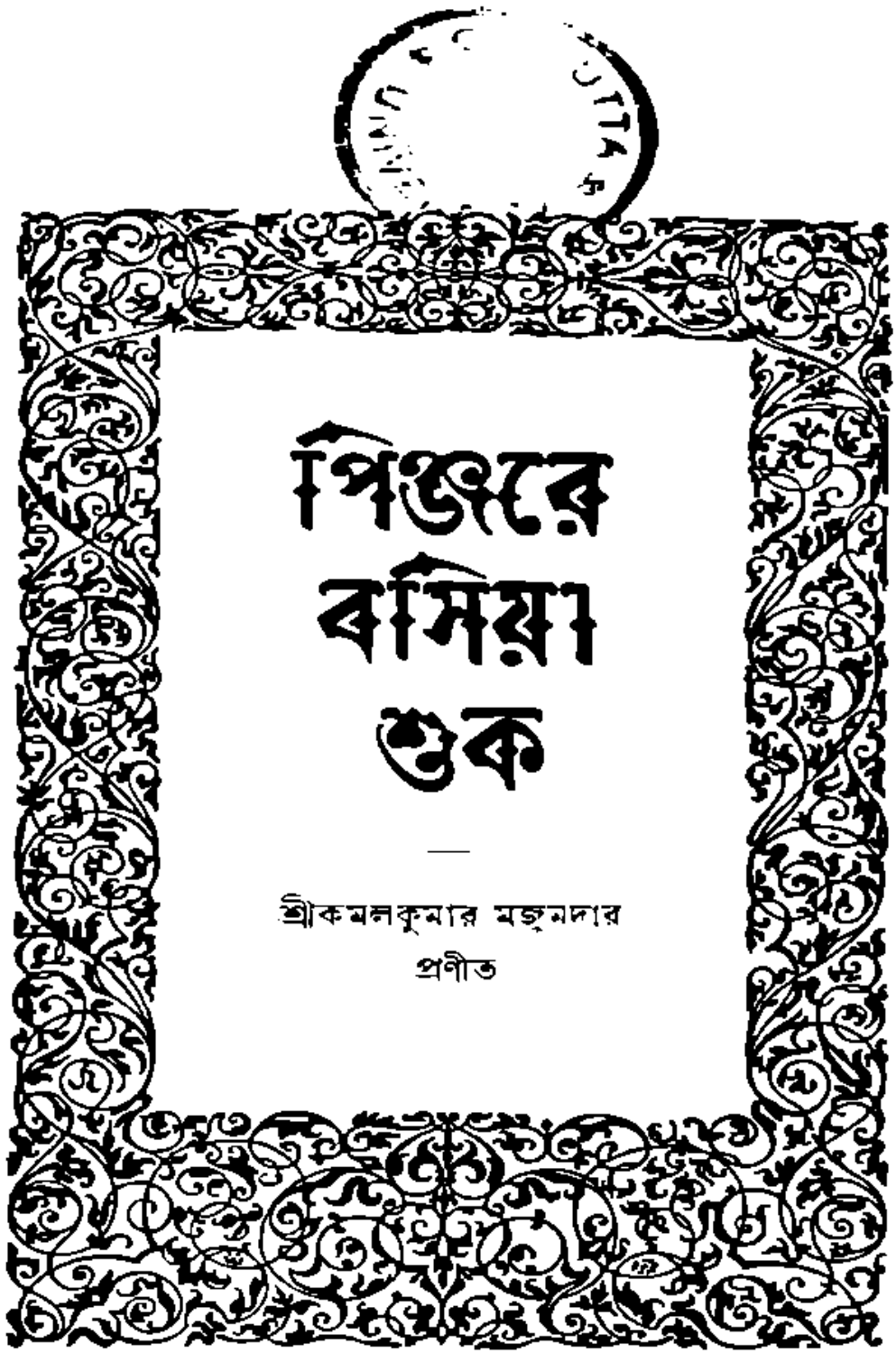

পিঞ্জরে বসিয়া শুক

—

শ্রীকমলকুমার মজুমদার
প্রণীত

পিঞ্জরে বসিয়া শুক

তখনই যে সময়ে সুঘরাই হারাইয়া যায়, এই দিবামালা সাজান, ভাস্বর, হীরক-শোভাতে বিনিদ্র শহরে – ইহা শিবপুরী, ভক্তি ও মুক্তি প্রদায়িনী যাহা, সৌন্দর্য্য যাহা, যে শহর, তখনই সে আপনকার সীমা বুঝিয়া তীব্র আতান্তরে পড়িয়াছিল, যে তাহার শেষ অঙ্গুলিশীর্ষতেই ও অন্য প্রত্যঙ্গাদি, যে ইহার পর হইতেই এবং বনস্থলী চমকপ্রদ হইয়া রহে, যে ইহার পর হইতেই দীপের জ্যোতির্ম্ময়ী ঘটনার প্রবাহ, যে ইহার পর হইতেই আমি, – হায়! আমি নারসিসস্-রে পথিক করিয়াছি।

ইহা, ঐ সীমা, ভাবিয়া সে বড়ই উত্তরায় কান্দিয়া থাকে ইহা সত্য, অথচ আদতে তাহাতে প্রচ্ছন্ন ছিল কূট বিদ্বেষজনিত ক্রোধ, যাহাতে সে যেমন সেই সাধক যে যিনি নির্ভীক তোয়াক্কাহীন দামাল, আকর্ণবিস্তৃত নেত্র যাঁহার হিঙ্গুল, চেহারা যাঁহার বৈরাগ্যসুন্দর দশাসই, গাত্র যাঁহার মসৃণ ও উজ্জ্বল তাম্রবর্ণের, যাঁহার পরনে কৌপীন, হস্তে যাঁহার সুমহৎ চিমটা; এখন যিনি এই লোকপ্রসিদ্ধ মন্দিরের দরজার চৌকাঠেতে অদম্য দুঃসাহসে ভীষণ রাগে ঐ চিমটা দ্বারা বারম্বার আঘাত করিতে উন্মাদ; ইহাতে ক্রমান্বয় তদীয় স্কন্ধ বলীবর্দ্দের প্রায় স্ফীত হইতেছিল, ঘর্ম্মে তাঁহার কপালের হোমতিলক ঘৃণাক্ষরে পরিণত হইল, ইঁহার রুদ্রাক্ষমালা আন্দোলিত, আর যে তিনি মুহুর্মুহুঃ বীরবিক্রমে ত্রিভুবনের ত্রাসসঞ্চারী হুঙ্কার পাড়িতেছিলেন।

ঐ বিপুল হুঙ্কারমধ্যে ঐ অভিনব সাধক জলদগাম্ভীর্য্যে যা তৈঃ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আবার কখনও বা ভগবান শিবকে বিকট আঁশটে বচনে গালি ও টিট্‌কার দিতে থাকিয়া ইহাও বলিতেছিলেন,···শালা অদ্য আমারে দর্শন দিতে হইবে, আমি কণ্ঠে কিরিয়া আসিতে চাহি না,···দে শালা অখণ্ডতা···। যে এবং ঐ সাধক এরূপ অহঙ্কারও প্রকাশ করেন, যে, আমি তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি···।

ঈদৃশ নানান অর্থপূর্ণ শব্দের সহিত চিমটা-প্রহারের সঘন আওয়াজ হইতে থাকিল, আশ্চর্য্য যে ইহাতে কুক্কুর ও পাখীরা রব তুলে নাই, নিকটে থাকিয়া সুঘরাই কিছু আড়ষ্ট, কিছু কৌতূহলী সে দেখিল, অনেক পূজার্থী ও ধার্ম্মিকরা ঐ বীরের সমীপস্থ হইয়া বিস্ফারিত লোচনে, তাঁহার ঐ ভয়ঙ্কর উদ্ধত ক্রিয়াকলাপ দেখিতে থাকিয়া ভক্তিবিহ্বল হৃদয়ে, কেহ অশ্রু ভারাক্রান্ত ইতিমধ্যেই, অহরহ 'জয় বৈদ্যনাথ শিবশম্ভু' ধ্বনি দিতেছিলেন; তাই ইদানীংকার সমস্ত ভাবে আমাদিগের জীবন এক সুউচ্চ মহিমার অবস্থায়ে স্থায়ী হইয়াছিল।

সাধক ঘোর ভস্তে পুনরায় ঘোষণা করিলেন,···আমি মন্দিরে যাইব না···তুমি স্বরূপে আসিয়া দেখা দাও··· । এবং যে ইহার পরক্ষণেই তদীয় বিপুল দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি চেতনশূন্য হইলেন ; তখনই, সমবেত প্রত্যেকে তাহা অবলোকনে মহা গৌরবান্বিত বোধ করিলেন ; ইঁহারা সশ্রদ্ধচিত্তে, মন্থরে, শিব ধ্বনি তুলিতে থাকিয়া ও তৎসঙ্গে ঐ সাড়হীন দেহের উদ্দেশে পুষ্পমাল্য আদি বর্ষণ করিতে সময়ে, ইহা বলিলেন,···হে নীলকণ্ঠ, হে ভগবান উমাপতি, তুমি অন্তর্য্যামী, আমাদের পুরুষানুক্রমে এবং পূর্ব্বজন্ম ও ইহকালের জন্য আমাদের যে অমরতা বরাদ্দ আছে···তাহা অচিরেই ঐ সাধকেরে দেওয়া হউক, কেন না তুমি তাহার (ঐ সাধকের) অবিনাশী প্রেম··· ।

সাধকের অন্তর্দশা প্রাপ্ত দেহটির শুশ্রূষাকরণে অতীব শুদ্ধাচারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ সাহস পর্য্যন্ত করেন না, এই জন্য যে ঐ পাঞ্চভৌতিক দেহ অধুনা কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর পরমাশ্চর্য্য চন্দ্রকলা ! এখন কেহ সাধকের কর্ণে অমৃত শিব নাম, কেহ ব্যজন, কেহ উহার মেরুদণ্ডে ঘৃত কর্পূর মালিশ করিতেছিলেন, অনেকক্ষণ পর সাধক খানিক সহজ অবস্থায় আসিলেন ও তন্দ্রাবিজড়িত স্বরে কহিলেন, জল জল খাব ! এইভাবে ইহজগতের সহিত সম্পর্কস্থাপিত হইল ।

সুঘরাই এহেন প্রহেলিকার কিছু, সরলতার এতটুকুন, বীরত্বের লেশমাত্র না বুঝিয়া শুধু সাধকের দুর্দ্ধর্ষতা গ্রহণ করিয়াছিল । আর যে তেমন তেমন রোষে সেও জ্বলিতেছিল – সম্ভবত, কেন না তাহার ছায়া বাঁচাইতে ব্রাহ্মণ্য শ্রীসম্পন্ন পাণ্ডাঠাকুর মহাশয় ঈষৎ দিক্‌ভ্রান্ত হওয়ত স্বীয় উড়নীতে সামাল দিয়াছিলেন ; বিশেষই নিশ্চিত, কেন না সে বেচারী মন্দিরের দুয়ারের এই পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ত্যাগে বাধ্য হয় । তখন, যখন ঐ সাধক অন্তর্হিত হইয়াছেন, যখন এরূপ সুদুর্লভ পবিত্রতার, অর্থাৎ মন্দিরের, নৈকট্যে আসাতে যে এক অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদ তাহাতে গোঁয়ার হইয়া উঠিয়াছে ।

এবং তাই তৎক্ষণাৎ সুঘরাই তদীয় স্নেহশীলা মনিবপত্নী আদিষ্ট সেই মনোলোভা সার্থক কামনা জানাইতে পারে না । যে পরম ভক্তিমতী রমণী যে সূত্রে বলিয়া-ছিলেন,···এখন বাবা বোদ্দিনাথের ইচ্ছে যদি হয়, এমন যদি করেন, তুই তাঁর সামনে একেবারে···উঃ তাহালে ! হ্যাঁরে তেমনতারা ভাগ্য কি আর ছোঁড়া তুই করেছিস !···সে নয় নাই হ'ল···তবু তুই দাঁতে দাঁত দিয়ে···জান্ যায় সেও ভি আচ্ছা, তুই তাঁকে ডাকবি, দেখবি তোর পাপ তিনি মুছে দেবেন !

এই পর্য্যন্ততে সুঘরাইএর রৌদ্রনিবাস আয়ত চক্ষুদ্বয় সবি সময়ে বড় হয়, যাহা প্রত্যক্ষে মনিবপত্নী আবার কহিলেন, হ্যাঁরে···তিনি বড় দুখীর ঠাকুর···মা ঠাকরুন বলেছেন, যে ছোট ছেলের ডাক তিনি ফেলতে পারেন না, তুই নির্ভয়ে ডাকবি, বলবি ঠাকুর আমি বড় অধম বড় দীন, তুমি ছাড়া আমার গতি কৈ···তক্ষুনি দেখবি বাবা বোদ্দিনাথ তোর পুর্‌বো জন্মের সব পাপ ধুয়ে মুছে দেবেন···আবার

ছোঁড়া গালে হাত দেয়···কতবার বলেছি না এ সব কথা কক্‌হনও গালে হাত দিয়ে শুনতে নেই···।

ইহাতে সুঘরাই আপনকার গাল হইতে হাত নামাইতেই যারপরনাই অসহায় নির্জীব হইল ; এমনই যে, সকল নির্ভরতা তাহার ঝটিতেই খোয়া গিয়াছে, যে সে গরু খেদাইতেও অপারগ ; তাই উপস্থিত এ দেহ কোথাও হেলান চাহিতেছিল — নির্ঘাত কৃতাঞ্জলিপুটে শুনিবার পত্রউদ্গম ও কুম্ভকারের চাকের নির্গুণ গূঢ় পন্থতে ; যাহা গ্রামাঞ্চলে অনাবৃষ্টির ছড়া বোধে ব্যবহৃত হয়, নবমবর্ষীয়া বালিকারা নগ্ন দেহে, শূন্য ঘট মস্তকে ধারণে ঈষৎ নৃত্যভঙ্গিমায় উহা গাহিতে থাকিয়া প্রথমে ক্ষেত প্রদক্ষিণ করে।

এখন সুঘরাই যখন এহেন হেলান দিতে ইচ্ছুক, ঠিক সেই সময়তেই শুনিতে পাইল যে নিজ অভ্যন্তরে পাঠান দাপটে কিলা কিলা রব ঘনাইয়াছে ; তদীয় পেশী-সকল তাহার স্বকীয় পূর্ব্বজন্মটিকে বিনা-স্থনে এক গ্রাসে খাইতে হাঁ হাঁ করিতে ছিল। যাহাতে সে বিপদ গণিল ; ইহাতে শঙ্কায় সে কিয়ৎ পিছু হটিল, সুতরাং সে নিরীহ, যে নির্ব্বিবাদে সুতীক্ষ্ণ শীত সহিয়াছে নিজ বক্ষঃদেশে হস্ত রাখিয়া, যে নিজ হাতে কপালের ঘাম চোখের জল মুছিয়াছে, যে লাঠিটার দড়ি স্পর্শ করে না,—সে অন্ত নহে। ফলে অতএব মোটেই আভাসিত তাহার মধ্যে হইল না, যে একদিন কয়েকটি পালক উড়িয়া—হায়! কখনও বা উপমাতে মুক্তার বৈভব আতিশয্যকে প্রনষ্ট করিয়াছিল, এইহেতু যে সে আপনার ভালবাসা লইয়া ক্বচিৎ খেলা করে।

যে স্থলে পালক উড়িয়াছে, পালক পড়িয়াছে, ধ্রুব যে ভগবান রামচন্দ্র যাবৎ না সেখানেতে পদার্পণ করেন ততদিন সেখানে কিছুতেই দীপ জ্বলিবে না, যে ঐখানে পদক্ষেপমাত্রই সকলেই পথ ভুলিবে ; এ কারণে যে, ঐ স্থলে সুঘরাইএর তর্জ্জনী কাটিয়া বেশ খানিক রক্তপাত ঘটে, এবং যে সে দেখিল ঐ রক্ত তাহার পাখীটিকে মহা সোহাগভরে পান করিতে ; এখন আজব যে, ঐ দৃশ্যে সে দারুণ খুসী হওয়ার মুহূর্ত্তেই দুর্দ্দান্ত ক্রোধে ভৌতিক, তৎপ্রবর্ত্তিত সে তৎক্ষণাৎই পদাঘাত করিল মৃদুল পক্ষীটিকে ; কিছু পালক খসিল, ইহা উড়িতে থাকিয়া তাহার সম্মুখের — রিখিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত সুরম্য ডিগ্‌রিয়া পাহাড়কে ঢাকিয়াছিল।

দেবস্থান যাত্রার মধ্যে এবং মন্দিরে আসিবার রাস্তাকে পূজারী ও ব্রাহ্মণ স্পর্শ বাঁচাইবার ইতঃমধ্যে মনিবপত্নী-বর্ণিত প্রার্থনা, ইহা শ্রুতি বা দেশাচারে নহে, তিলেক সে বিস্মৃত হয় নাই, বরং উহাই তাহার সম্বল ছিল ; তবে ইহা ঠিক, যে, ঐ সময়েতেই, নিষ্ঠাবান মনিব মহাশয় তাহার বিষয়ে যে অভিমত ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতেই সে, তাহার এক ছত্রে সে, কেবল দোমনা হইতেছিল ; তিনি প্রকাশিয়াছিলেন,···যে সে নিষ্পাপ! এবং যাহা উচ্চারণের সঙ্গেই বাস্তবতা কাদা-মাখা পদে মার্ব্বেল অভিমুখে ছুটিতে আছিল, এইজন্য যে ঐ উক্তিতে মনিবপত্নী,

যিনি এ যাবৎ মৌনী, এ যাবৎ নিছাড় মালাজপকারিণী, তথাপি তিনি সমধিক বাৎসল্যভরে সুঘরাইএর প্রতি চাহিয়া স্মিতহাস্য করেন।

কিন্তু যখন সে বেদময়ী অজস্র ধ্বনির মধ্যে, যখন আহ্লাদ তাহাতে থিতাইয়াছে, তখনই সুঘরাইএর এতাবৎ মনস্থ কামনার পদবন্ধ মনিব-ব্যক্ত শব্দগুলিতে ঠেক্ খাইতেছিল ; এখন সে যেন প্রার্থনা জানে না ফলে ক্রমাগতই সে অন্ধকার দিয়া ডাকিতেছিল, অবশেষে পুনরায় মনিবের বিনীত কণ্ঠস্বর শুনিল, একটি শব্দ দেখিতে পাইল, ইহাতে সত্যই সে যেমন চানোয়ার বালিতে-খোঁড়া-গর্ত্তের নিথর জলের চাকচিক্য সাক্ষাৎ করিয়াছিল, আশ্চর্য্য যে ঐ নিঃসঙ্গতায় থাকিবার সময়েই সুঘরাই বুঝিল তদীয় নিষ্পলক চাহনির সামনেই, মন্দিরের রাস্তায় এক অযুত দ্যুতিময়ী শোভাযাত্রা আসিতেছে।

সে প্রত্যক্ষ করিল এ শোভাযাত্রাতে সমস্ত পথ চারুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সে প্রত্যক্ষ করিল এক বহুমূল্যবান উৎকৃষ্ট কিংখাবের ছাঁদনা, যাহার চারিটি রৌপ্যদণ্ড চারিজন বালক ব্রহ্মচারী কর্তৃক ধৃত, ইহাদের মস্তক মুণ্ডন করা, পরণে ইহাদের গৈরিক — আর ঐ ছাঁদনার নীচতে কোন সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, হস্তে যাহার ধান্যমঞ্জরী, ইনি গৌরী, ইনি সেই যিনি নৌকার অভিমানকে মান্য করিয়াছেন, ইনি সেই যিনি মরকতের গোপনতা !

ঐ শোভাযাত্রা দর্শনে পথিপার্শ্বের সকলেই 'অহো ভগবতীতনু! জয় জয় অপূর্ব্ব মিথুন ! অহো মহেশ্বরী' বলিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল ; ঐ সুমহৎ আওয়াজে দিকে দিকে পবিত্র অগ্নি স্থাপিত হইতেছিল। এই জোয়ারের ইতিমধ্যেই অদৃশ্য মনোরমত্ব দেখার সৌভাগ্য হইতে বেচারী মন্দ-কপাল সুঘরাই বঞ্চিত হয়।

সে সর্ব্বৈব বিচ্ছিন্ন। সে অনেক অনেক কান্দিল। কিন্তু কান্দিলেও অন্তরে সে ঐ সাধকপ্রায় আস্ফালনে তৈয়ার ; আপনার অঙ্গুলিশীর্ষ বারম্বার নজরে এক বিষমত্ব জানিয়া সে প্যাপাটে, এতদিন তাহার যে সীমা গ্রাম্য ছিল সম্প্রতি তাহা ভৌতিক ; এই শহর তাহাকে তাহার গায়ের উপর ঢালিয়া দিয়াছে আঁটিয়া দিয়াছে এই শহরের উপর সে খড়্গহস্ত, সে ব্রাহ্মণশ্রেণীর ন্যায় মোহিলিকে অভিশাপ দিয়াছে কারণ মোহিলি বলিয়াছে, ইহা মহিমান্বিত শহর, বহু জ্ঞানী এখানে, এখানে শিব বাস করেন, পঞ্চায়েত বিল্বপত্র হস্তে বিচার করে, এখানে বিস্কুটের কারখানা নাই।

ইহা মহিমান্বিত শহর ! সে বলিয়াছে, পাখীরা তাহা জানুক ; সে বলিয়াছে, মোহিলি ও যাহাদের ধারণা এ শহরে কুক্কুর হওয়াও পুণ্যের তাহাদেরকে সে পদাঘাত করে, এবং নিমেষেই এরূপ মনোভাবে সে ভীত ; উচ্চবংশের বালকদের ন্যায় বলিতে এখনও পারে নাই যে, না বাবা বলিব না ভগবান শুনিতে পাইবেন। সুঘরাই এই শহরকে খলযন্ত্রী সমঝে আপনার চোয়াল ঘর্ষণ করিতেছিল, এখানের কোথাও সে নিজেরে সম্প্রসারিত করিতে পারে না। অবিরত ঢাক বাদকের

নৃত্যপদক্ষেপে তাহার পদচিহ্ন মন্দিত দেখিয়া, শান্ত তীর্থযাত্রীদের তাহার পদচিহ্নের উপর দিয়া যাইতে প্রত্যক্ষে সে মারাত্মক হইয়াছে !

কখনও বালকস্বভাব বশত সুঘরাই রাস্তার এক পাশ বাছিয়াছে, এই নির্ব্বাচনে একদা সে অহো বলিয়া চুকারিয়াছে, সে খুসী, সে ইহাতে উচ্চবর্ণের স্পর্শ বাঁচাইয়াছে ; ক্রমে তদীয় পদদ্বয় ধূলাতে বিশেষই গৈরিক যে তাহাও ঠিক। সে নিয়ত মনিবদের অন্বেষণও করিয়াছে, ইহারই ভিতরে যে সে অনেকবিধ কাঠামো, সুদারুণ পারিপার্শ্বিকতার সহিত আপনাকে সংযোজিত করিয়াছিল—সুতরাং এনতার অনভ্যস্ত সংস্থানের মধ্যে সে, সঙ্গে সে, এক হয় এইরূপ বিশ্বাসে যে মনিবরা তাঁহাদের সত্ত্বগুণ বশত আকর্ষিত হইতে পারেন ঐ ঐ সংগঠনে।

এবং সুঘরাই ঐ ঐ পরিবেশ সকলের মধ্যে আপনাকে উপস্থাপিত করিয়া আবার অন্বেষণে থাকিয়া, খুবই তাজ্জব যে কখনও কখনও সে নিজেকে মনিবের চোখে নির্দ্ধারণ করিতে মজবুত ছিল ; ইহাতে পর্য্যবেক্ষণ তাহার কি আশ্চর্য্য অমানুষী, বোধ কি অভাবনীয় ! যে যেনবা সে কখনও জংলী নয় ; ইদানীং এহেন ভিন্নতায় সে দেখিল।

সে দেখিল বিশৃঙ্খলতা, মসৃণতা, অজস্র আবছায়া অনেক রক্তচন্দন ও তীর্থযাত্রীর দল ভেদকরত তিনি সুস্পষ্ট হইলেন ; এবার তিনি মুখের পার্শ্বে হস্ত স্থাপনে ভীড়ের এখানে হঠাৎ অন্তত্রে বারেক সুঘরাই বলিয়া ডাকিলেন, যে ইহাতে মাতৃস্তন অরুণাভ, যে জনতা এই নিবিড় এই তরল হইল ; এখন এবং সুঘরাইএর প্রমাণের কোন বালককে পশ্চাত হইতে দর্শনে বালকের বস্ত্র ও গেঞ্জী ফর্সা—যেহেতু ঐ সুঘরাই বিশ্বাসে অত্রাহি দৌড়াইলেন এবং চীৎকার করিলেন—এই হারামজাদা সুঘরাই,—হায় সে এক স্থূলগামী বালক !

নিরাশ হওয়ত বিষণ্ণ হৃদয়ে তিনি পূতসলিলা শিবগঙ্গার সুদৃশ চাতালে আসিলেন ; এখানে কেহ কেহ যাহারা ঘুমায় তাহাদিগকে স্বীয় দেহ বাঁকাইয়া এমত নিবিষ্টতায় তিনি সমীক্ষণ করিলেন যে, যে যেমতবা ঘুমন্ত সকলের স্বপ্নের সুষুপ্তির অন্তরীক্ষে সুঘরাইএর খেই লুক্কায়িত আছে ; যে মধুস্বরে তিনি সুঘরাই বলিয়া ডাকিলেন ইহা নির্ঘাত অপ্রকৃতিস্থতার হইলেও—আর যে এই দেবস্থানের ধ্বনিত গম্ভীর জয় জয় শিবশম্ভু বচনে ও স্নানের নির্ম্মল শব্দে ঐ নাম ধূলিসাৎ, তীর্থকামীদের অগ্রবর্ত্তী মঙ্গল ঢাক বাদ্যে তাহা নয় ছয়।

সেখানে খুঁজিতে থাকিয়া মেঘমন্দ্রে অগণন কণ্ঠের মন্ত্রের প্রতি কখনও, স্খলিত স্তবস্তোত্র আবৃত্তিসহ শিবগঙ্গাতে শুভ অবগাহনরতদের প্রতি কখনও তিনি সনাতন প্রবীণ ভঙ্গীতে চাহিয়া রহেন, কারণ যে বিবিধ ওষ্ঠের স্ফুটমান শব্দরাজিতে ও অবগাহনের মনোজ্ঞ রণনে ধ্রুবই যে তন্মাত্রা সমস্ত নির্ব্বিকার, কোথাও অন্ধকার নাই ; মাত্র যে শিখা ঊর্দ্ধগামিনী এই তত্ত্বে সবই ভরিয়া আছে।

আবার তিনি শ্বাস লইলেন, তিনি সহস্র হইলেন, তিনি ঠিক করিলেন, এই

ভাবিয়া যে সুঘরাই নিশ্চয়ই ক্লান্ত বোধ করিলেও মুষড়ায় নাই এবং আরও নিশ্চয়ই আমার খোঁজার সুবিধার্থে এখানে কোথাও সে ছিল ; তাই যাহারা শিবগঙ্গায় অর্দ্ধজলমগ্ন, করজোড় যাহাদের পৃথিবীর পার্থক্য, তাহাদেরই কাহারও পাঠ থামিলে এই সংবাদ লইবেন যে, যে বালক এতক্ষণ শুদ্ধাতিশুদ্ধ অবগাহন দেখিতেছিল এবং তাহাতে সে অপরোক্ষেই, যেন সে, একাই, সুদীর্ঘ সময় যাহা বীজ বপন করিতে করিতে অনেক দুরতিক্রম্য পথ বহি এখানেতে আসিয়া চমৎকৃত !···এবং আপনাদের জ্ঞানের আওয়াজে সেই বালক একদা রিখিয়ার সন্ধ্যায় নীত ছোট ছোট পরিবার বেড়াইতেছে—ইহারা চেল্লায় ; ইহাদের সকলের মুখমণ্ডল, দৃষ্টি আকাশ ও মাটির ইতিমধ্যে রক্ষিত—ইহাদের পিছনে পাহাড়, শাল ও মহুয়ার পুনরাবৃত্তিতে হাট দিকসকল ; ইহারা সমস্ত কিছুকেই গ্র্যাণ্ড বলিয়া প্রশংসা করে, তাহারা পেট্রোমাক্স হাতে সুঘরাইকে দেখিয়া বলিয়াছে—ছেলেটি গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড ! বেশ কালচার আছে !···এবং আপনাদের স্তবস্তোত্রের অনুরণনেও শিব-গঙ্গার শীতলতায় উহার, সেই বালকের, দেহ মন পরিবর্ত্তিত আর যে তাহাতে এই বুদ্ধি মনে হয় জন্মে যে শিবই প্রাকৃতজনের অদ্বিতীয় জ্ঞান এবং ইহাতে সে স্মিতহাস্য করিতে চেষ্টিত হইয়াছিল···আপনারা শাশ্বত ধর্ম্মের মনে হয় সূক্ষ্মগতি অভিজ্ঞ, আপনারা বলুন তাহার ঐ ভাব যেন সত্য হয়···এখন ধর্ম্মপ্রাণ আপনারা এই লৌকিক খবর কি বলিবেন যে সে কোথায় গেল ?—কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসিতদের উত্তর আন্দাজে অনুৎসাহে যে সকল কুসুম শিবগঙ্গার পাপহারিণী জলস্তরে হতাদরে ভাসে অধুনা সেই সেইতে নেত্রপাত করিলেন, এখন তদীয় ক্ষুণ্ণ মানসে ফুলগুলি,ফুলগুলি, ফুলগুলি !

অনেক সন্ন্যাসীর মধ্যে এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর ভস্মাবৃত সন্ন্যাসীর নিকট তিনি যাইয়া প্রণতি পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদিলেন,—ভগবন, যে বালক অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়নে, স্বীয় মস্তকোপরি হস্ত রাখিয়া আপনাকে অবলোকনমাত্রেই থ হয়, সুতরাং আপনাদের মতন সন্ন্যাসীর সম্পর্কে মোহিলির উল্লেখ তাহার খেয়াল হয় নাই ; আবার ক্ষণেক পরেই সেই বালক এক আতঙ্ক দেখিল, সে দেখিল সমক্ষে থাকিয়াও নাই-এর মধ্যে আপনি—আপনার ধুনির অমোঘ তর্জ্জনী আছে, সে দেখিল আপনার ধুনিতে সূর্য্যের যাত্রাপথ পুড়িয়া খাক্ হইয়াছে। সে নাসিকা কুঞ্চিত করে—আমরা জানি যে ঐ ধুনিতে পানপাত্রের কিনারের আঙুরলতা কেয়ারী করার সভ্যতা দাহ্যমান, মানুষ নিজেকে ভালবাসার নামে নিজেকে সজ্ঞানে যে তামাসা ব্যঙ্গ করিয়াছে—কত না ব্যঙ্গ উক্তি রচনা করিয়াছে—তাহারই পোড়া গন্ধ আপনার অনির্ব্বাণ ধুনি হইতে নির্গত, ধূমজাল অনেক উর্দ্ধে উঠে, ইহাতে উজ্জ্বল হংসযূথ বহুদূর হইতে নিশানা পাইতেছে অথচ চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রাদি বহুকাল হয় আপনার দিক্‌মণ্ডলে নাই—এই জটিল ঘটনা আবর্ত্ত কথা যেন সেই বালকও জানিয়াছে, কেন না সে নিশ্চিন্ত ছিল। অথবা এইজন্য সে স্থবির যে আপনার দর্শনে

অবশ্যই সুদুর্লভ স্পন্দনরহিত যাতনা তাহাতে যেমন প্রভাবিত হইয়াছে – অভ্রান্ত ইহা যে আপনার দিব্যদেহই সেই লোভাযাত্রার গূঢ়তম মন্ত্রগুপ্তি এবং যে আপনি অলৌকিক নয়, আপনি অজর দুঃখবোধ অলৌকিকী দুখের দুখী আপনি···হে মহাত্মন, হে ভেদজ্ঞানহীন, এখন যদিস্যাৎ অভেদজ্ঞান বিচারে সেই বালকটিরে নজর করিয়া থাকেন, লোকহিতকামী সর্ব্বজ্ঞ বলুন সেই অল্পবয়সী, যে বালকত্বে অপরিসীম, সে কোথায় ?

ঐ মহাপুরুষের ধুনি গন্ধে সুঘরাই নাসিকা আবার কুঞ্চিত করিতেই সে শুনিতে পাইল তালপাতা পথের কাঁকরে ঘর্ষণে ভারী বিশ্রী আওয়াজ উঠে···পরক্ষণেই প্রতীয়মান যে ঐ তালপাতার উপরে একটি মৃত কুকুর বাঁধিয়া রাখা ; এক অদ্ভুত-দর্শন লোক, অনেকাংশে তাহার ভগনীপতির মতন দেখিতে, এক দীর্ঘ তালপাতার ডাঁটা ধরিয়া টানিতে থাকিয়া মন্থরে আসিতেছে, লোকটি চমৎকার কণ্ঠে গান গায় এবং কোঁচড় হইতে মাঝে মাঝে যেন কি খাইতেছিল। পথচারিগণ মৃতের পচা দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিয়াছে, থুথু ফেলিতে ফেলিতে চলে।

ঐ বিষয়ত্বে অন্যপক্ষে সুঘরাই যেন জমিয়া উঠিল, ইহা তাহার নিকট অন্ন, সে মুষ্টিবদ্ধ করিল, তাহার ক্রন্দনের কোন কারণ নাই, সে নিবিষ্টচিত্তে ইহা লক্ষ্য করিল যে সেই অনতিদূরে এক গাড়্ডায়ে মৃত কুকুরটিকে ফেলা হইল। তখনই সে যেমন বা নিজের সূত্র পাইল, তখনই দ্রুত পদসঞ্চালনে সে সেখানে যেখানে আর কিছুকাল পরেই শকুন আসিবে ; ধর্ম্মত সে আপনার অহঙ্কার ফিরিয়া পাইল, তাহার অজ্ঞানতা পুনরায় লাভ করিল, পচাগলা পুতিগন্ধময় যাহা কিছু তাহার সহিত তাহার কি অবিচ্ছেদ্য যোগ ! সে সুখী, সে হারাইবার নহে।

যেখানে, চাতালেই, কোন অতীব নিষ্ঠাবান আচারী ব্রাহ্মণ, সূর্য্যকে যিনি একাগ্র মনেতে জল-অর্ঘ্য দেন, ইহারই নিকট, ঐ কর্ম্মানুষ্ঠানশেষে এই রীতিতে মনিব মহাশয় অবতারণা করিলেন – এক ছেলেমানুষ চপলমতি আপনকার অধরের প্রহেলিকাময়ী কম্পন হেরিয়া ও যুগপৎ সূর্য্য তথা নভোস্থল প্রতি নেত্রপাতে কিছু এক সমাধান উদ্দেশ্যে এতই অচেতন থাকে, যে তাই অসাবধানবশতই, আপনারে ধাক্কা দিয়া ফেলে ; তৎকালে আপনি, হে মহানুভব, তাহার দিকে ঈষৎ তাকাইয়া ঝটিতিই আবার কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যগ্র হন ; অন্যপক্ষে সেই বালক কৃশ হওয়ত, রুগ্নবদনে, কিছু এক বোধ তাহার নিতান্ত দরকার কেন না আপন অন্তঃস্থিত অন্ধকারকে সে ভয় পাইতেছিল এবং তাই অন্য বোধ অভাবে কিছু সময় নিজ দুষমনী বোধে নিশ্চল ছিল – কেন না যে সে হয় জাতিতে ডোম ; তবু সে এইটুকুন তাহার সপক্ষে বলিতে নিশ্চয়ই একশা, যে তাহার দিকের খবর নাই, এমনও যে, এখন দিনমান কিম্বা নহে ইহা, অথবা কোনটি তাহার বাম হাত তাহা, সারা কিছুই উহার জ্ঞানকাণ্ডবহির্ভূত অধুনা ; যেহেতু সে আমাদিগকে আকুল হইয়া খুঁজিতে আছে ; বেচারী দৈবদুর্বিপাকবশত আমাদের কাছ-ছাড়া,

আমাদের সান্নিধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন। সুঘরাই তাহার নাম, বেচারী হারাইয়াছে— হায় যে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী নগরীতে মানুষ আপনারে ফিরিয়া পায় সেইক্ষেত্রে সে হারাইয়াছে, এখন যুদি ।

এই অবধি ভাবিতেই সুঘরাইএর চোখে মোহিলির বহু পুরাতন শতছিন্ন জুতার ন্যায় মুখখানি প্রতিভাত হয়; এখন মোহিলি হয় একজন গো শকট চালক। যেটিতে সে এবং মনিবদ্বয় আরোহী ছিল, মুখ্যত ইদানীন্তন বিপর্যায় ও দুর্গতি মোহিলির নিমিত্তই ; সে যাহা এই যে, গরুর গাড়ী রিপিয়া হইতে বেশ আসিয়া উত্তরিল. বিলাসীর চৌরহাতে—যে স্থলে পুবে দুমকার রাস্তা পশ্চিমে জসিডি বরাবর ; যেখানে তাহারা সকলেই—হর হর মহাদেব, জয় বাবা বৈদ্যনাথ ধ্বনি দিতে যাইবে, তৎসহ গললগ্নীকৃতবাস মনিবপত্নী সন্নিহিত বেলবৃক্ষের পত্রোদ্গম শোভা দর্শনে 'আহা' বলিবেন, যথার্থ লক্ষ্যকারী ধ্বনি সেইখানেতেই, অতর্কিতে কূর্ম্মপৃষ্ঠ জমির নীর্যভাগে, দেখা গেল কে একজনা ভূমি ছাড়িয়া অনেকটা লাফ বারম্বার দিয়া উঠে ; লম্ফকারী সেইজন আপন বক্ষদেশে ঘন ঘন মরিয়া হওয়ত একটি হস্ত দ্বারা আঘাতিছে, এবং সে বেদনায় চীৎকার পাড়ে, কান্না যেমন, কিন্তু চোখে জল নাই ; আর 'ওহো সুঁই' কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠে।

এতাদৃশ সংঘটনে ভোরের মনোলোভা সমীরণ স্তোভ ছিল ; এতাদৃশ নাটকীয়তায় শহরগামিনী সারিবদ্ধ সাঁওতাল রমণীকুলের গতি ব্যাহত হইল, ঐ লোকটির কিম্ভূত ব্যবহারে দারুণ আকৃষ্ট যে উহারা উহাদিগের সুমহান মুখ-মণ্ডলে অবিশ্বাস্য ত্রাসজনিত কাতরতা আছে, উহারা আতঙ্কে তাই যে তদানীন্তন কালে তাহাদের কবরীস্থ ফুলসকলে আপন আপন অঙ্গুলির মঞ্জুল সোহাগ থাকে।

যন্ত্রণায়ে উৎক্ষিপ্ত লোকটির ছায়া আরবী হরফকারী কাটিতেছিল, তজ্জন্য প্রায়শ ভগ্নস্বরে তদীয় সুতীব্র নিনাদ—উও হো সুঁই ! কথাটি আরও বিভীষিকা হয়। সুঁই শব্দ শ্রবণেই মোহিলি অব্যর্থ ই যে উৎপাটিত, গরুর দড়ি ছাড়িয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদানিল ; সর্ব্বনাশী আতঙ্কে উহার শিয়রে-বাঁধা গামছা খসিয়াছে, তথৈবচ অভিব্যক্তিতেই সে কহিল,—গে মাইরে হা মো কপহাড় ! এবম্প্রকারে মহা আর্ত্তনাদ করিল এখন উহার খুদে চক্ষুদ্বয় হাঁইয়া হ্যাদা, বুঝাইল, সে আর আগাইবে না।

সুঁই সুঁই রব চারিদিকে ; ইহাতে সকালের আকাশে খরা, পথগুলি হইতে পরিপ্রেক্ষিত মুছিয়া গিয়া কোথাও নীলিমার ভাবান্তরে কবরী কচিৎ ; সুঁই-এর ভয় মড়ক-অধিক, এ কারণ যে, তাহারা যে যারপরনাই কাঙাল ; সুঁই এক ভয়ঙ্কর রক্তচোষা, যে যাহার মাথায় দিন কয়েক নির্ঘাত অপটু তাহারা হইবেক। ইহারা শহরের কর্ম্ম অন্বেষী ; বেচারীরা প্রত্যেকেই 'হা হতোস্মি !' বিলাপে, ঐ শহরের প্রতি বড় গূঢ়তম বুক ভাঙা নয়নে চাহিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এখনই।

জনৈক ঐ উজ্জ্বল শহরের প্রতি তাকাইয়া, যে যেমন লোকপ্রসিদ্ধ বিরাট সনাতন দেউল তাহাতে সম্যক বিদ্বিত, সুতরাং সে আপন হৃদয়াবেগ জ্ঞাপন করিল.—পাপ! আমাদিগেরই পাপ, বাবা বৈদ্যনাথ দেবাদিদেব, কিন্তু কে সেই জন যে এ রূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিল যাহাতে বহু কোল নিড়াইবে, বহু ছন্নছাড়া হইবে; হায় কে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিল—সে কত বড় পামর; যে, সে যদি শহরবাসী হয় তাহাকে ধিক্, সে যদি বাহিরের মফঃস্বলের তাহাকে শত ধিক্; তুমি থাকিতে এত পাপ! জানি শত কুঠার আঘাতেও সুমহৎ বৃক্ষ যেমন ছেদনকারীকে ছায়া দিতে নিস্তেজ নহে, তদ্রূপ তুমি···তুমি জাগ্রত, তুমি উহাদের তোমার ত্রিশূল দ্বারা খণ্ডিত কর, সেই বিশ্বাসঘাতকের সমুচিত শাস্তি বিধান কর। আমরা শালা জাতে অধম ছোটলোক, আমরা আলেখ কীড়া, অনেক জন্মাই অনেক মরি, আমরা রোগের ঘর···কিন্তু অন্ত, সূর্য্য সাক্ষী, আমরা কোন রোগ বহন করি আনি নাই! আমরা দীন, আমরা অভুক্ত, শহরের যাহা অসৎ তাহা দূরে লই, আমরাই অসৎ···এ সময় ধান পাকিবে, বহু অচেনা পাখী আসিতেছে, কুয়ার জল যেক্ষণে স্বচ্ছ, এ সময় সুঁই-ভীতি আমাদের সম্বল, আমরা ভীত, আমরা কাঁদিয়া থাকি।

সুঘরাই উক্তিসকল যেমত দেখিল; আর মোহিলি এখন, মনিবদের পীড়া-পীড়িতে, উপরন্তু ইত্যাকার আশ্বাসে যে, ইহা সুনিশ্চিত শ্মশানের অপর পার্শ্বে দুধ-কাড়া ভওর সাধুর, যে প্রতি গোয়ালার নিকট হইতে আদায় করে, আস্তানার কাছেই সুঁই-এর ডেরা পড়িয়াছে, ফলে এক রশি মতন রাস্তা মোহিলি অগ্রসর হয়; পথ নিঝুম, গাড়ী রুখিয়া মোহিলি নামিল; শনৈঃ অত্যধিক সন্তর্পণে, পদক্ষেপে, শ্মশানাভিমুখে সে চালিতে থাকে; এবার সে অনেক নিসিন্দা ও আতা গাছের আবডালে, তদ্দৃষ্টে সুঘরাই মেরুদণ্ড টান করিল। অনন্তর কিছু সময় বাদে নিদারুণ বিকারগ্রস্ত মর্ম্মন্তুদ নখিলা রোল শ্রুত হইল, যে যাহা ক্রমে পশ্চিমের নাবাল ক্ষেত সরিয়া অল্প রেশ সম্প্রতি, কেহ সেখানেতে ছুটিতে আছে, সে আপাতত থামিল, যে হয় মোহিলি, যে এবং গরুর গাড়ীর দিকে মুখ করত জানাইল—যে শহরে যাইবে না, সুঁইওয়ালারা শ্মশানের এই দিকে, তাই ডরে আমি রাস্তা ত্যজিয়া ক্ষেতে, যে আমি মাটির যাতনা বটে, বড় কাঙাল বটে, আমি পলাইব, পলাইব হে!

মোহিলি না-বাগমানিতে মাথা দুলাইল, মনিবদের যথোচিত ভদ্র সুসঙ্গত অভয়বাক্যে মোহিলি সতর্ক চলনে ক্ষেত হইতে সন্নিহিত হইল, তাজ্জব যে, আপন চুটা ধরাইতে মনিব মহাশয়ের কাছে দেশলাই মাগিল; পরক্ষণেই ভূতচালিতের রকমে সে বাচাল, আরম্ভিল—হে রে শাললোঁ হরিজনরা, যে বেটা দুষমনরা চিনি যে কি তাহা জানে না, যে শয়তানরা হাঁটুর নিয়ে কাপড় পরিতে ভয় পায়, যে হাজতীরা বাপকে শালা আপন পুত্রকে খচ্চড় দিবানিশি সম্বোধন

করে, যাহারা মহিষের মাংস খায়, যাহারা ভাগাড়চারী শকুনের সহিত দাঙ্গা করে, মরা পশু খায়, হা মরি তাহারা লইবে মন্দিরের দখল! ঐ শাললো হরিজনদের জন্যই এই স্বঁই। হে বাবা বৈদ্যনাথ তুমি যদি সত্য, তাহা হইলে স্বঁই-এর পরও তাহাদের কলেরা হউক, যে চিঠি তাহারা করিয়াছে তাহারও কলেরা হউক, সবংশে তাহারা নিধন হউক এখন শালা চরকাবাজরা স্বঁই-বাচক। যাহাদের পাশে মেঘ অবধি বাঁজা হয়; ডোম চামার মেথর হাড়ি পাশি, যত শালা মাতাল ডুমনীগোর বদমায়েস, আংলিস খচ্চড়, গরুচোর ধানচোর, ও হো হো আমি জাত ভাঁড়াইলেও আমার স্বরত দেখিয়া চিনিবে যে, ওহো স্বঁই গে মাই, আমার আগে আমার ছায়া পর্য্যন্ত যাইতে যাহার নামেই ডরে, দেখুন হে আমার ছায়া বটে কীদৃশী ভয় পাইয়াছে, দেখুন উহা আমার পিছে মুখ লুকায়। আহো বাবা বৈদ্যনাথ দেখ, আমার তরাস এখন আছে, তুমি ধন্য

তথাপি যে মনিবরা অস্ত্র সাধাসাধনা করিলেন, হায় কোনই ফলোদয় ঘটিল না: স্বঘরাইএর দেহে সিঙ্কিড়া উপস্থিত, বধির কেরেট সাপ যেমন তাহার আশেপাশে, স্বীয় গ্রামের লোকের এরূপে ভীতি দর্শনে সে নিজেই দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল; ইদানীং সে চামার মোহিলির মুখমণ্ডল পাঠে সমাক উহারে বুঝিয়া লইতে ব্যগ্র থাকে; এই সেই চামার মোহিলি যাহার বাড়ীতে বিলাতী আমড়া গাছ আছে, যে হয় খুবই ঢ্যাঙ্গা, যে খুবই রোগা, যে হয় হাড়সার, সব তেমন তেমন আছে বটেই, তবে যে কি যেন উহাতে ছিল না।

যে তাহা ইহা, যথা যে—সেই যে চামার মোহিলি, যাহার বশে কত প্রেতাত্মা, যাহাকে কতবারই না দুর্ব্বোধ ছড়া কাটিতে সঙ্গেই কুশ-পেয়ের ন্যায় পা করিয়া ইব্রাহিম মিঞার ভুটে ঘোড়ার মূত্র ঝিনুকে সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছে; যাহাকে দেখিয়াছে এ মূত্রপূর্ণ ঝিনুক হাতে তদ্রূপ ছড়া উচ্চারণে, যে সদ্যজাতককে ইলড়া ভূতে পাইয়াছে অথবা যাহাতে না পায়, তাই উহা খাওয়াইতে গিয়াছে—ইহা তাহাদেরই মারণ জাতীয় ভূত যাহারা নবজাতকে বিকলাঙ্গ করে, দুমড়াইতে থাকে।

ঐ ঝিনুকসহ তাদৃশ কায়দায় মোহিলির মন্থর গমন, কি পর্য্যন্ত ভাবগম্ভীর, যে সে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ কিছুতেই করে না, উহার পিছনে তখন গাছে পাতায়ে ভীষণ ভূতুড়ে দৌরাত্ম্যের শব্দ ও কাণ্ড ঘটিতেছে; কি আশ্চর্য্য রহস্য সে! আর এই স্বঁই ব্যাপারে নিজেই শঙ্কিত, বেপথু শরীরে উহার! ইহাই কি সেই মোহিলি যে যাহার ঘুনসীতে সকলের শুভাশুভ বাঁধা ও নিশ্চিন্দি, যে যাহার চক্ষে জনা-জাতের ঘুম লাগিয়া থাকে। রাত্র যাহার দাসানুদাস।

মোহিলির বহমানতা লুপ্ত হইতেই, এতক্ষণকার, সেই রিঝিয়া হইতে প্রীতিময়, বিশেষত এই কারণে যে একদা মোহিলি জানাইয়াছিল, যে এক একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ আছেন যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, যে রহস্য তুমি শুনিয়াছ তাহার সবিশেষ

তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসুকে তাঁহারা বলিতে পারেন, বৈগুনাথে যখন যাইব তখন আমরা, তুমি আর আমি, তেমন তেমন মহাপুরুষ দেখিলে তাঁহার নিকট নিবেদন করিব, ইহাতে আমরা জন্মান্তরে উঁচু ঘরে জন্মাইব। আমরা নিশ্চয়ই জন্মাইব···।

ইহাতে কি যেন ভাবিয়া সুঘরাই কহিল,—যদি শুনিয়া অচৈতন্ত হয়।

মোহিলি উত্তর করিল—জানি তাহারা অজ্ঞান হইবার নহে।

যদিও মোহিলি এই কথার মধ্যে মধ্যে কাশিতেছিল তবুও সে আবছায়া সুঘরাইএর চোখে এবং ঐরূপ প্রস্তাবে তাহার, সুঘরাইএর, দেহে নিয়মরহিত। সুঘরাই অন্যত্রে, তখন সে প্রত্যক্ষ করিল, অদূরস্থিত সৌখীন টেবিল ল্যাম্পের আলো আশ্চর্য্য অহেতুক হঠাৎ বর্দ্ধিত হইল। ইহাতে তাহার কণ্ঠস্বর ব্যাহত নয় যাহা একটানা ভিখারীবৎ ছিল; দ্বারদেশে থাকিয়া সে রহস্য-কথা বলিতেছিল আর যে তাহার পশ্চাতে দরজার উৎকৃষ্ট চিন্‌ৎসের ফুলকারী পর্দ্দা উড়িতে থাকে এবং বাহিরের সাঁওতাল পরগণার বিচিত্র অন্ধকার অনুভব হয়। চিপ এণ্ড ডেল রীতিবিশিষ্ট ছোট টেবিলের সামনে মনিবপত্নী, যিনি এখন পুত্র ও কন্যাকে চিঠি লেখেন, হালকা ফলসা রঙের চিঠির কাগজের পাশেই তাঁহার বাঁ হাতখানি আড় করিয়া রাখা যেন কোন প্রসিদ্ধ আর্টিষ্টের কাজের খানিক, কিন্তু অঙ্গুরীয়র চুনীর উজ্জ্বলতায় ঐ ভাবনা আর থাকে না, মনে হয় ইতিহাস একদা ভয় পাইয়াছিল; ডান হাতের কলমটির প্রান্ত সুমহৎ তাঁহার অধরে ছোঁয়ান; সামনে চমৎকার গিল্টকরা ফ্রেমে, নাবিক পোষাক পরিহিত কিশোর বালকের ছবি ও ইহারই পাশেই, একই ফ্রেমে, বালিকা কন্যা মেষপালিকার বেশে; এই কল্পনাকে তাহার জীবনপণ নৈতিকতায় বাঁচাইবে। তাহারা ঝরণা দেখিতে ছুটিয়াছে; ইহাদের সুঘরাইএর পক্ষীবৃত্তান্ত জানাইবার জন্য মনিবপত্নী উন্মুখ ছিলেন। সুঘরাই বর্ণিতে আছে, স্বরে তাহার জড়তা নাই, কিন্তু ছোট দেহখানি তাহার অস্বচ্ছন্দ, সে কহিল—মোহিলি অদ্ভুত গলায় বলিল, এখন তোমার পাখীতে যে রহস্য গোড়া বাঁধিতেছে সাবধান···এবং তাহার জবানীর মধ্যেই টেবিলস্থ আলো কেমন করিয়া উঠিল; মনিবপত্নী এই কথা শোনামাত্র চেয়ার ছাড়িয়া দণ্ডায়মানা, তাঁহার দেহ কোন প্রহেলিকা প্রভাবিত মৃদু টলিতেছিল, ফুলদানীর গোলাপ-গুলি যেগুলি অনেক অনেকদিনই ভাবানুষঙ্গের সূত্র, তাহাদেরকে তিনি তদীয় সুষমামণ্ডিত বাম হস্তে আঁকড়াইতে চাহিলেন এবং শুধুমাত্র বলিয়া উঠিলেন, শুনছ শুনছ শিগ্‌গীর, ইহাতে তখনই পাশের কক্ষে একটি কাঁচের গেলাসের আঘাতের আওয়াজ হইল; পরক্ষণেই মনিব মহাশয় আসিলেন, আজ্ঞা করিলেন সুঘরাইকে, তুই যা—ইহা বলিয়া তদীয় সহধর্ম্মিণীকে ধরিতেই যিনি অচৈতন্ত হইলেন, সাবধানে চেয়ারে তাঁহারে বসাইয়াই তিনি স্মেলিং সল্টের শিশিটি আয়না দেরাজ হইতে তুলিয়াছিলেন; এবং অতঃপর ও-ডি-কোলনের এটমাইজারটি লইয়া কহিলেন, না না উঠিও না, মাথায় কাপড় দিবার কোন

দরকার নাই···আবার সযত্নে তাহাকে বসাইয়া দিয়াছিলেন ; পর্দ্দায় ছায়া পড়িয়াছিল ; এবার এটমাইজারের শব্দ সহিত মাধব নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, কিছু বাদে মনিব মহাশয়ের ধীর আক্ষেপ শ্রুত হইল,···আমি ঐ ঘর হইতে সবই শুনিতেছিলাম, বুঝিয়া পাই না মধু ও বিলিকে এ খবর দিবার কি···অবশ্য সামান্য পাখীর পিছনে এ কথা থাকিবে তা তুমি বা কি করিয়া জানিবে···মাধব তারা ব্রহ্মময়ী !

তন্দ্রাচ্ছন্ন মনিবপত্নী কহিলেন—আমি ভেবেছিলুম ছোঁড়া জঙ্গলের গল্পই বলে থামবে'খন ! —অতঃপর বলিয়াছিলেন, আ মোহিনী মায়া !

ক্রমে যে পাখীর ব্যাপার সুঘরাইএর শুধু মাত্র অন্যমনা হওয়ার কারণ হইয়াছিল, সে এক কালো-র দিকে চাহিত, এক অচৈতন্যতার দিকে চাহিত বৈদ্যনাথধামে আসিবার সুযোগে মন্দির দেখা ও বিবিধ অনুষ্ঠান প্রতি আগ্রহ ছাড়াও ইহা তাহাতে প্রচ্ছন্ন ছিল। তাহা এই যে বহু পুরাতন সাধনলব্ধ আধ্যাত্মিকতাকে জড় তত্ত্বের উপর—যদিও যাহা এখনও বিস্ময়ের এবং আপাতত তাহা ভীতির—তাহার উপরই আরোপ করিতে পারিবে—যেমন শিল্প ধর্ম্ম সরলতা প্রকৃতিতে আরোপিত হয়। ভক্তিপ্লুত ভগবদারাধনায়ে তীর্থযাত্রার মধ্যে অনতিদূরস্থ ঐ বৈরাগ্যজননী অমৃতবর্ষী শহরবিষয়ক যে ধারণা তাহাতে, সুঘরাইতে, উত্থলিতছিল, উহাই অধুনা অসহ্য স্ফোটকে পরিণত হইল এখন যেন মনিবরা নাই, আসমুদ্রহিমাচলখ্যাত মন্দিরের শীর্ষ দেখার মানসিকতা অবলম্বনহীন অবাক্ গোঙানি হইয়াছে ; যে এবং সম্মুখের গোটা শহরই রিখিয়ার বে-সিজিনের বাড়ীর তুল্য ফাঁকা, যেখানে তাহার কণ্ঠস্বরের হরেক প্রতিধ্বনি হয়, এখানেও তেমনই হইতেও পারে। অন্যদিকে মোহিলি ধাবনোৎসুকো দড়বড়ি গরুগুলি ঘুরাইতেছিল এখন, তৎকালে সুঘরাই উহারে, মহাজন এরূপ, তাহার নাড়ী অস্বর্থ, নির্ঝঞ্ঝাট আশ্রয় যথা, আত্মিক পারিবারিক কেহ ঈদৃশী সমঝে আছে ; অথচ যুগপৎ সে নিজে এমত কোন প্রদেশে, যেখানে মৃত্তিকার জঠর নাই, বৃক্ষদের অন্তঃস্থল দিয়া কোন আহ্বান ভেদ করিতে অকেজো, সে বড়ই একা, ল্যাংট, তাহার ভয়ও তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

এবং মনিব বলিতেছিলেন—আজব বুনো, জংলী !

মোহিলি যাইতেছে ; সুতরাং উপায়রহিত সুঘরাই এই বিচ্ছেদকালীন মুহূর্ত্তে, চামার মোহিলির অবয়ব যেন খানিক রহস্য কুহক চরিত্র তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টিসংযোগে টানিয়া লইতে বদ্ধপরিকর হইল, কিন্তু হা হন্ত মোহিলির যাবতীয় গোপনতা, যে ধর্ষিত হইয়াছিল। অথচ মোহিলিকে এখন কি খাসা দেখিতে, ভয় তাহাকে সুন্দর করিয়াছে—আর সে তাহা প্রত্যক্ষে অবাক !

মনিব মহাশয় কহিলেন—তীর্থে আসিয়াছি তাই কিছু বলিতে চাহি না, নিশ্চয়ই বৈদ্যনাথের ইহা অভিপ্রেত ! ও আপন পত্নীকে বলিলেন, তখনই বলিয়াছিলাম সহিসের জর ছাড়ুক।

ইদানীং সুঘরাই, কাষ্ঠচ্যুত কূর্মবৎ অবস্থায়ে যে সে, ইহা অনুমান তাহার হয় ; তবু সে ভাবে ইতঃমধ্যে অবশ্য, যে মোহিলি, আপনার চমকপ্রদ ভীতি যাহার কণামাত্র খোয়া যায় নাই, তাহা লইয়া ক্রমাগত আপনার রহস্যের অভিমুখে সেই গানখানি গাহিতে থাকিয়া হাল্লাঝুরি পার, মাঝে-মধ্যে গরু জোড়া হাঁকানোর শব্দও হয় :

পিয়া যব যাওবে রিখিয়াকে হাটিয়া
কুছ কিন্‌ইহ সুন তামাকুল
কুছ কিন্‌ইহ ধন্‌ইয়া — বল্‌
হা পিয়া হা পিয়া হামরা খাতির মুখ মুছানির গামছা কিনি লিয়া
পিয়া পিয়া যব যাওবে··· ।

আঃ কি খাসা গীত, কাঁড়ার গললগ্ন ঘন্টির ধ্বনি, এ-গে-নসুয়ারে ডাক, শেষরাতের মোরগের ভাঙা স্বর, ছায়ার পরিবর্তন, শীতের কুয়ার জলের উষ্ণতা, সর্পের গতি সবই ঐ পদবন্ধের ভাবেতে, এমনও কি ঐ গীত-জাত উদ্দীপনার মধ্যে, নোসটালজিতে, সান্ধ্যভ্রমণের চেঙ্গাররা, কমেডির ভুল উদ্ঘাটনে, জানার হেতুতে যাহারা নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে এবং যাহাদের কর্তব্য আপনি স্থিরীকৃত সুখে ভ্রমণ করে ; স্থানীয় খুন খারাবী হওয়াতে তাহারা বীর ; ইহারাই তাহারা যাহারা আধো চন্দ্রালোকে নিঃসঙ্কোচে এক ইউক্যালিপটস গাছের নিম্নে সমবেত হইয়া দাঁড়াইয়া পাতার আওয়াজ শুনিয়াছে, সকলেই চুপ ছিল, একাগ্র থাকে ; কেহ নিষ্ঠ হওয়া কারণে চশমা মুছিয়াছিল ; অল্পবয়সী ও শিশুতে চপলতা নাই ; পাতার আওয়াজ হয় ! — ধিক্‌ তাহাদেরকে যাহারা ইউক্যালিপটসের উপকারিতা বিনাইয়া থাকে ! তাহারা অধর্ম করে — এইরূপে চেঙ্গারদের অনেক সময় গিয়াছে ; একদা কেহ ঘড়ির রেডিয়ামের স্পষ্টতা লক্ষ্য করত কহিলেন, — কবি বলিয়াছিলেন প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাও। ইহা হাস্য উদ্রেক করে নাই কারণ ইহা ব্যক্ত করিতে কুহক স্বরভঙ্গ ঘটিয়াছিল — যাহা মিনতি ও কাতরতা মিশ্রিত, ইহাতে সকলেই বহু উর্ধ্বে ইউ-ক্যালিপটসের হাল্কা পাতাগুলির দিকে — এইগুলি গাছটির স্বদেশ, ঐদিকে চাহিয়া অনুভব করিলেন যে তাঁহারা সকলেই ক্লান্ত ; ইহা কলিকাতার ক্লান্তি ; অথচ ইহা ঠিক যে তাঁহারা এখন বৈদিক আত্মসমালোচনার বাহিরে, অতএব এই তত্ত্ব নিশ্চয়ই বিচারিত হয় না যে অনাসক্তির বীজ লইয়া তাহারা কেবল দৌড়াইয়াছে (দৌড়াইয়াছে শব্দটি কত কত মাটির, অথচ এ ক্ষেত্রে ? আঃ মানুষের নশ্বরতা !), ইহারাই কি সেই যাহারা শূন্য-কে ছিল বলিয়াছে !···পুনরায় শ্রুত হইল প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাও ! ইহাতে এই বাক্যগঠনে চোরা রাজসিকতা আছে, দর্প রহিয়াছে, যে প্রকৃতির বাড়ী যেন আদি বক্তার নখদর্পণে ! এবং এখন তাহারাও আত্মম্ভরি-তায় পৌঁছাইয়াছে, তাহাদের প্রশ্বাসে পত্ররাজি শুষ্ক হয়। তাহারা চরিত্রকে

ছাড়াইতে পারে নাই, মানুষ কি আলেখ নেশা! যেই কেন উহা ঐ গীত হউক, যে চাঁদ অস্থির হইবেক ; ঐ গীতের দিকেই সে আছে, তাহার পোষ মানা ভয় আছে তাহার ঘর যে এবং।

এখন এই ভাবনা প্রভাবিত হইয়া সে অধিক হতাশায়ে সজল নেত্রে উত্তরের আকাশের ঠিক লইল, যে কেমনে সে যে বাড়ী ফিরিবে ; এখানকার এই শহরের সমস্ত বস্তুই, ও যাহা যাহা কল্পনাসাপেক্ষ, শ্বাসরুদ্ধকারী বিরাট অহরহ, ভিখারী কুষ্ঠরোগীর ক্ষতে ক্ষিপ্ত কুকুরের মাড়ি দেখা যায়, প্রতি কিছুই করাল উত্তুঙ্গ প্রাচীর ; বিখিয়া চার ঘুমের পথ, হাটবারে ছাড়া চিঠি বিলি-না-হওয়ার দূরত্ব বর্ত্তাইয়াছে ; সুঘরাই মাটির উপর চলিতে চাহিতেছিল, যে মাটিতে ভেংগীল বসে, ডাকে ; পায়ের তলায়ে সে চাহিয়াছিল মাটি, শহরে যাহা মাথার উপর ; এ শহরে মাথা ঠুকিয়া কান্দিবার সুযোগ নাই ; হাস্য অনুমোদিত অথচ।

হঠাৎ এই বৈলক্ষণ্যের সময়েতে তাহার কানে গেল, কোন শুদ্ধাচারী বলিতেছে, যত শালার ছোট জাতের মরণ, ছুঁইও না ছুঁইও না! তৎক্ষণাৎই সরিয়া দাঁড়াইবার মতন জন্মগত সৎ স্বাভাবিকতা তাহাতে কাজ করে নাই যে যাহা, যদি সে দুক্ষশীর্ষে থাকাকালীন অমন তাড়না শুনে, তবে ঝটিতিই সে মান্য করিতে উদ্যত হইতই ; কিন্তু এখানে তাজ্জব এই, অচিরাৎ বেশ তিলেক পরেই, উক্ত তাড়না নিমিত্ত, দেখা গেল যে সে কান নাক মলিতেছে আর ছুটে। সে জানিতে চাহে না ঐ তাড়না কাহার উদ্দেশে, অবশেষে এবং যে সে বেসামাল, এবং সে পতিত। তদবস্থ সে পশ্চাতের পানে ত্রাসযুক্তলোচনে ও তৎক্ষণাৎ খুসীতে বারবারই নজর লইয়া থাকে।

আসলে, অপ্রাকৃতিক ভয় যে কি কারণে, খুসী যে কি জন্য, তদ্বিষয়ে ভ্রূ কুঞ্চন এমনও যে ঘটে নাই, যেহেতু অদ্ভুত ঘোরে; রক্তগত সে ছিল, তাই যে সে খালি প্রতি পদক্ষেপেই বলিতেছিল – শালো হারামজাদা চামার মোহিলি মানুষের জুতা হইতেও জাতিতে নীচু, তোমার জন্যই অদ্য আমার এই দুর্দৈব! ক্রমে এইরূপে সে নিজেরেও হতভাগ্য নরকের কীট কহে, অভিসম্পাতে নিপীড়নে অবিরাম হেয় করিয়াছে। সে এইভাবে কোথাও দাঁড়াইতে চাহিতেছিল কেন না অনবরত সুঘরাইএর মনে হয় সে যেন বা মিলাইয়া যাইতেছে। নিশ্চয়ই মোহিলির খবর বিভীষিকা হইয়া তাহারে আঁচড়াইতেছিল ; যাহা যে শেষরাতে যখন বৃক্ষাদিও ঘুমায় তখন শিব নন্দীভৃঙ্গীসহ শিবগঙ্গায় স্নানে আসেন, যদিস্যাৎ কেহ তাহা দেখে সে কামারের চুল্লীর স্ফুলিঙ্গের মত নস্যাৎ হয়। ইহা মোহিলি দারুণ অঙ্গভঙ্গীকরত ব্যাখ্যা করে, ফলে সুঘরাই দেখে সমস্ত প্রকৃতি পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, শুধু সে জাগিয়া আছে! উপস্থিত মোহিলিসূত্রে তাহার সমক্ষে অনেক কিছু আভাসিত হইল, যাহা যথা – মোহিলি গাড়ীর মুখ ফিরাইতে তখন হন্তদন্ত, আর যে সুঘরাই দণ্ডায়মান মনিবের জুতা জোড়া বুকে ধারণে – কেন না দেবদর্শন

যাত্রায়, তীর্থে, উহা নিষিদ্ধ – এখন অপ্রত্যাশিত রোমাঞ্চিত বিধায় অসাবধানে একটি জুতা মাটিতে, অবশ্য সে তখনই তাহা কুড়াইয়াছে, কিন্তু এই কর্তব্যবোধের মধ্যেও সে বিচাল্যমান ঈষৎ উন্মনা ; যে মোহিলির প্রত্যাখ্যানের নির্দিষ্ট মুহূর্ত হইতে আপনারে মারাত্মক নিঃসঙ্গ বলি তাহার বোধ হয় ; যদ্যপি সে হয় ডোম, তৎসত্ত্বেও মোহিলি অনন্ত থৈ আছিল।

এমত ঠিক যে সে নিঃসঙ্কোচে অনায়াসে মোহিলির হাত ধরিতে পারিত কোন কিছু উৎসুক্যে, কোন কৌতুকাবহতে, বিশেষত কিছুর নাম মাত্রা আতঙ্কে; যাহা সে আর পারিবে না ; সুঘরাই ইহা লইয়া পর্যালোচনা হয়ত নির্ঘাত করিয়া থাকে, যে এই শহরে কাহারই বা সে হাত ধরিবেক, মনিব মহাশয়ের শত আতঙ্কেও না, যদিও মনিব মহাশয় ও তদীয় পত্নী অপ্রার্থিত হৃদয়বান সমস্তরূপে, সর্বদা যত্নও করেন, তাহারে গেঞ্জী কাপড় সবই দিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত সুঁইওয়ালাদের নগদ চার আনা পয়সা পান খাইতে দিয়াছেন।

আশ্চর্য কতটুকু সময়ের মধ্যে যে সে নিখোঁজ হয়, এ কারণ যে সে জাতি ঘৃণ্য ; যে অপিচ মনিব মহাশয় তাহারে যারপরনাই আড়াল করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডা ঠাকুর মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন – সে নেহুয়া কি জাত ছিকোরে তোরা।

ইত্যাকার সুমিষ্ট ভাষণ, অর্তাব শীল যাহা, তাহাতে সুঘরাই তুষ্ট ; পাণ্ডাঠাকুর মহাশয়ের যথারীতি সম্বোধনে ইহা পরিষ্কার যে, তাহাকে বুনো, তাহাকে ডোম জাতীয় মনে হয় না, যেহেতু তাহার মাথায় অনেক তৈল, যে জন্মাবধি সে চিনি খায়, সে ভালিম কি জানে, বেশ সোহাগের চেহারা বটে তাহার।

তবে, এই ধরনের প্রথমকার আবেগ কাটিতেই সুঘরাই বানচাল, যেহেতু যে এবং বহুবারই সে অগ্নি পোহাইয়াছে, সুমহৎ শিখা তাই এখন তাহার সমক্ষে, তাই তদীয় স্বল্পায়তনের দেহ শতছিদ্র, স্বেদোদ্গমে গেঞ্জী পরিপ্লুত, এই স্বীকারে সে বাধ্য, যে সে হয় ডোম – এই অপরাধ স্বীকারেই ; কিন্তু, সম্ভবত ঐ সঙ্গে যেমন ইহাও যে, যাহার জন্য সে বেচারী দায়িক না, এবং যে সে বা তাহারা ও মহুয়া গাছ একই ; কিন্তু তদ্ব্যতিরেকেও, তথাপি উহার সুঠাম অনার্য মুখশ্রী আরক্তিম কষায়িত ইত্যাকার মনোভাব তাহার পক্ষে অবিশ্বাসের। – এমনও যে কোন এক সত্য। অসাধনেই তাহার মস্তকে ঘোর করে, যে নানারূপ অদ্ভুতদর্শন যন্ত্রের, টিনকাটা চায়নার, বিটার ইত্যাদির পাশেই অনেক নানান আকারের চমকপ্রদ লেবেল আঁটা টিন, কোনটিতে কোনটিতে মাছের ছবি, হৃষ্টপুষ্ট সাদা শুয়ারের, কোথাও গরুর ! কতবার না এইসব টিন সে মহা উৎসাহে সাজাইয়াছে, মনিবপত্নীর আজ্ঞায় কাটিয়াছে। – এই ব্যাপার এইজন্যই যে হয়ত বৈষম্য তাহাকে এতদূর ভয়ঙ্কর করে।

পাণ্ডাঠাকুর ব্রাহ্মণ স্বভাবসিদ্ধ অনুদ্বিগ্ন শান্ত, যেমত যে, আর্দ্র সহিত আলাপনের স্বরক্রমে কহিলেন – তাহা হইলে, তবে, কিন্তু।

ইহাতেই যে মনিব মহাশয় কিয়ৎ আশ্বস্থ থাকেন, কেন না দিবালোককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে তিনি চাহেন নাই তিনি ধর্ম্মশীল, একদা আপন জায়ার প্রতি, যিনি অযুত শ্রীসম্পন্না ভক্তিমতী অধুনা মালাভপকারিণী, যিনি পূজারিণী, তৎপ্রতি অবলোকনিয়াই উত্তম শুভবুদ্ধিচালিত উত্তর দিলেন—হে ঠাকুর মহাশয়, মৎকৃত ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, ইহা সত্য বটে, যে এই হতভাগ্যের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শণে অশাস্ত্রীয়, যে উহার জল চলে না, তথাপি, যদিও মাদৃশ জনের আমূল পরিচয় আপনাদের নখদর্পণে, আমি বলি, আমি গৌড়ীয়—সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বংশ আমাদের, সেবাব্রত থাকা সত্বে বহুজনকে অন্নদান করিয়া থাকি, (আমি প্রভূত বিত্তশালী ঠাকুরের কৃপায় হইয়াও) ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করি, মানুন, আমি ত বটেই, ও মদীয় ভার্য্যা ইনি উচ্চ অভিজাত বংশসম্ভূতা, ইনি সত্বগুণবিশিষ্টা বহু বহু জন্মের তপস্যা দেবারাধনাজনিত সুকৃতি নিবন্ধন ইহজন্মে মা জননীর রাঙাচরণ আশ্রয় লাভ করেন, ইনি মা জননীর ৺শ্রীশ্রীমায়ের (শ্রীশ্রীনারদা দেবী) মন্ত্রশিষ্যা, ইনিও ঐ অধম দীনতম বেচারীকে অভাবনীয় স্নেহ করেন খুব স্বাভাবিকভাবেই ; তাহা ছাড়া ভগবান রামকৃষ্ণ আমাদিগের সন্দেহ অজ্ঞানতা বিদূরিত করিয়াছেন যে, যথা—সদ্‌ব্রাহ্মণ, যার কোন কামনা নেই, সে হাড়ীর বাড়ীর সিধে নিতে পারে। আবার বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণকিশোর অত বড় আচারী ব্রাহ্মণ কোন হীন জাতিকে তিনবার শিব শিব বলাইয়া হৃষ্টচিত্তে উহার হাতে জলপান করেন। তাই আমাদিগের সবই জল-চল, অবশ্য বিদেশ বলিয়া নহে, যাহা হউক সুঘরাই আমাদের সহিত চলুক, বালক কখনও শহরে আসে নাই, গাড়ীও নাই, শেষে কোথায় কি ঘটিবে, অনেক জন্মের পুণ্য অর্জ্জনে অন্ত সে এখানে দেবস্থানে, আর যে মদীয় পত্নীর কল্যাণে ধর্ম্ম ধারনা উহাতে আছে জানি, উহাকে এখন বিফলমনোরথ হইতে দিবেন না ; ঠাকুর মহাশয় দেখুন দেখুন উহারে দেখিতে নবীন কদলী কাণ্ডের ন্যায়, তেমনই মনোলোভা তেমনই নিষ্পাপ, সে কাহাকেও তিলমাত্র স্পর্শ করিবে না, এখন আজ্ঞা করুন। এবং যে তদ্বিধ প্রসঙ্গ পাণ্ডাঠাকুর মহাশয় শুনিতে তদীয় ললাটস্থ হোমজাত রম্য শৈবতিলক দেদীপ্যমান হইল, হর হর মহাদেব বলিয়া আদেশ দিলেন—ভগবান শঙ্কর গৌরবমণ্ডিত হউন, বাবা বৈদ্যনাথের নামে ইহা হউক, বেশ, বাবার দুয়ার অবধি যাইতে পারে ! ইহাতে মনিব মহাশয় উৎফুল্ল হওয়ত বাবা বৈদ্যনাথের জয়ধ্বনি করিলেন।

এতাদৃশ অনুমোদনে এবং জয়ধ্বনিতে সুঘরাই, আহ্লাদে তাহার মনে পড়িল, যে সে পদ্ম দেখিয়াছে, অথচ বস্ত্র, সে গাত্রের গেঞ্জী খুলিয়া তখনই পরিতে চাহিল, পঞ্চতীর্থবারিতে সে শুদ্ধ, তাহার তৈলসিক্ত মস্তকে পূত নির্ম্মাল্য আছে ; ক্রমে তাহারা সকলেই এক অভূতপূর্ব্ব মর্ম্মস্থলের নিকট, আর্ট যেখানে প্রকৃতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। যে সে এখন প্রাকৃতজনের চরম মনীষাদায়িকা শিবমন্দিরের

দুয়ার সমীপস্থ আছে, যে সে ঐ পুনর্জন্মক্ষয়কারী শিবপুরীর প্রাচীরে, এই প্রথম বিবেক তাহাতে, আর যে সে বিবেকনিয়ন্ত্রিত, অনেক অনেকবার মাথা ঠুকিতেছিল ; নানা মানুষের শ্লোকরাজি নানান প্রার্থনা, যথা ভগবান ইহার সুমতি দাও, ভগবান শঙ্কর অন্তিমে তোমার দর্শন পাই, তোমার শরণার্থী হে বৈদ্যনাথ, তদীয় কানে আসে অথচ সে অন্ধকার দিয়া ডাকিতে চাহিল এবং যখন আপনকার বক্ষদেশে এ মন্দির ছবি মুদ্রিত হউক এরূপ কামনায়ে যে সে আপন গেন্ডী খুলিতে যাইবে, হরি হরি যে তৎক্ষণাৎই তাহার কাল হইল, দুর্ভাগ্য উপস্থিত ! ঐ সময়েতে, অশ্রুতপূর্ব্ব গোল বিকিয়া দাবদাহ ক্রমে বিকট জিগীর গর্জ্জিল ; যে সে, সুঘরাই, গেন্ডী তুলিয়া অস্পন্দ, তাহার মনে উপভায় যে কাছেই নিশ্চয় কোথাও লস্কড় আক্রমণ করিয়াছে, নিমেষেই এহেন অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ গলিতে এক দারুণ সঙ্কটজনক অবস্থা ঘটিয়া উঠিল, অগণন নিরীহ তসর গরদ মটকা কেটে রেশম পট্টবস্ত্রশোভিতা রমণীগণ চকিত হইলেন, বাঙলী নয়ন কালীঘাট হইল, ইহারা সকলে সক্ষুব্ধ, নথ দুলিল, কর্ণভূষণ ব্যতিব্যস্ত, কঙ্কন বাজিল, গললগ্নীকৃতবাস শিথীলকৃত, চোখে চোখে বিভ্রান্ত বিদ্যুৎ, পূজাউপচার-সকল হস্তচ্যুত হওনে অধোদেশে মাটিতে, পাত্রভ্রষ্ট কর্পূর ভূমিতে জ্বলিতেছে, ধূপ যেখানে সেখানে, ফল গড়াইতেছে, দুগ্ধ পড়িয়াছে, ফুল ও মালা সমুদায় নয়ছয়, কচি বিল্বদল ছত্রাকার, কতক কুৎসিতদর্শন পা ঐ সকল সৌন্দর্য্য মর্দ্দন করিতে থাকিয়া আইসে ; ইহারা হরিজন, ইহাদের প্রত্যক্ষে শুদ্ধাচারী পুরুষগণ ইহারা কেহ মহামহিম্নঃস্তব, অন্য কেহ নির্ব্বাণষটক, কেহ কৌপীনপঞ্চক কেহ শিবস্তোত্র আবৃত্তি রুদ্ধ করিয়াছেন, কেন না অহিতকারীরা ভীমনাদে চীৎকার পাড়িতে লাগিল।

সুঘরাই যেমত হতচেতন, সে বিস্ফারিত নয়নে হেরিল, কীদৃশী ভয়ঙ্কর মদমত্ততা ! এক সঙ্গে এতেক নোংরা আকৃতি সুঘরাই কদাচ দেখে নাই, প্রতিজনের মুখমণ্ডল বিশেষত কণ্ঠলগ্ন মাল্যে অধিক জঘন্যদর্শন হইয়াছে, ইহারা যাহারা শাস্তির ভয় পায় অথচ কভু জিহ্বা দংশন করে না, ইহারা তাহারা ভক্তি যাহাদের বক্ষ হইতে তের নদী পার ; ইহাদের বেচারীদের পরণে ঠেঁটি, কণ্ঠে জবা কুসুমাদি মাল্য, ইহারা বহু যুগ অভুক্ত, ইহাদের কাহারও কাগজ নাই, উহাদিগের গাত্রগন্ধ উৎকট যেন মহুয়ার থৈল পোড়া গন্ধ, উহারা অস্নাত, উহারা যাহারা সন্ধ্যায় স্থির হয় না, তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করিতে উদ্যত, বহু শতকের ভীতিতে এখন তাহারা বিষধর জ্ঞানরহিত। ইহারা বেচারীরা স্বার্থোদ্ধত পন্থা চালিত ধর্ম্মার্থে শহীদ হইবেক, ইহারা সকলেই মদ্যপ এবং যে নানাবিধ নেশা বিজড়িত, এখন ইহাদের নেশা আড়ান কণ্ঠে ইহারা যাহাদের ছন্দানুবর্ত্তী সেই দুষ্টমতি নেতৃবর্গের নাম ঝটিকা দিতেছিল, যেমন যাহা কুৎসিত অশ্লীল পদ, নামগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে কি তাহা পাণিনি জানেন ! এই ধুরন্ধরেরা

নেতৃবর্গ আদতে নীচযোনি কিরিঙ্গীপ্রসাদ, ইংরাজ শালাদের দাস, এই সকলের নামে আকাশে বাতাসে তড়কা লাগিতেছিল ঐ বেচারীদের প্রমত্ত রোলে, ইহারা নিম্নজাতিরা ঐ ধূর্ত্তদের প্ররোচনায় ভয়াল, তথাপি সত্য বটে ইহাদের কাহারও কাহারও চোখে অশ্রুধারা ছিল। যে এবং ক্রমেই ইহাদিগের অপ্রতিরোধ্য চাপে বিপ্রকর্ষণে সকল কিছুই বিধ্বস্ত এমত, সকাল কুজ্ঝটিকা হইল ; বহু আর্ত্ত বহু কৃষ্ণ হা হা রব করিল, যে শিবের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে যে সুলক্ষণা উমারূপিণী ষড়ৈশ্বর্যময়ী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কন্যারে শঙ্খ মঙ্গলাচারে লাজবর্ষণে ঘন ঘন উলুধ্বনি ও গীত ও নৃত্যবাদ্য সহকারে আনয়ন করা হইতেছিল তাহাও রাবণিক পাশবিক কদর্য্যতায়ে লণ্ডভণ্ড, হায় অলৌকিক বিবাহ ! হা লজ্জা ! উহারা অলৌকিক কন্যার মস্তকোপরি কিংখাবের চন্দ্রতাপ অপহরণ করিল, আপনাদের মধ্যে কাড়াকড়িতে যাহা শতচ্ছিন্ন হইল, কন্যা কিছুক্ষণ ন যযৌ ন তস্থৌ, ঝটিতি উন্মত্তের ন্যায় দ্রুত দৌড়াইয়া অর্গলবদ্ধ মন্দিরস্থ সদর দ্বারে আঘাত করেন।

যে সকল শিশুদেরকে ত্রিনয়নের চরণ বিধৌত বারি সিঞ্চনের বিধানে স্নানা হইতেছিল তাহাদের অবস্থা সঙ্গীন, কৃষ্ণ তারস্বরে ডাকিয়া উঠে, ইদানীং এক ভীমকর্ম্মা নৈরাজ্য মথন হইল ; যে, সব মহামূল্যবান মণিময় খচিত স্বর্ণভৃঙ্গ কোথাও বা স্বর্ণ রৌপ্য থালি পতিত, কখনও বা খোদাই করা অত্যুৎকৃষ্ট মর্ম্মথালি চূর্ণীকৃত হইয়া রাস্তায়ে, বিভিন্ন দেশের স্মৃতি তুচ্ছ হইয়াছে ; এবং হীরক সমন্বিত ও বিবিধ রত্ন মণ্ডিত ত্রিশূল, আরও যে অপরূপ-দর্শন নীলা পান্না অলঙ্কৃত বৃষ, এতদ্ব্যতীত যাহা যথা আশ্চর্য্য রাজসিক স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিক জপমালা যে এবং সর্ব্বোপরি অলোকসামান্য মহাদ্যুতিময় চন্দ্রকলা যাহা মনন মাত্রই বহুপুণ্যে সর্ব্বগুণযুক্ত জাতি শ্রেষ্ঠ হিন্দু জন্ম সার্থক হয়—যে কোন-র নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে পারে, এখন যতেক সম্ভার অর্ঘ্য ভূলুণ্ঠিত। এখন সেই সেই লোকেরা কেহ কেহ ক্রন্দিত কেহ সভয়ে অগ্রসর হয়, আর কেহ কেহ ঐ অমূল্য নিদর্শনগুলি আত্মসাৎকরণে কিল্‌কিলা রব করিল, এহেন বিবৃত্তপাকে অসংখ্য পায়ের ফাঁকে কশ্চিৎ কিম্ভূতদর্শন মুখোসধারীও লুণ্ঠনে ব্যগ্র, নেতৃবর্গের বিদেশী ঘড়ি শোভিত হাতও কর্ম্মতৎপর, আর যাহাদের বাহুতে সূঁইবিদ্ধ-ব্যথা তাহারা জিগীর আস্ফালনে জেংগীল পাখীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করে।

এখন ঐ তাণ্ডব সঙ্ঘটনে বেচারী সুঘরাই মহা বৈচিত্র্যে, যে সে কোনদিকে যাইবেক ভাবনায়ে বিশৃঙ্খলতা ; নির্ঘাত ইহা, ঐ দেবস্থানের পবিত্র সৌরভ ত্যাগ করি যাইতে সে অভিলাষী না, কিন্তু বেচারী মন্দভাগ্য। কাছের এই পৈশাচিকতায়ে সে অসুখী, সে বিভীষিত অথচ অবলীলাক্রমে সুঘরাই বুঝিল যে সে উহাদের একজন, সেও নিশ্চয়ই উহাদের একজন ! অতএব আপনারে বাঁচাইতে সুঘরাই নিয়তই সরিতে পদক্ষেপ করে, অথচ তন্মুহূর্ত্তেই সে যেন

ভূতগ্রস্ত উহাদের মতই জিগীরও দেয়, এই সে কিল্‌কিলা রব করিল, এই সে আর্ত্তনাদে বিকট ; নিজেই নিজের বাদ সাধিল, ঘোষিতে চাহিল যে আমি উহাদের একজন। খানিক বাদে দেখা গেল ক্রমাগত পাণ্ডাঠাকুর মহাশয়রা নিজ নিজ ভৃত্যগণসহ দ্রুত পদসঞ্চালনে এখানেতে আইসেন ; সম্প্রতি যমের অরুচি বৈপ্লবিক নেতৃবর্গরা পিট্টান দিল, কেন না অভিনব ধর্ম্মার্থীদের উপর বেধড়ক দুরমুশ আরম্ভ হইয়াছে।

যে অবশ্য, সে এই বৈগুণ্য ঐরূপে নিজেকে কবুল করার বৃত্তি একদা যে কাটাইয়া উঠিয়াছে ইহা সম্যক তাহার উপলব্ধি তখনই হইল যখন সে বেশ ব্যবধানে : এবার পলায়নের কথা ; এবং অজস্র জটিল গলি সে ঘুরিয়াছে, এক একটিকে সে উপর্য্যুপরি বেড় দিয়া থাকে, এ কি বিড়ম্বন। তাহার স্বভাবগত সরলতায় সে পতঙ্গের প্রায় ; এই সঙ্কীর্ণ পথে কেহ কোথাও নাই শুধু দেওয়াল পরম্পরা। পূর্ব্বাহ্নের হিরণ্যকশিপুর দুঃস্বপ্ন তাহার হাসি কান্না শোষণ যেমন করিয়াছে ; কেবল দুর্জ্ঞেয় অশ্লীল ভীতি তাহাতে অথচ, উপস্থিত এই ধন্ধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ মানসে সে ছুটিয়াছিল।

হঠাৎ এক সময় সাহসভরে সুউচ্চ বাড়ীগুলির শীর্ষে নেত্রপাত করিল, সে সূর্য্যালোক দেখিলেক, নিম্নে গলিময় যে ধূসর কুয়াশাচ্ছন্ন যেমন তাহা প্রত্যক্ষ হইল, বুঝে ইহা পাণ্ডা পাড়াই ; আর খানিক অতিক্রমে যে সে স্তব পাঠের আওয়াজ পাইল, ইহাতে এবং সে যেন বহু দূরের শাল গাছের পিছনে ; যে সে পায়রার কলরব বুঝিল, যাহাতে যেন কাহারও নাম ; যে সে সন্তস্নাতা অনুক্ত স্তোত্রে কোন বিস্ফুরিতাধরা রমণীকে কলস কাঁকে আসিতে দেখিল, যুগপৎ অন্তরে বিঘোষিত হইল, আঃ জল ! জল ! এই বশম্বদ আপনাকে চিনিল যে এবং তদীয় সটান-বুনটে-থাকা প্রত্যঙ্গসকল শ্লথ হয় ; আর তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত ইহা ধ্রুবই যে সে আর অধম নয় যেহেতু সে বাঁচিয়াছে।

কিন্তু তত্রাচ সে অতিষ্ঠ এ কারণ যে, কুহকময় বাড়ীর ঘোর, গলির তির্য্যক গতি, হাই উঁচুতে গবাক্ষে লাখবন কাঞ্চন জিনি যুবতীর আনন ক্বচিৎ দৃশ্যমান এবং বিশেষত পথিপার্শ্বের বীভৎস নর্দ্দমা ও পাইখানার নাড়ী-মোচড় গন্ধ – যেখানে ইতঃমধ্যেই তাহার বিগত সংজ্ঞা-বিঘাতক-অভিজ্ঞতা পচিয়া বিকট – ইহা সমুদয় মিশ্রিত হইয়া তাহার কায়িক অশান্তি ঘটায় ; ও ইহাতে তাহার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা, যদিও সে নবীভূত এক্ ঘটনা নিজেই, অধিকন্তু যে সে পথের ঠিকও পাইয়াছে যদিও। সহসা এক সময়ে যে সে আপনকার করতল নিরীক্ষণ করিল যাহা শূন্যই, যেমন কিছু ছিল, যেন কিছু খোয়া গিয়াছে এই বিবেচনায়, অনুভবে, পশ্চাতে অসহায়ভাবে তাকাইয়াছে ; আর সে স্থানীয় ভৌতিক গন্ধকে অব্যাহতি লাভে মরিয়া যে কিন্তু সফলকাম নহে।

কোন রকমে সুঘরাই শিবগঙ্গার কাছে ; প্রথমেই ইহা সহজ হয় যে সে এতাবৎ শ্বাস যাতনায় অস্বাহি ছিল, যে যেমন তাহার অন্তর বাহির কুশ্রী গন্ধের ঘর, তাহার সমগ্র দেহ সীসক পরিপূর্ণ, উপরন্তু সে হঠাৎ মৃগী রোগাক্রান্ত রাত্র, যাহা বিস্মৃত সম্প্রতি, ভেদ করত এখানে সে সহজ ; সে পুতঃসলিল ঐ মহিমান্বিত জলাশয়ের পানে অনিমেষনয়নে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেক—আঃ কত কত পাহাড় পাঁহাড় জল, আঃ কত কত আমি। যে এবং ইদনীন্তন আমি শব্দকে সে ডরিল না যাহা চমৎকার অনুরণন তাই এখানে ওতপ্রোত হইল কোন একজন ব্যক্তি এই পবিত্র জলে, অধোভাগ নিমজ্জিত যাহার, কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধলোকের দিকে নিষ্পলকদৃষ্টিতে ছিল, ইহা স্পষ্টই সে উদকক্রিয়ায় ব্যাপৃত ঘাটেতে যাহার স্বজনরা, প্রায়ই স্ত্রীলোক শোকসঙ্গীত গাহে, এই ব্যাপারের নিকটে একজন সন্ন্যাসী সশিষ্য অবগাহন করিতে নামিয়াই ঐ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষে এবম্প্রকার উদ্বেলিত যে হা রাম হা রাম নিনাদে অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন, শিষ্যরা তাঁহাকে ধারণ করিয়াছে, এই সন্ন্যাসী তদ্ভাবাপন্ন আবৃত্তি করিতে থাকিলেন, হা রাম !···বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকেই বিকশিত কানন, তাহাতে মন্দাকিনী মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সীতা সমভিব্যাহারী পরম যশঃশালী রাজকুমারগণ সকলেই অতি কষ্টে তথায় গমন করিলেন অনন্তর তাঁহারা কন্দমশূন্য সুপ্রশস্ত ঘট্টে অবতরণ করিয়া 'এতদভবতু' বলিয়া পিতৃদেবের উদ্দেশে জলদানে প্রবৃত্ত হইলেন, রাম তৎকালে জলপূরিত অঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক, দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন—হে রাজশার্দ্দূল পিতা ! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন ; অতএব এক্ষণে আপনার উদ্দেশে মদ্দত্ত সুনির্ম্মল জল অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে উপস্থিত হউক !··· এখনই শিষ্যরা 'ওঁ রাম' ধ্বনি দিল। অবশ্যই ইহারা রামায়েৎ। সুঘরাই এই রামকথার অনেকখানি ভাষাগত বাধা সত্ত্বেও অনুধাবন করে ; সে এহেন প্রহেলিকার সূক্ষ্মতায় এতই বিক্ষিপ্ত যে ঊর্দ্ধে দেখিতে উহার ভরসা নাই, সামনের জলরাশি আর সে নহে ; অদ্ভুত শেষ রাত্রি ঘনাইয়াছে, আবার ভয় উপজিল, সে অথবা বাষ্প হইয়া যাইতেছিল।

সে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া এই বাগে আসিল, যেখান হইতে এখন পুনর্ব্বার অতিক্রান্ত মহল্লা নজরেই তদীয় মন পাঙাশ ; যে মন্দির আগত অনৈসর্গিক সুবাস তাহারে, অভ্রান্ত যে রমণীয় ভাবপ্রসারতা দিয়াছে, যে গভীর কুয়া হইতে উত্তোলিত জলে-রৌদ্র-দেখার-অবাক তাহাতে আছে, তৎপ্রভাবে, এখানকার আলো সে অনুভব করিয়াছিল আর যে সে অশ্বত্থের বীজের তুল্য অসংখ্য হাটবার পার হইয়া কোথাও উদ্গত হইয়াছে।

যদ্যপি যে তদীয় শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় মনিবরা সেখানেই মন্দিরেই অপিচ গলির জটের মধ্যে, প্রবেশ করিতে জী চাহে নাই, তবু মনে হয় তাহার ইতস্তত

১০২৭৭৪

হালাঝুরির কালীবাড়ীর গেটে যেন সে আছে, সেখান হইতে সোজা এই শিবমন্দিরের এক চোরা পথ আছে, ইহাতে তাহার আশ্চর্য্য কম্পন দেখা দিল যে তাহার মধ্যে মনিবদের কম্পনও সঞ্চারিত, বুঝিল যাঁহারা একদা হালাঝুরির কালী মন্দিরের গেটে থমকাইয়াছিলেন, কেন না বাগানের অপ্রশস্ত তিনটি পথের মুখে ফলকে লেখা ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এবং অবশেষে ৺শ্রীশ্রীতারা ব্রহ্মময়ীর বিগ্রহ – তদ্দৃষ্টে যদিও তখন ভোরবেলা তবু দম্পতিদ্বয় মর্ম্মীরিত – অবশ্য সুঘরাইএর আন্দাজ তাঁহারা একে অন্যের হস্ত ধারণ করেন।

উপস্থিত গলি সকল তাহারে অসম্ভব বিস্তৃত করে, যে তাহাতে ঈদৃশ উদ্বেগ যে ঐখানকার অশরীরী হিমবাহ গন্ধতে নিঃশব্দে ঘটির মত ডুবাইতে পারে ; অথচ না যাইতে পারার ক্ষোভে সে অধৈর্য্য ; এবং সে ক্রন্দন নির্ম্মিত স্বরবিকারের আয়াস পাইল – অবশ্য ধর্ম্মত ইহার কারণ এই হয় যে তাহাকে যাইতেই হইবে, এখনও সে পদচালনারহিত তবুও, এখানকার জনসঙ্ঘের ব্যস্ততার কেন্দ্রে সরল-নিঃশ্বাস লওয়ার অস্বাচ্ছন্দ্য নাই যাহা তাহার ভাল লাগে, মানে পরোক্ষে মন্দিরের নিকটের হট্টকারিতা, যাহা স্মরণে আপাতত নাই, অথচ তাহাতে ক্রিয়াশীল অজ্ঞাতেই।

তৎসত্ত্বেও কোনরকমে সুঘরাই খানিক পথ অগ্রসর হইতেই কেমন এক উদ্দীপন তাহার অন্তরে পুনরায় সংগঠিত হইল সে যেমন কোন শোভাযাত্রা দেখনের নিবন্ধন প্রমত্ত, নিম-হরিৎ ধান্যমঞ্জরী থরথরিত রতনচূর শোভিত হস্তে নববধূ যেন স্মিত হাস্যে আসে ; জনতা উথলিত-হর্ষোৎফুল্ল আঃ মিথুন আঃ মহেশ্বরী আঃ গিরিনন্দিনী ! ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা, বচনে বিস্ফুরিত, কেহ বলিল, রে চক্ষু ইহার পর তোর জ্যোতিঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হউক। এখন সুঘরাই ধাইয়াছে ঐ কাঁঠাল পত্রে তেল ও মেঠেসিঁদুর অভিজ্ঞতার লোভে ; একদাও ভাবে নাই সেই গলির গন্ধের বিষয়ে ; যেন শোভাযাত্রা এখনও এই সংস্কার হয় যে আছে, সে আবার দেখিতে পাইবে আর সে নির্ভীক চলিতেছে।

অচিরাৎ পাণ্ডাঠাকুর মহাশয়ের সহিত ভাগ্যাশ সাক্ষাৎকার ঘটিল, যে এবং তিনি স্নেহপ্রযুক্ত কণ্ঠে আজ্ঞা করিলেন, দৌড়াও দৌড়াও তোমার বাবু ও মাতাঠাকরুন তোমার সন্ধানে গিয়াছেন, কেন তুমি ভয়ে স্থান ত্যাগ করিলে শিব থাকিতে ভয়, নির্ব্বোধ বড় তুমি হে ছিঃ ছিঃ।

তদনুবর্ত্তী সুঘরাই অসহ্য উৎকণ্ঠায়ে দৌড়াইল, যেন তাহার জিগীর তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। নিরন্তর বিশ্রী গন্ধে সে ক্রমান্বয় কালো, সে সুঘরাই গলি-ভেদে যেক্ষণে সে খোলামেলায় তখনই তাহার মানসিক যন্ত্রণা সমুদ্ভূত হয় ; কোন দিকে সে যে চাহিবে তাহার তাহাতে মতি ছিল না। মঙ্গল বাদ্যকারী ঢাকিদের নৃত্য, বিভিন্ন দেশীয় তীর্থযাত্রী প্রবাহ, যে রমণীগণের, পাছে- হারাইয়া- যায় তাই, একের সহিত অন্যের আঁচল বাঁধা, এ সকলি তাহার চোখে ; একদা সে অত্যন্ত

অসহায় বোধে নিষ্পেষিত, দেখিল সামনের শিবগঙ্গার জলের কোন কিনারা নাই, শুধু জল আর জল, সূর্য্যকে ইস্তক খাইয়া সারিয়াছে !

তাই তৎকালেই বেচারী অসাধনেই কান্দিয়া উঠে ; তীর্থযাত্রীরা তাহার পানে এলেবেলে দৃষ্টিপাতে শিব জয়ধ্বনি করত জলদে পা ফেলিয়াছে, সুঘরাই কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অপারগ, সে মনিবদের কোথায় খুঁজিবে, অনেক বাঙালী তীর্থকামী বা পথচারীকে সে এহেন ঘোরে, উদ্ভ্রান্ত করিল ; ক্রমে তাহার অত্যুগ্র আশা যাতনা, যাতনা প্রস্তর ; এ সময়ে ইতিমধ্যে পাঁচটি জন্তু যেন তাহার গাত্র হইতে উদ্ভূত হইয়া দিকে দিকে দৌড়াইল ; এখন সাইকেলের ঘন্টি শুনিতে থাকিয়া যে সে ঘুমাইতে এলাইয়াছে ; বুঝে যে তাঁহাদের তন্নতন্ন সন্ধানের ফলে নিজেই অবশেষে সে হারাইয়াছে ক্রমাগতই সে হারাইয়া যাইতেছে।

তৎপ্রযুক্ত তাহার নিকট ঝটিতিই চমকেই সমস্ত কিছুই যেন ভিন্নজাতীয় আনুনি, যে এই বিষমত্বে একবার, এবং সে সুমহান ত্রিকূটপর্ব্বত দেখিলেক, ডিগ্‌রিয়া-র দিকে তাকাইল ; এখন উভয়ের বর্ণান্তর পরিলক্ষিত হইয়াছে. সে প্রত্যক্ষও করিল – চেঙ্গাররা সার বাঁধিয়া ডিগ্‌রিরিয়া-র মুখোমুখি দাঁড়াইয়া প্রশস্তি জানাইল, কহিল গ্র্যাণ্ড ! কি সুন্দর ! এই ঘোষণার নিমিত্ত কত অন্ধকার তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছে – এমনও যে অতীতকেও নবকলেবর দিয়াছে – নিশ্চয়ই এতবাদে কলিকাতার ঘিঞ্জি হইতে ছাড়া পাইয়াছে, তাহারা আপন কটস্থ প্রতিবিম্ব দেখিল। তাহাদের এই উক্তিকে এই পদবন্ধ যেন হারমোনাইজ করে যে অলিগলিতে বড়রাস্তায় আমরা প্রেমকে অস্বীকার করিয়াছি, দুইটিই যেন সম্পূর্ণ অচেনা, এবং সে ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিল, বুক তাহার মোচড়ায় – হায় মোহিলির গ্লানিতেই ইহা ঘটিয়াছে – হায় অধম মোহিলিই ঐ বেচারীদের ঐ পাহাড় দুইটির সর্ব্বনাশ সংসাধন করিয়াছে ; যে উপলক্ষে ঐ পাহাড় দুটির বিদ্যমানতা সেই যন্ত্রটিই মূর্খ স্বার্থান্ধ চামার পুত্রদ্বারা ধূলিসাৎ হইয়াছে, হা দুঃখ ! চরাচর তিমিরাচ্ছন্ন যেন এখন গোশাবক ও গাভী সকলের কোন দিক নাই, চারণ ভূমি হইতে কেমনে ফিরিবে, কোন এক গাভীর ললাটে সিন্দুর তিলকও দেখা যায় না, খুরঘাত অদৃশ্য, দিক তিমিরাচ্ছন্ন। সুঘরাইএর অন্তরে উপস্থিত এই ছবি প্রতিভাসিত। এখনও ঐ প্রাকৃতিক শোভাদ্বয় নিছক অপরিজ্ঞাত, তথাপি সে উহাদের স্মরণ মননে আছিল যেন যে সে নিজেরে হারাইয়া না ফেলে।

ইহা খুবই সাধারণ এবং নির্ঘাত যে তদীয় মনিব মহাশয় তাহারে খুঁজিতে, তিনি তাহারই আশপাশ দিয়া কতবারই না চলিয়া গিয়াছেন ; ইহা সে ভাবিল যে স্নেহ-প্রাণা পরম পূজনীয়া গৃহিণী ঠাকরুন সাংঘাতিক উতলা, অধীর, বিবর্ণ ; পতিরে অনুনয় করত কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদিলেন, – বাবা বিশ্বনাথ, এ কি অঘটন ! কি জ্বালা, কি পেড়ার, এমনতারা হবে জানলে ছোঁড়াকে···ওরে পুব্‌ব জম্মে কি হেন পাপ করেছিলিস্ যে নিঘিন্নে জাতের পেটে এলি, ওরে

অন্ত হ'তে পাল্‌লিনি, মাহাতো কিম্বা কাহার কত শত জাত ত ছিল ; হায়রে কোথা রাম রাজা হবে, না, হায়রে ! ছোঁড়া এখনও হয়ত উপসী, দাঁতে কিছুটি কাটেনি গা, চল্লামেত্তর খাবে, বাবার পেসাদ পাবে ব'লে, আমারই মরণ দশা, তোমার কথা তখন হেলা না হলে করি, গোখুরি হয়েছে, এমন জানলে ! আমার মাথা খাও, পায় পড়ি, জানি এক মূর্ত্তিমান পাপ, তলাস করিতে তোমারও ভোগান্তির সীমা নেই, ইদিকে বেলা যে যায়। তদ্বিধ খেদোক্তি মিনতি সুঘরাই সুস্পষ্ট অভিধানে শুনিতে যেমন পাইল। আর যে সেবকবৎসল মনিব মহাশয় সর্ব্বক্লেশনাশিনী উদ্বিগ্নে পত্নীর ঈদৃশ উৎকণ্ঠা সমঝে ও রমণীর হিসটেরিয়া রোগনিমিত্তও বটে এখন দ্বিরুক্তি করেন না ! অথচ স্বভাবতঃ তদীয় সত্তা আর একে পরিণত, সমস্ত অস্তিত্ব এখন আর্কিটেকটনিক বাসনা যাহা মন্দিরের ফুলচন্দন কর্পূরগন্ধ গম্ভীর অন্ধকার মিশ্রিত এবং কণ্ঠ এখন কাব্যবীজে স্ফীত হইয়াছিল এবং এহেন অবস্থা লইয়া নীচজন্মাকে তথা পাপের পুনরপি অনুসন্ধান সুরু হইল।

সুঘরাইএর মানসে সেই ঘোর শ্যাম গোচরণভূমি থাকে, এখন সেই ত্রস্ত গাভী একভাবে হম্বারবে আকাশকে অভয় দিতে আছে, যে তাহারা বিভ্রান্ত উত্তেজনায় পরমাণে একে অন্তরে সংঘর্ষে, বেচারীদের গললগ্ন ঘন্টি ক্ষিপ্তক্রমে বাজিতে অনবরত থাকিয়া উত্তপ্ত, ধ্বনিভেদ তাই, বহুদূর হইতে সাঁওতাল পল্লীতেও শ্রুত, এরূপ অবাক ধ্বনিব্যঞ্জনায় উত্তেজিত হইয়া তাহারা মাদল বাজাইতেছে, — হায় বেচারীদের গরু নাই ! দাবদাহর সঙ্কেতেই খবরেই অন্তের হাত ধরে ! ইদানীং অথৈ রিখিয়ার পথে পথে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার, চৌকিদার পথ লাঠি ঠুকিয়া হাতড়ায় অন্ধ যেমন।

নিশ্চয়ই মনিব মহাশয় ঐ ছ্যাকড়া গাড়ীর সামনে যাইলেন, সেইটি স্থিতবান আছে, সেইটি কৌতূহলোদ্দীপক, যাহার আশেপাশে সার্কাসের খেলার তাক-লাগান ছবি প্রলম্বিত, যে গাড়ীর ভিতর হইতে হ্যাণ্ডবিল বিলি হইতেছে, যাহার ছাদে কেটলড্রাম, ক্লেরিওনেট, করনিট বাজিতেছে ; গাড়ী মধ্যে দেখা যায়, তিনি যিনি বাঘের খেলা দেখান, যাঁহার বুকে বাঘ-নখ আঁটা রূপার ঘড়ির চেইন, ইঁহার মরদ গোঁফে দারুণ কেয়ারি ; উনি ঘুমন্ত ; মনিব মহাশয় উঁহার পানে চাহিলেন।

বাদ্য ঢক্কানিনাদ তীর্থযাত্রীর মুহুর্মুহু জয় শম্ভু যোগেশ্বর, এইরূপ আপন ইষ্টর নাম তুলিতেছে, ইতিমধ্যে বাদশ লিঙ্গের নাম গমক দিয়া উঠে, তন্মধ্যে ও আপন অহঙ্কার ফেলিয়া তিনি বাঘরা খেলোয়াড় ঘুমে কাদা ; অথচ বক্ষের মৃদু খবরে — কি জানি বাঘ-নখ বা কি, কি জানি ঘড়িই বা কি — অদ্ভুত কামুক ভূজ-বল্লাই ; নিশ্চয়ই সে অনেক বালকের তর্জ্জনী নির্দ্দেশ নিয়ন্ত্রিত ইঁহারে অবলোকন করিতেছেন, অবশ্য সে চোখের জল মুছে নাই, সত্যই স্বরে ইনি ভীতিপ্রদ ইনি আনন্দও।

ইত্যাকার পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক মনিব মহাশয় হ্যাণ্ডবিল বিলিকারী ইনি তারের

খেলা দেখান তাঁহারে সম্ভ্রান্তস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—মহাশয়, আপনি সুবিখ্যাত ব্যক্তি, আপনার মধ্যে সরল রেখার বৈচিত্র্য, বহু বালকের হাতে আপনি হ্যাণ্ড-বিল দিতেছিলেন যে বালক আপনাদের কসরতের ছবি দেখিয়া থমকাইয়াছিল, পরক্ষণেই বড় পশ্চাতে চাহে আবার বাঘরা খেলোয়াড়কে দেখে রোমাঞ্চিত হওয়ত শিহরায় যে যেন এখনই খেলোয়াড় জাগিয়া হালুম করিয়া উঠিতে পারে, সে স্থান ত্যাগ করিল, আপনার আহ্বান সত্ত্বেও সে কাছে আসে নাই।

অবশ্য পুনরায় ফিরিয়া আইসে, যখন কৌচম্যানের পার্শ্বে বসিয়া ক্লাউন নানান রঙ্গতামাসা দেখায়, বাহবা রুমালের খরগোস বাখানি ইন্দুর লইয়া খেলা এখানকার দুএকটি সবস্ত্র বালক সুঘরাই না ও কুতিপয় পথচারী বাদে সকলেই নির্ব্বাক, আর সে ঘর্ম্মাক্ত হইলেও ঐ চাতুর্য্য বুঝিত না অবশ্য যখন কপট নাক ঝাড়িয়া এই অল্পবয়সী ভীড়ে নিক্ষেপ করে, যখন কপট তাড়নায় পাদানিতে পা দ্বারা আঘাতিয়াছে, চাবুক আস্ফালনে মজা করিয়া থাকে, সর্ব্বোপরি কপট মূত্র-ত্যাগজনিত অঙ্গভঙ্গীতে ও তৎশব্দের অনুকরণে যখন অন্যান্য বালকরা হাসে, যখন পালায়, সেই বালক সরিয়াছে পলাইয়াছে কিন্তু হাসে নাই; যে এবং চিত্রিত কসরৎ সকল দূর হইতেই, ক্ষণেক আপন অঙ্গুলি যেন ঐগুলির উপর, বুলাইয়া বুঝিয়া লইতেই চাহিয়াছে—সে চাতুর্য্য চাহিয়াছে বিচক্ষণতা চাহিয়াছে—কিন্তু কসরৎ বুঝিতে তদীয় গেঞ্জী আঁট বোধ হয়; ও যে, হঠাৎ বাঘরা খেলোয়াড়কে অদ্ভুত বুনো আলস্য ত্যাগ করিতে প্রত্যক্ষে যাহার গাত্রে পুলকমিশ্র তরাসে সিঁকিড়া উদ্গম হইল, তখনই সে যেন ধর্ম্মভীরু একারণ যে তাহার মনে দংশিল যে আমি ডোমপুত্র সুঘরাই আমি ত ইহাকে, ইহা সব—সার্কাসের খুঁজিতেছি না, আমি যে মনিব মহাশয়দের···এবং তাহাকে কি আপনি যেহেতু সে আপনার হস্তচ্যুত দেশলাই তুলিয়া দেয়, আপনি এখন···।

সুঘরাইএর দেহ হইতে যাহারা যে জন্তুরা একযোগে বাহির হইয়া নিমেষেই অদৃশ্য হয়, ইদানীং সেই পাচটিকে দেখিল, সে সাক্ষাৎ চিনিল; ইহাদের জিহ্বা লোল, ইহারা হাঁফায়, বেচারী কুকুরগুলি; যখন তাহার গাত্র হইতে সবে মাত্র জাত তখন মনোহর শ্বেতকায়া ছিল, অত্যধিক ধূসরানিতে যারপরনাই মলিন ধূসর উপস্থিত; ইহারা কুণ্ঠায় জড়সড়, তাহারই দূরে দূরে অবনত মস্তকে ঘুরে, ইতিমধ্যে অসহায়ভাবে তাকায় এবং কোন কৈফিয়তে ল্যাজ তাহাদের আন্দোলিত ছিল; সুঘরাই উহাদের প্রতি খিন্ন অলস চোখে তাকাইল, সে নিজে আজ্ঞাবাহক, আশ্চর্য এই ক্ষেত্রে তাহার চাহনি মাত্রই—তখনই, উহারা কুকুর সকল তাহারা মাটি আঘ্রাণ করত ছুটিল, ধূলা উড়িতেছে। এখন আবার পূর্ব্বকথিত অন্ধকার; তীর্থযাত্রিদের ম্রিয়মান শ্রান্তস্বর শোনা গেল—তাহাদের টুকরো কথা আসিল—ভবভীতি পার কর্ণফুল হইতেছে! এখনও পূর্ব্বকথিত অন্ধকার, দিকসকল অন্তঃসত্ত্বা বিড়ালের ন্যায় মন্থর।

মনিব মহাশয়ের চিত্তে প্রসন্নতা নাই, বহুকালের পুঞ্জিত শুষ্কতা বিশেষত শিব অর্চ্চনার সুকৃতি লইয়া এক জংলীকে খুঁজিতে কাহিল। অনন্তর তিনি কয়েকজন মিস্ত্রীর সকাশে যাইলেন। ইহারা রাস্তার ধারেই এক মোটর গাড়ী সারাইতে-ছিল, যে এবং ক্ষণে ক্ষণে তাহারা সারান ব্যাপার লইয়া যুক্তিতর্ক করে, যাহা অনর্গল ইতর মুখ খারাপ মিশ্রিত ; সুতরাং কিছু তীর্থযাত্রী কাছের গাছ তলায় বসিতে যাইতে থামিয়া বেশ দূরে চলিয়া গেল ; মিস্ত্রীগণ কুলি কাঁমারীরা যে নিদারুণ খলমতি ছোটলোক প্রকৃতির স্বভাবতই ইহা তিনি জ্ঞাত ; ইহাও সম্যক বিদিত যে ইহারা মর্য্যাদার কোন কাহাকেও, কিছু, দেখিলে চোয়াল ঘর্ষণ করে, তাই তিনি ইতিমধ্যে একবার দ্বিধায় পড়িলেন, এ কারণ যে উহারা এক তীর্থ আগতদের মধ্যে কশ্চিৎ উড়িষ্যাবাসী প্রিয়দর্শনা ডাগর যুবতী রমণীকে লক্ষ্য কেমন যেন করিতেছিল এই সূত্রে বিদ্যুতে হিজড়ারা আভাসিত হয়, পুনর্ব্বার হাতুড়ি ও অন্যবিধ শব্দ হইল।

মনিব মহাশয় প্রস্তুত, বিনীত, ইহা নিবেদিলেন,—ভায়া, এক দেশওয়ালী ছেলে, তাহার চোখে জল ছিল, অবশ্য আদতে সে অনুমান করে যে আমরা হয়ত গাড়ীভাড়া উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে আসিতেও পারি খোঁজ খবর করিবারে, তাই, এখানে আইসে ; এঞ্জিনের কিয়দংশ নিরীক্ষণে মহাভয়ে সে বিচলিত, তত্রাচ উহার কটু চেহারা তাহারে যথাক্রমে আকর্ষণও করে, ও যে তোমাদের কর্ম্ম-কুশলতায় সে বিস্ময়াবিষ্ট, ও তদীয় জিহ্বা অনেক কিছু প্রশ্ন জন্য সরস হইতে আছিল বটে যে বিরাট টায়ার উত্তোলনে সাহায্য করিতে চাহে এবং যাহারে তোমরা অশ্লীল বচনে খেদাইলে ঠিক যখনই সে কলকব্জার বৈজ্ঞানিক সুক্ষ্মতায় বিমোহিত, যখন উহা তাহার চমৎকার স্মৃতি হইতেছিল, এখন বলিতে পার সে কোথায় গেল।

এবং যে স্থলে অনেক মনোহারী পসরা-মেলান দোকান ; সুঘরাই একদা চামেলীর মাতোয়ারা সৌরভে সচকিত, যে সে তির্য্যক নয়নে রকমওয়ারি শিশি সকল নজর করিল, ঐগুলি চাকচিক্য সমন্বিত, এতেক মধুর মনোজ্ঞ গড়নের যে যেন উহারা হেঁয়ালী গীত জানে! এহেন আতরের দোকান সাক্ষাতে সুঘরাই যেন রিখিয়াতেই, কোন ক্ষোভ নাই। অতএব মনিব মহাশয় বিচার করিলেন এমন যে, এখানে কিছু সময় হয়ত বা অতিবাহিত সুঘরাই দ্বারা হইয়াছে।

যে সে কতবারই না, মদীয় পত্নীর উৎকৃষ্ট আবলুষ কাঠ নির্ম্মিত আয়না দেরাজের উপরে, জেভের সুলক্ষণা অতুলনীয় রূপের এক চৈনিক দেবীমূর্ত্তি ও ইহারই আশেপাশে মাইরি কি অভিরাম বোগদাদের গোলাপ পাশ, বাহেমীয় শিশি বাহার ও ইদানীংকার ফরাসী এসেন্সের আধার, একই কেয়ারিতে—আনারকলি-বাগিচা ছাঁদে সাজান, সুঘরাই যাহা দেখিতে মোহাচ্ছন্ন—আজ্ঞাবহ দাস হইলেও সাড়হীন ; যদিও হায় সে পদ্ম পাতায় খায়, সে প্রায়-জংলী,

তারাময়ী অন্ধকার এখনও তাহার নিকট সুন্দর হয় নাই, পরীর গল্প সে শুনে নাই! শুধু স্মরিয়াছে ঐখানে সৌখীনতার মধ্যে কোথাও যেন ভোর হয়, আবার পাখীরা ফিরিয়া আইসে দারুণ পড়িমরি দৌড়ান যায়—তখনও সে লুপ্ত হইয়া যায় নাই—।

তৎপ্রবর্ত্তিত, রাস্তার এই বেলোয়ারী সম্ভারে গতিরহিত সুঘরাই সুনিশ্চিত হাতের কব্জিদ্বারা বিগলিত অশ্রুধারা মুছিয়াছে এখানে, জয় শিব শম্ভু ধ্বনি কানে আসে না! এখন এতদ্ভাবাপন্ন তিনি চুনটকৃত দোপাল্লী টুপী-পরা বিলাসী আতরওয়ালাকে প্রশ্ন করিতে যাইয়া অচিরাৎ মহা বিপাকে, কিসের তত্ত্ব করিবেন তাহা জ্ঞাত নহেন মুখ্যত যেন তিনি আতরের খবর লইতে আসিয়াছেন, কেয়া গুলাব শামামা এবম্বিধ নাম তাহার স্মরণে, যেমন ইহাদের মধ্যে একটি নাই তথা পোষা গিয়াছে; আতর না অন্য কিছু; না, অন্য কিছু নয় তাহা আতরই, তাহাই সুঘরাই অর্থাৎ।

অনেক শিশি দেখিতে তাঁহার স্থিরতা আসিল, কহিলেন,—যে বালক রক্তিম নয়নে মহাশয়ের পসরা বিদগ্ধভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে তাহার এই অপ্রত্যাশিত ভৌতিক সংগ্রাম হইতে নির্দ্দয়া হইতে খানিক অব্যাহতি লাভ হইয়াছে, যে এবং, সে যে অকথিত সান্ত্বনা পায়, তাহা ইহা যে, সে হারাইয়া যাইবার নহে; এবং সে এই বিশ্বাসেই, যে যদি ভগবান শিবের জয়ধ্বনির নিকটে থাকিতে পারে তাহা হইলে কোনরূপেই সে হারাইতে পারে না—তাই সে ছুটিল, কিন্তু কোন ঢাকির পশ্চাতে তাহা কি জানেন, সে কি ঐ সিন্ধু প্রদেশ আগত যাত্রীদের···পশ্চাতে!

অতঃপর মনিব মহাশয় আপনার পদক্ষেপ সংযত করিলেন, কেন না আশ্চর্য্য কথায় তিনি কেমন যেন, যে যাহা এই, এক জন্তু বলিতেছিল,—যে তিনি আর ট্রেন হইতে নামেন নাই, বাবা বৈদ্যনাথকে গাড়ীতে বসিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন,—বাবা তুমি জান আমার মৃত্যু আসন্ন.কলা সন্ধ্যায় আমার '—' ঘটিকায় কাল হইবে, আমি ৺কাশীধামে যাই, আমি গঙ্গাতীরে শেষ নাম জপ করিব, আমি মুক্তি চাই, তুমি দেবাদিদেব তুমি লইয়া চল···তারক ব্রহ্ম নাম তুমি দিও—সুঘরাই অদ্ভুত চোখ করি এহেন কথা শুনিতে জিহ্বাদ্বারা অধর সিক্ত করে সে আন্দাজে কিছু অনুধাবনে, ইহা ভাবে, যে উহা ঐ বক্তব্য এক দারুণ ষড়যন্ত্রের খবর, অন্তপক্ষে এরূপ স্বস্তিও তাহাতে জন্মায় যে ইহা ভাল, যে বৈদ্যনাথে নামিলে অব্যর্থই হারাইয়া যাইত; ঢাকিরা তাহাকে পয়সার জন্য ত্যক্ত করিত, বুঝিতেই চাহিত না যে তীর্থে কাঞ্চন স্পর্শ করিবে না বলিয়া সেই বৃদ্ধের যথাসর্ব্বস্ব তাহার সঙ্গীদের নিকট; ভাল যে কাশী গিয়াছে আর হারাইবার সম্ভাবনা নাই।

যুগপৎ ব্রত-বিগ্রহ গরুটি, যাহার ললাটে চমৎকার সিন্দুর, বিশেষত সেইটির জন্য সুঘরাই ক্ষুণ্ণমনা দেখিল, সকল উদ্বিগ্ন কণ্টকিত গাড়ীর চক্ষুদ্বয় জাজ্বল্যমান,

ইহারা ব্যথিত স্বরে হম্বারব করে, যাহা সস্নেহ লেহনের শব্দের ব্যঞ্জনা অনুসারী, যে স্বর পদ্ম হইতে, দেবীর চরণ স্তায় শুভ্র ; ইহা চতুর্বিধ আকাশ পরিক্রমণ ভেদ করত মহাব্যোমে পৌছায়, সেখানে সুস্পষ্ট অভিধানে এই অভয় দেয়, যে, হে জ্যোতির্ময় তুমি বিকিরণ কর, অন্ধকার বিনষ্ট কর, শুন, মানুষে আর কোন অজ্ঞান নাই, বৈচিত্র্য নাই, যে তাহারা ঘুলের কুড়ি উদ্গত হইতে দেখিয়াছে, প্রস্ফুটনে তাহারা উথলিত, বেশ কাল অন্তে উহার ঝরা প্রত্যক্ষে তাহারা বাস্তব হইয়াছে এবং সুদীর্ঘতা ও বিপল এই দুইকে আপেক্ষিক জানে, অগ্রিকে শপথার্হ মান্য করিয়াছে তাহারা, মদীয় হম্বারবকে ছন্দ করিয়াছে, মদীয় হম্বারবকে প্রস্তরে পর্য্যন্ত আরোপিত করিয়াছে। সুঘরাই গাভীসকলের কারণে চিন্তিত বিমর্ষ কেন না চৌকিদাররা ক্রমাগত রিখিয়ার পথের অন্ধকারে হাঁক পাড়িতেছে, গ্রামবাসীরা দিকভ্রান্ত যে সে অনুমান করিল।

অতঃপর সে ভাবিয়াছে মনিব মহাশয় নির্ঘাত এখন সেই বদ্ধ উন্মাদের সম্মুখীন, যাহারে তিনি সমাহিতচিত্তে সংস্কারবশত পরিগণন করিলেন, যথা ইহা নির্দ্দিষ্ট যে আত্মদর্শীরা উন্মাদবৎ রহেন, তাঁহারা জড়বৎ পিশাচবৎ বালকবৎ হয়েন, এবং যেহেতু কয়েকজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী মালা জপিতে থাকিয়া সেই ব্যক্তিতে আকৃষ্ট, এ কারণে তিনিও বিবেচনা করিলেন,—ইহাকে দেখি বদ্ধ উন্মাদ, নিশ্চিত মহাপুরুষ, অবশ্যই পরহিতব্রতীও হয়ত ; আর যদি ইনি তাহা না হইয়া থাকেন, যদি ইনি সাধারণ পাগল হন, সেই ক্ষেত্রে ইহা বিদিত যে, পাগলরা সত্যের সন্ধান, ব্যবহারিক সত্যেরও সন্ধান দিয়া থাকে ; এখন যে কোন পক্ষে, আমি ইঁহাকে শুধাইতে ব্যাকুল, বিশেষত এই নিমিত্ত যে, বেশ ভালরূপেই জানি সুঘরাইএর পাগল খ্যাপাদের প্রতি প্রগাঢ় দরদ উৎসুক্য আছে, কতদিন সে পদ্মপাতা সংগ্রহ তাহাদের ভাত রাখার জন্য আনিয়াছে, নিজ অন্নদানে উৎসাহিত হইয়াছে, আবার ইহাও ধ্রুব যে, অন্তধারে, যাহাদের মতিচ্ছন্নতা তাহারে প্রমোদিত করিয়া থাকে এবং যাহাদের জ্বালাতন করণে কি অবধি হৃষ্টতা তাহার, যে পরক্ষণেই উন্মাদদের প্রতি-আক্রমণে পলায়ন তুল্য আহ্লাদন তাহার আর কৈ !

এতদ্‌প্রবর্ত্তিত, সমীপবর্ত্তী মলিন চ্যাগড়া গাত্রে উন্মাদকে করজোড়ে এবং জানাইলেন, আপনি অনন্যসাধারণ, হে নরোত্তম আপনি ধন্য, আপনকার নিঃসঙ্গতা বৈদিক, আপনি গোপনতা বহন করেন—গোপনতার গোপনতা আপনকার বিচ্ছিন্নতা নজরে যে বালক নিজ স্বভাব সত্ত্বেও থ সে নির্ঘাত বুঝে সেও ক্রমশ গোপন হইয়া যাইতেছে, ক্ষণেক পাংশু হইয়াছে : কোনমতে সে সোজা ছিল, যদিও যে আপনার মুখে হাস্য ছিল তথাপি সে আপনাকে বেচারী বলিয়াছে যে যেমন আপনিও হারাইয়া গিয়াছেন, হায় আপনি থানা পোষ্ট অফিস ভুলিয়াছেন, মাঠে ঘাটে ষড়ঋতু খেলা আপনি ভুলিয়াছেন ; বালক ইহা অবিদিত যে, মহা ব্যোম আপনকার বৈভব ; এবং যে রোরুদ্যমান সেই

রিখিয়ার ছেলেটি, আপনার দৃষ্টত-আধিভৌতিক দুঃখে বড়ই বিকল, যে আপনার কেহ নাই, এখন আপনার দিক বিচার নাই এরূপে সে নির্ভয়েই আপনাকে দেখিতে থাকে, হঠাৎ সে আতঙ্কিত হইল, সে ত্রিকূট পাহাড়ের দিকে চাহিল এবং স্থান ত্যাগ করে···তাহার বিষয়ে কিছু বলিবেন। আর যে সেই বন্ধ উন্মাদের তর্জ্জনী সঙ্কেত আশায়ে ক্ষণকাল বিলম্ব করিলেন। সম্মুখের পাগলানী অন্তর্হিত হইল।

বেশ খানিক দূরের পথিপার্শ্বস্থিত উত্তম তিলক-সেবা মণ্ডিত গোখুর শিখাযুক্ত জনৈক গণৎকার দর্শনে মনিব মহাশয়ের ঔৎসুক্য উপজিল, তিনি নিকটে যাইলেন এ কারণ যে এই গণৎকার কিয়ৎ অভিনব পন্থীর, ইহার সমক্ষে বিচিত্র সাজ সরঞ্জাম, অঙ্ক, চিত্র ইত্যাদি, নভোমণ্ডলে গ্রহনক্ষত্র পরিস্ফুট চিত্র, শনির পরমদ্ভুত সন্ত্রাসপ্রদ কুটিল মুণ্ডের মুণ্ড অঙ্কিত, ও যন্ত্র সকলের ছক। যখন সুঘরাই এখানে সে সময়ে ইনি এক বর্ষীয়সীর করকোষ্ঠি স্বাধ্যায়ে নিমগ্ন, চমকে তিনি খড়ি পাতিলেন. স্মিতহাস্যে উর্দ্ধে হস্তসঙ্কেতে মৌনভঙ্গ যেক্ষণে করিবেন, তৎকালেই—ইতিপূর্ব্ব হইতে যে অস্পষ্ট গোলমালের শব্দ হেথা হইতে শোনা যাইতে আছিল, তাহাই —বেশ দূরে এক জনসমাবেশ দেখা গেল, সামনের কয়েকজন ঈষৎ ধীরগতি, পশ্চাতে বিক্ষুব্ধ অনেকেই।

কাহাদের পুলিশ ধরিয়া আনিতে আছে ; বাম পার্শ্বে এক রোগা লোক, তদীয় হস্তধৃত সাঁড়াশী কব্জায়ে একটি মুচি, ইহার গর্ভ হইতে একটি স্বর্ণ সর্পের মস্তক উত্তোলিত ত্রিশূলের শীর্ষ, এগুলি গলিত পিণ্ডে আটকান ; দক্ষিণে একজনা সুবেশী ; পিছনে একজন গামলা উল্টন, কেহ হাফর ইত্যাদি বহিতেছে, কিন্তু অন্তরে মত্তমাতঙ্গপ্রায় জনতা যাহাদের দন্ত বিকট প্রকটিত, বলিতেছিল,—শালাদের আমাদের হস্তে অর্পণ কর, কেহ কেহ প্রস্তরহস্ত রোষামর্ষ চক্ষু ঘুরাইয়া কহিতেছিল,—আমরা ঐ শনৈশ্চর নরাধমদিগের রক্তে কপালে ফোঁটা কাটিয়া পুণ্য অর্জ্জন করি, কি ভয়ঙ্কর ইহারা! কেহ বলিতেছিল,—ইহারা কাহারা ইহারা গাছকে গাছ জলকে জল বলে কি, ইহাদের ঘুম কি পাতাল প্রবেশ করিয়াছে! কেহ বলিল,—আমাদের হাত কাজে অতীব শক্ত কড়া পড়িয়াছে, হৃদয় বুক আমাদের বাবার কৃপায়ে এখন ছাগল ছানা! কেহ, এবম্বিধ হট্টগোলে আকৃষ্ট হওয়ত, এরূপ ব্যাপার সাক্ষাতে বিভীষিত,—পাপ! পাপ! বলিতে থাকিয়া কান নাক মলিয়া একটি করজোড় মস্তকে ঠেকাইয়া, সত্বর শিবগঙ্গায় স্নান উদ্দেশ্যে, পাপমোচন উদ্দেশ্যে গেল ; অসমাপ্ত স্নানার্থীরা পুনরায় স্নানে যায়, সেই দৃশ্যে রমণীমণ্ডলী চক্ষু আনত করে দ্বিচারিণী হইবার ত্রাসে! এই বিবিধ উদ্বেগের মধ্যে হঠাৎ এক প্রস্তরখণ্ড আসিয়া লাগিল সুবেশী লোকটির ললাটে ; রক্ত কিঞ্চিৎ পুলিশের জামায় ও স্বর্ণকারের মুচিস্থ রূপগুলিতে! মহিলারা চোখ ফিরাইল ; এ সময় শহরের এক ডাক্তারবাবুর পাল্কী-গাড়ী এই ঘটনার সন্নিকট হয়, তিনি গাড়ী

হইতে নামিয়া উৎক্ষিপ্ত জনতা যাহারা বাবা বৈদ্যনাথের জয়ধ্বনি দেয় আর মার মার বলে তাহাদের ভেদ করত যাইলেন, আশ্চর্য্য মুচিস্থ অবস্থা দর্শনে তিনি সত্বর সেই দিকে হস্তের ম্যাডষ্টোন ব্যাগ খুলিতে কচিৎ থমকাইয়া এবার সুবেশধারী লোকটির সাহায্যের নিমিত্ত প্রস্তুত। সুঘরাই এ সকল কিছু দেখিতে থাকিয়া উৎচকিত, তাহার কণ্ঠের শিরাউপশিরা কোন এক চীৎকার নিমিত্ত স্ফীত, এখানে সেখানে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল, মনিব মহাশয় হয়ত কাছেই কোথাও, এই অসম্ভাবিত ব্যাপারে মর্ম্মাহত তিনি অবশ্যই ; এই জনপ্রবাহ বেশ দূরে যায় যখন সুঘরাই ইহা বিবেচনা করে।

গণৎকার তখন কহিতেছিলেন, – সুখ দুঃখ চক্রবৎ···দুঃখ যাইবেই, আবার দুঃখ তোমার গর্ব্ব হইবে, তুমি অপেক্ষা কর, তোমার স্বামীর এত দুশ্চিন্তার কোন কারণ দেখি না, পুত্রের পুনরায় বিবাহ অহেতুক, তোমাদের সলিতা আসিতেছে, তোমাদের কখনই অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে হইবে না, পুত্রবধূ বীজ ধরিয়াছে···তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম যথেষ্ট দানধ্যান আছে··· ।

সুঘরাই নভোস্থলের প্রতি মন রাখিতে বাধ্য হয় কেননা গণৎকার ছোট একটি ছড়ি দ্বারা ঐ লোক দর্শাইয়া গ্রহর গতিবিধি উল্লেখ করিতেছিলেন, অতএব সে ইহাতে সেই ছবির নীল রঙকে স্পন্দিত অনুভব করিয়া রোমাঞ্চিত।

এখন মনিব মহাশয় এই গণৎকারকে শুধাইলেন, – মহাশয়, আপনি যখন এক মহিলার সংশয় দূর করা নিবন্ধন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বলিতেছিলেন, ঠিক যখন পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত সেই স্বর্ণকার ও সেই ধর্ম্ম-বৈপ্লবিক নেতাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখনই আমি দূর হইতে দেখিলাম একটি বালক এখানে আপনার ক্রিয়াকলাপ দেখিতে উদগ্রীব, ক্ষণেকেই মহা হট্টগোল শ্রুত হয়, পথের সকলেই সেইদিকে মুখ ফিরায়, আমিও চাহিলাম, আমার আর ডাকা হইল না, পরক্ষণেই আমি আপনার সান্নিধ্যে ভীড় কাটাইয়া আসি, দেখি বালক নাই, একবার মনে হইল আমি কি ভুল দেখিলাম, না, তাহা নহে ; তখনই ঐ ভীড়ের মধ্যে অনুসন্ধান-ক্রমে যাইলাম, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম ! সেই দুইজন ব্যক্তির কদর্য্য কাণ্ডে আমি সম্বিৎশূন্য, অনতিবিলম্বে ঐ বৈষয়িকতার পাষণ্ড পরিণতিতে আমি হতস্বাদু, মুচিস্থ ভক্তি-নিদর্শনগুলি আমারে আঁচড়াইতেছিল, কেন না সেখানে প্রণিপাত যোগভ্রষ্ট হইয়াছে, চেতনা রেখা-ছাড়া হওয়ত পিণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে মদীয় খোঁজার প্রেরণা, যুক্তি, আরোহীপ্রথা দারুভূত, কেন না উহা সর্ব্বৈব সংজ্ঞা-বিঘাতক ! আমি যেমন যে অন্যকিছু, আমার সুকৃতি সকল বিনষ্ট, অতঃপর স্খলিত পদে চলিতেছিলাম, অবলীলাক্রমে আপনকার নভঃমণ্ডলের চিত্র আমার চোখে পড়িল, আমার দিক-নিশ্চয় হইল ; আমি সন্ধানে প্রবৃত্ত হই। ইতিমধ্যে বালক আসিল, আপনার বিবাহ শব্দ তাহাকে কিম্ভূত করে, তখনই আবার যেন সে চীৎকার করিতে চাহে, কিন্তু আপনার সলিতা কথা তাহাকে বড় আতান্তরে ফেলে, সে নিজে

সলিতা গড়ন জানে, অথচ ইহার মানে কি, অথচ বর্ষীয়সী ইহাতে যারপরনাই খুসী ; সে আবার নীল ছবিখানির দিকে তাকায়···তাহার গতিবিধি কি আপনি··· !

শিবগঙ্গার পশ্চিমে যেখানে আব্ছার নাপিতগণের চোখ কতু ছোট কতু বড়, কেহ বা চুল ছাটে, কেহ পেউরী হয়, কেহ চক্ষু বুজাইয়া উর্দ্ধবাহু, কেহ মস্তক মুণ্ডন করায় ; মনিব মহাশয় স্বাভাবিক ধারণায় এই সুদীর্ঘপথব্যাপী কর্ম্মতৎপরতা ঈষৎ কৌতূহলে নজর করিলেন, এখন নিকটস্থ এক ক্রন্দনের শব্দ বহুত কাঁচির আওয়াজ ভেদ করত আসে, দেখিলেন একটি বালক যাহার দন্তে কূটা নাহা পাছে পতিত হয় তাই তাহা এখন দন্তে চাপিয়া কাঁদে, নাপিত সান্ত্বনাবাক্য বলিতেছিল,— ছিঃছি কান্দিও না, তিনি শিবের কাছে গিয়াছেন, তাহা ব্যতীত এরূপভাবে কান্দিলে অঘটন হইবে !

এই নাপিতের কাজের শেষে মনিব মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, হে নাপিত, একটি বালক যে অনেকক্ষণ যাবৎ, গুরুদশা প্রাপ্ত এখনই যে ছেলেটি চুল ফেলিতেছিল তাহার ক্রন্দনে স্বীয় নয়নের অশ্রু মোচন করত অভিনিবিষ্টচিত্তে তাহাকে দেখিতেছিল, ও যে সেই সময়তে, ক্ষৌরকর্ম্মের মারাত্মক করাল শব্দ শুনিতে থাকিয়া চালনা কৌশলও অনুধাবন করিতেছিল, যে এবং এই সকল সূত্রে আশ্চর্য্য এতাদৃশও ভাবে যে, হায় আমি কি পর্য্যন্ত বঞ্চিত ! আমার কোনই খেই নাই, এমন কোন আমার উর্দ্ধতন কেহ নাই, যাহার নিমিত্ত আমার মস্তক মুণ্ডনের সুযোগ আসিবে ! হায় আমি ঝড়ের মুখে এঁটো-পাতারও অধম ! হে নাপিত, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ যে, তোমরা দারুণ চতুর, এখন তোমার হাতের উপর ক্ষুর চালনা রাখিয়া, একটু ভাবিয়া দেখ ত, কেন না বালককে তুমি পন্দের ভাবিয়া থাক, সে কি রিখিয়ার রাস্তার দিকে গিয়াছে।

হায় যদি মনিব মহাশয়, সুঘরাই যখন এখানে, তখন এক বিলাইতী বাজনা একটি ব্যাগ-পাইপসহ ঢাকের শব্দ শুনিতেন, নিশ্চয় তিনি মুগ্ধ হইয়া দ্রুত সেই দিকে লক্ষ্য করিতেন, কিন্তু আদতে বাজনার হেতু দর্শনে— সুঘরাই অবিকল এখন যেন দেখিল— তিনি মুহ্যমান, একধারে আশা ও দুঃখ তাহারে কালো করিল, এ কারণ যে উহা এক শবযাত্রা, চারপাইটি অদ্ভুত সাজান বাঁখারি নির্ম্মিত ছোট ছোট খিলান করা উপরে চেলী-ঢাকা (পাটের কাপড়) যাহার আবির রঙ সকলকেই মোহিত করে ; মনিব মহাশয় বুঝিলেন সম্ভবত ইহা ডোম জাতির মৃতদেহ, ইহাদের সহিত কি সুঘরাইএর সাক্ষাৎ হইয়াছে ; হয়ত ইহাদের মধ্যে সুঘরাইএর কোন জ্ঞাতি সম্পর্কের লোক থাকিতে পারে, তথাপি তাহাদের তিনি প্রশ্ন করেন না, নিশ্চয়ই তিনি সুঘরাইএর বিকার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে যদি ইহা বাঁশ বাঁধা শব হইত তাহা হইলে সুঘরাই নিশ্চয় অনুসরণ করিত, ভাগাড়ে যাইত, সেখানে সে দাঁড়াইয়া থাকিত, স্বজাতি তাহাকে দেখিয়া ছোট এক হাড় ছুঁড়িয়া মারিত— হিঃ রে, সেও আহ্লাদে অধীর একটি ছুঁড়িয়া দুজনেই আনন্দিত

খুসী আত্মীয় দর্শন। তখনই শিশির দেখা যাইবে। বাজনা শ্মশান অভিমুখে চলে. মনিব মহাশয়ের মস্তক উন্নীত হইল, তিনি অদূরস্থিত শ্মশান হইতে উত্থিত কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশির গাম্ভীর্য্যের পানে তাকাইলেন, নিশ্চয় কোন জিজ্ঞাসা তাঁহার ছিল না।

মনিব মহাশয় সত্যই নিরাশ হইয়াছেন, সামান্য এক ভৃত্যের জন্য এত তল্লাস কেহ করে না, কিন্তু যেহেতু ইনি পরম ধার্মিক তাই এতেক ব্যগ্রতা ; যখন তিনি অবনত মস্তকে চলিতেছিলেন, তখন সহসা শিব-জয়ধ্বনি উঁচাইয়া অস্বাভাবিক স্বরে গীতের বিস্তার হইল, এই গান নিশ্চয় সর্দ্দার পাণ্ডাঠাকুর লিখিত, যাহা— 'আজু জাগরণে রাতিয়া বিতল সখী যে ভৈল ভোর গে, হায় রাম' —এই মাঙ্গলিক সুললিত পদবন্ধ শ্রবণে তাকাইলেন—যে এবং কিয়ৎ রশি দূরে দৃশ্যমান হইল, ঘোর লাল পাটের সাড়ী পরিহিত, কালো তেলাল চুলে পাতাকাটা ও পাতায় চুমকী, নাকে ফাঁদি নথ ও নানাবিধ পিতলের অলঙ্কারে ভূষিত পাঁচটি হিজড়া একজন স্ত্রীলোককে, যাহার মাথায় বটপল্লবসহ ঘট তাহাকে, মণ্ডলাকারে থেমটা নৃত্যে পরিক্রমণ করত ঐ গীত সহকারে ক্রম অগ্রসর হয় ; এই দলের পিছনে এক সুরম্য ডুলি ও যাহার অনুগমনে কুঙ্কুম-রঙ-ছোপান বস্ত্র শোভিত আর রৌপ্য অলঙ্কার সজ্জিত দাসীরা যাহাদের হস্তে পূজা উপচার বসিয়াছে। সুঘরাইও ঐ সকল কিছু এইভাবেই দেখে! তার পর শোভাযাত্রা এক কারণে থামিয়াছে বসিয়াছে, হিজড়ার দল চুটা ধরায়, এখন আবার চলিতে সুরু করে।

মনিব মহাশয় সবিসময়ে এহেন চমৎকার দলকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে তাঁহার ইদানীন্তন বৃত্তি বশবর্ত্তী তাহাদের কাছে খবর করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি নির্ঘাত যে সুযোগ অপেক্ষায় তাহাদের অনুসরণে খানিক পথ যাইলেন, শিবগঙ্গার নিকট যখন পুনরায় রুখিল, তৎকালে তিনি তাহাদের, হিজড়াদের, কাছে—যেহেতু এই শোভাযাত্রার জন্য সকলেই মৌনী—সুঘরাই সংবাদ বিধায় জানিতে গিয়া অস্বস্তিতে ইতস্তত অন্যত্রে মনস্ক হইলেন, অনেকটা দূরে খোলার পলা-রঙ চালা ও তদুপরি চরমদ্ভুত দর্শন পোড়ামাটির হাতী ও পায়রা তদীয় দৃষ্টি ব্যাহত করে, সহসা এই-গুলিতে তাহার বুকে আশ্চর্য্য পথে ভরসা আনিল, যে তাঁহার ব্রীড়া আর নাই, তিনি মধুর বচনে হিজড়াদের কাছে ইহা উল্লেখে বলিলেন,—তোমরা কি আমার কথার উত্তর দিবে, যে বালক আপন গাত্র হইতে গেঞ্জীটি উন্মোচিয়া সেই গেঞ্জী দ্বারা আপন চক্ষু মুছিতে কালে তোমাদের প্রত্যক্ষ করে, এবং ভাবিয়াছিল, অনেক সময় যাবৎ তোমাদের দেখিলে মঙ্গল হয়, এরূপ বিশ্বাসই সে স্বাভাবিক সাধারণ, যে তোমাদের কুহকময় অঙ্গুলি আছে যেটি তোমরা আপন আপন সুপুরু ওষ্ঠদ্বয়ে স্থাপন আমাদের নিমিত্ত কর, মানুষের নিছাড় ধারাবাহিকতা পরোক্ষে স্মরণ করাও, যে তোমরা চম্পক অঙ্গুরীয়র বৈপরীত্য ; অঙ্গুরীয় আলো তোমরা চমকপ্রদ স্তব্ধতা!···এখন সেই বালক, তোমাদের বিশ্রামের কারণ বুঝিয়া আপন

পাপ স্খালনের জন্যও—মানুষের গলায়ও কি নোনা আছে—বলিল, যে সে মন্দির সমীপস্থ অঘটন দেখিয়াছে, যে সে চন্দ্রকলা ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া বৃক্ষে উঠিতে চাহিয়াছে, ঐ কীর্ত্তির চন্দ্রকলার মনোরমত্ব তাহাকে মুগ্ধ করে, সত্যই যাহা মননে যে কোন হিন্দুজনম সার্থক তখনই! যে এবং যে সে অবলোকন করে, এক অপূর্ব্ব কন্যাকে পদব্রজে আসে, যাহারা ধর্ম্মতাত্ত্বিক সাধক সন্ন্যাসী যাহারা নিজ নিজ স্তব মহামহিম ও নির্ব্বান ষটক পাঠ করিতেছিল তাহারা কন্যাদর্শনে উহা থামাইয়া—'অহো ভগবতী তনু ভগবতী তনু' উচ্চারণে আকাশ বিদীর্ণ করিল, যাহারা এখানে সেখানে পদ্মাসনে বসিয়া নিমীলিত নয়নে ধ্যানস্থ ছিলেন তাহাদের গাত্র ঐশুদ্ধ সঙ্গে মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হইতে থাকে, এমত সময় নেতৃবর্গসহ হরিজনরা আসিল, প্রলয় কাল আসিল, কন্যা ন যযৌ ন তস্থৌ হইলেন কিয়ৎক্ষণ, অতঃপর শুভমিলনের কারণে ধাবিত হইলেন; এ সব ব্যাপার অনেকক্ষণকার, এখন নিশ্চয় শাস্ত্রমতে বিবাহ কার্য্য চলিতেছে, আর সেই দুর্ব্বৃত্তরা অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহারা দন্তঘর্ষণ করিতেছে, তোমরা আর কালবিলম্ব করিও না, অদ্য অনেক দুগ্ধ ঘৃত পুজা উপচারাদি নষ্ট হইয়াছে, হোমকাষ্ঠের অভাব, সুন্দর যাও, ভোগের আর বেশী দেরী নাই, জয়বাবা বৈদ্যনাথ!—সেই বালকটির কথা, যে আপন হঠকারিতার নিমিত্ত অধোবদন, অনুতপ্ত যে সে-ও চীৎকার করে, সেই বালকের কথা তোমরা বলিতে পার···!

হায় আমার চক্ষুর মধ্য দিয়া নিয়ত বাদুড় প্রবেশ করিতেছে, হায় আমার নাম সুঘরাই, যাহা ক্রমাগত শিব জয়ধ্বনির মধ্যে ডুবিতেছে, হায় এ পৃথিবীতে পচাগলিত দুর্গন্ধ কিছু নাই, ঐ ধ্বনি সকল কিছু গ্রাস করিতেছে, যে আওয়াজ ভেদ করত আমিও বহু সময় শালা বলিয়াছি, যেহেতু আমি ডোম, কিন্তু তাহারা আরও পাপ করে যাহারা উচ্চৈঃস্বরে বৈষয়িক কথা ঐ ধ্বনি সময় কহে, আমি শুনিয়াছি; আমিও ত নাম ধরিয়া অনেক অনেক বার ডাকিয়াছি! হায়! মনিব মহাশয় যদি ঐ ব্যাঙটি দেখেন তাহা হইলে কি ভাবিবেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমা করিবেন, যে আমি মহা আক্ষেপে আপশোষে ক্রোধে উহারে আহত করিয়াছি!

এখন তিনি অসংখ্য ভিখারীদের সামনে, যে সুন্দর রৌদ্র উহাদের এড়াইতে পারে নাই, যে শুধুমাত্র একের ছায়ায় অন্য ভারী কালো, একদম উষ্ণীষ, বিবিধ ভাষায় আশীর্ব্বাদ কল্যাণ বচনে ইহারা বিকট, অবিলম্বেই আবার ম্লান, তিনি এই নিকৃষ্ট অবহেলিতদের নম্র বচনে প্রশ্ন করিলেন,—বাবা বৈদ্যনাথ তোমাদের মঙ্গল করুন, বিশেষ যে তোমাদের জিজ্ঞাসা করে যে চীৎকাঠ নিবাসী বজ্রাহত ভিখারী যাহার লাস্য জাঙকী সেই অষ্টবক্র বিকলাঙ্গকে চেন কি না···? তাহারে কি স্মরণ আছে, বোবা ভিখারীটি, যে বালসরাইএর, তাহার কথা নিষ্প্রয়োজন, অবশ্যই অগণিত তীর্থযাত্রী তোমাদের আশ্চর্য্য নেত্রে নিরীক্ষণে করজোড় করে, বুঝে তোমরা জাঙকীর মতই পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ বহিতেছ; যে এবং সুঘরাই সিদ্ধান্ত

করে, যেহেতু পাপ সে করে নাই তাই তাহার দেহ নিখুঁত, যদি ভবিষ্যতে কখনও সে কোন পাপ সঙ্ঘটন করে, তন্নিবন্ধন সঙ্কল্প করে, সে আপনকার হাত পদদ্বয়কে সংযত করিবে, কেন না হাতে সোনা আছে – উহারাই নজ্জার, এমন যদি কভু অজ্ঞানে সে পাপ করে তাই আগামী পৌষ সংক্রান্তিতে ভাগলপুরের গঙ্গায় স্নান করিয়া তাহা স্খালন করিবে – যদিও তাহারা ডোম; নানান বিচার তাহাদের নাই, তথাপি যে এবং আরও, এই মানসিক করে যে যখন সে আধ সের চাউল প্রত্যহ খাইবে তখন তোমাদের নিমিত্ত প্রতি হাটবারে এক পালি চাউল আনিবে, গামছাও দান করিবে, তাহারা ডোম, যদিও তাহাদের ভিক্ষা গৃহীত হয় না, তবু মুহূর্ত্তের জন্য সে উচ্চবর্ণের হইবে, সেই দেশওয়ালী বালক সহসা অদ্ভুত সঙ্কুচিত হয় এ কারণ যে অচিরাৎ কাহারও সম্ভ্রান্ত কণ্ঠের ভৎর্সনা তাহার কানে আসে ; শনৈঃ ঐ তিরস্কারবাক্য সে অনুধাবনেই ত্বরিতেই নিদারুণ চমৎকৃত, যে ক্ষণেক ইহা সংস্কার জন্মে যে, যে সে যেমন বা হারাইয়া যায় নাই।

সে দেখিয়াছিল যে অনতিদূরে জনৈকা উচ্চবংশসম্ভূতা গৃহিণী বোধ হয় তদীয় নাতনী, যে ফ্রকপরা, তাহারেই তিক্ত সমালোচনায় বলিতেছিলেন, – ছি ছি লজ্জা রাখিবার জায়গা পাই না, ইহারা না সাক্ষাৎ নারায়ণ ! ইহাদের ঘৃণা ছি ছি তোমার ঐ বাপটিস মিসনে এই বুঝি শিক্ষা, ছি ছি, নরকেও স্থান হবে না, ভিখারী বলিয়া···ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া অবজ্ঞা করিয়া দেওয়ার মত পাপ আর নাই, শতজন্ম তপস্যার ফলে মানুষ ভিক্ষা দেওয়ার ব'লে সুযোগ পায়, উহারা কানা খোঁড়া কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত কি ইচ্ছা করিয়া হইয়াছে ! বলে কুকুর বিড়ালরে অবধি ছুঁড়িয়া কিছু দিতে নাই। ছি ছি ! উহাদের নমস্কার কর··· !

ইত্যাকার কথার সহিত গৃহিণীর উৎকৃষ্ট স্বর্ণালঙ্কারগুলির মৃদু অনুরণনও মিশ্রিত হইতে থাকে, যে উপস্থিত সে সদ্যস্নাত সুন্দর দেখিতে কন্যার জন্য তটস্থ হয় – এবম্বিধ উক্তিতে তাহার ডোম জন্মে আশ্চর্য্য এক অপরাধ জানিয়াছিল ; যে এবং তোমরা হে ভিখারীগণ, গৃহিণীর রূঢ় বাক্যে বালিকার জড়তা বুঝিয়া, তোমরা তৎপ্রতি সমবেদনায় অতীব করুণায়ে ক্ষমাপরবশ হইয়া আশ্বাস দিয়াছিলে, – থাক্ থাক্ উহাতে দোষ বিচ্যুতি ঘটে নাই, সে বালিকা, আমরা তিন সত্য করিতেছি উহার অপরাধ আমরা লই নাই, যে বালিকারে আমরা আশীর্ব্বাদ করি, সে শিবলোকে যাইবে, শিবকে পতিরূপে পাইবে, উহার জীবন আমরণ দেবসেবায় ধন্য হইবে, অজস্র দান ধ্যান করিবে, উহার সন্তানরা ত্রিলোক-বিখ্যাত ধার্ম্মিক হইবে, অমর হইবে মা – ! তোমাদের এতাদৃশ স্নেহবচনে সেই বালক সুঘরাই যেন এই মাত্র স্নান করিতে চাহিল, কেননা সে চীৎকারে শিবকে পতিরূপে পাইবে, বাক্যকে তছনছ ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছে, সে কম্পিত, সে তোমাদের নমস্কার করে, তাহারে কোন দিকে যাইতে দেখ।

অনবরত পুণ্যকামী আর ঢাকের শব্দে মনিব মহাশয় স্বতঃই বিভ্রান্ত, নূতন

করিয়া যে এখন তাঁহার কোথাও গিয়া শুধাইতে ভয়ঙ্কর রাগ হইল ; বিশেষত মোহিলির ব্যবহারে বৃথা ভয়ের জন্য – যে সেই ইনজেকশন ক্যাম্প রোহিনীর ঐ দিকে না অগ্রসর হইয়া গিয়াছে – গরুর গাড়ীটি থাকিলে কোন গোলই ঘটিত না, সুঘরাই অনায়াসে ঘুমাইতে পারিত তাহাতে ; ওষ্ঠদংশন করত তিনি চারিদিকে চাহিলেন, নাঃ একবার শেষ চেষ্টা করি, যদি সে রিখিয়ায় ফিরিয়া গিয়া থাকে ; কিন্তু ইহাতে তাঁহার অবশ্যই মনে পড়িবেই যে সুঘরাই কোন উপায়েই একা একা রিখিয়ায় ফিরিতে পারিবে না, অবশ্য যদি কোন সহায় সম্বল পাইয়া থাকে, ভিখারীদের কথা উঠে না, যদি অন্য কাহাকেও পাইয়া থাকে তাহা হইল সে আর এক কথা।

এমনও যে বিসরিয়ার বাপ, যে প্রত্যহ শহরে পায়ে ঘুঙুর এবং বিরাট ঢাক ঘাড়ে আসিয়া থাকে, ঢাক বাজানই তাহার ব্যবসা, ক্রমাগত তীর্থযাত্রীদের সমক্ষে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঢাক বাজাইয়া শুভ অভিনন্দন জানায়, এবং এইভাবে শিবগঙ্গা পর্য্যন্ত-যায় ; তীর্থযাত্রীদের কি আদরের স্মৃতি সে-ভারতের দিকে দিকে চন্দন গন্ধের পাশেই সে ; তাহার মত অনেকে। সে ফার্ষ্ট ট্রেন ধরিবার জন্য রাত থাকিতে আসে, অদ্য তাহারও সাক্ষাৎ নাই ; তবু তিনি অবশেষে এই বিষয়ে তত্ত্ব করিবার স্থির করিলেন ; তিনি দুমকার চৌরাহা গিয়া পর্য্যবেক্ষণে জানিলেন, সকাল বেলাতেই বহু কাঠের ভারী, বহু দুধওয়ালা বিষণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া গিয়াছে ও যে দু-চারজন সুদূর ভাগলপুর হইতে বা গঙ্গার নিকটবর্ত্তী এলাকা হইতে গঙ্গাজল, বাবা বৈদ্যনাথকে তদ্দ্বারা পূজা করিবার মানসে আনয়ন করে, তাহারাও শহরে প্রবেশ করে নাই, ক্ষুণ্ণ মনে বালসরাইএর দোকানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে ; যে আজ ঐ পথে একেবারে লোক চলাচল নাই, সর্ব্বৈব নিস্তুতি ; এখন এরূপ পথ সুঘরাইএর পক্ষে অতিক্রমিয়া যাওয়া আষাঢ়ে, কিছুতেই ঘটিবার নহে, সেরূপ সাহসও সে পাইবে না – কেন না লকড় !

কোন এক সাংঘাতিক সুচতুর লকড়ের উপদ্রবে রিখিয়ার আশপাশ অনেক মৌজা সর্ব্বদা আতঙ্কিত হইয়া আছে, যে সেখানে ঘুম নাই, ক্রমাগত নিদারুণ ফেউএর ডাকে সকলেই শঙ্কিত, কুকুররা গ্রাম হইতে বাহির হয় না, কোথাও পাতা-লতা স্তূপীকৃত করিয়া আগুন দেওয়া হয় ; সকলেই একযোগে ভয় পাইয়াছে – একে অন্যকে কাছে টানিয়াছে – ঢাকিরা ঢাক ও অন্যান্যেরা, ছোটরা, ক্যানেস্তরা টিনের কৌটা ইত্যাদি ঘুম চোখে বাজাইয়াছে, এই সঙ্গে সকলেই থরহরি ! রাত্রীগামী গরুর গাড়ীর চাকার শিক একটি কাঠের সহিত লাগিয়া যাহাতে শব্দ হয়, তজ্জন্য তাহাতে আড়ভাবে চালকরা কাঠ বাঁধিয়াছে, যাহাতে চলাকালে উৎকট আওয়াজ হয়, ফলে কোন জন্তুই গাড়ীর সমীপে আসে না। লকড় হেতু এমন কি চেঞ্জার বাবুরা কেহ কেহ বন্দুক হস্তে সান্ধ্য ভ্রমণ করেন।

. কয়েকদিন হইল এই লকড় এতেক দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে দিনমানেও

তাহাকে দেখা যায়, মাঠে গরু পর্য্যন্ত চরান ভাবনার হইয়াছে, তাই অড়হর ক্ষেত যদি পশ্চিমে হাওয়ায় নড়িল, যুগপৎ সকলেই লাফাইয়া উঠিয়াছে, ও হো হো হৈ হক্কড় হে—হাক পড়িয়াছে। বিভ্রাবিত অসহায় গ্রামবাসীরা গাছের গায়ে নূতন করিয়া সিন্দূর দিয়াছে; বিশেষত এ কারণ যে বালসরাইএর রাস্তার কাছেই কয়েক ঘর ডুমনীর বাস, যে ঠিক সেইখানেতে দিন তিনেক পূর্ব্বে এই লকড় দ্বারা এক নৃশংস ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়।

ঐ সকল ডুমনীদের সামনে রোজই রাত্রে একটি বোবা ভিখারী ঘোরাফেরা করিত, যে ডুমনী মাগীদের সঙ্গে তাহার ভাব ছিল; ডুমনীরা তাহাকে মহুয়া বা গাঁজার কড়ী দিত; বোবা সারারাত এখানেই কোন ডুমনীর ঘরে খদ্দের (বাবু!) আগমনে যখন ঝাঁপ বন্ধ হইত, সেই ক্ষেত্রে ঐ বোবা ঝাঁপের ফাঁসা ফুটো দিয়া আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ দেখিতে ভালবাসিত; বোবা সে বটে কিন্তু লালা ত ছিল! যেদিন তাহার কাল হয়, সেদিন কোন কোন ডুমনী তাহারে রাত বারোটার ট্রেন যখন যায় তখনও দেখে, একজন ডুমনী তাহাকে একটু মহুয়াও দেয়, যেহেতু সে কাছেই ছিল—ডুমনীর ঘরের ঝাঁপে আড়ি পাতিয়াছিল; যে ইহার পর, যখন সে হয়ত পুনরপি ঐভাবে একমনা তখনই নির্ঘাত লকড় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়—বেচারী বোবা!

লকড়টি, ইহা জীবিতরা ধারণা করে যে, গরুর গাড়ী বা অন্য কিছুর নিমিত্ত বোবার খানিক-খাওয়া দেহ রাখিয়া চম্পট দিয়াছে, যে সেই কুৎসিত বিভীষিকা সারাদিন রাস্তায় রহে—দূর দূর গ্রামে এই হিম দুঃসংবাদ পৌছিয়াছে; যাহারা অনেক পথ ভাঙ্গিয়া আসে এহেন বীভৎস দুর্দ্দৈব প্রত্যক্ষ জন্য, তাহাদের অন্তর আত্মা পাণ্ডটে হইয়াছিল; সুঘরাই উহাদের মধ্যে একজন—এই ঔৎসুক্যের হেতু মনিব পত্নীর নিকট বকুনিও খায়—উহাদের মধ্যেই কেহই সেই মর্ম্মন্তুদ দেহ অবলোকনে বেচারী পর্য্যন্ত বলিতে পারে নাই; যে অন্তপক্ষে কোন নীতিজ্ঞান আত্রাহ্মণ কেহই তাদৃশ দুর্দ্দশা হইতে মন্থন শক্ত হয় নাই। সকলে কাতর নয়নে শকুনির পরিক্রমণ দেখিতেছিল।

শুধু মাত্র ভীতি; ভীতি তাহাদের গ্রামবাসীদের অমোঘ অহংতা; আর যে বিশেষত তাহারা যাহারা পূর্ব্বজন্মজনিত পাপ বিধায় অতীব নিম্নশ্রেণীর, ইহা ধ্রুব যে ভীতি তাহাদের পুণ্যও; সুঘরাই ঐ ঘটনাস্থল হইতে ফিরিয়া সর্ব্বপ্রথম খড় কুড়াইয়াছে, যে একটি সুদীর্ঘ দড়ি তাহার চাই, খড় দ্বারা একটি কদাকার রশি বানায় ও যে খাঁচাটিকে মটকায়—খিলানের লোহাতে তুলিতে চাহিয়াছিল।

যে, লকড় হইতে ভীতি, ভীতি চড়াই উৎরাই-এর নিঃসঙ্গতা পার হইয়াই পাখী! যে চকিতে ইহাতে সুঘরাইএর নেত্রে অভাবনীয় বিস্ফারিত যে যাহাতে একাধারে উদ্বেগ ও অপ্রত্যাশিত আপশোষ বিদ্যমান; যে সে এতাবৎকাল

অনভ্যস্ত মানসিকতা হইতে অধুনা সে মুক্ত, অত্রাহি ভাবান্তর ধূলিসাৎ হইয়াছে : ইহা যথার্থ যে সে নাড়ীর যোগসূত্র প্রাপ্ত হইয়াছে ; যে সে আতা গাছকে আতা গাছ বলিয়া চিনিয়াছে, যে সে রিখিয়ার কোন সিন্দুর-লাঞ্ছিত মহুয়া গাছকে এখান হইতে নমস্কার করিল ; আশ্চর্য্য যে এক কুকুর তাহারে দেখিয়া অজস্র চীৎকার পাড়িয়াছে কেন না সে নাচিয়া উঠে। যাহাতে ইহা সিদ্ধ হয় যে সে অব্যর্থ, সে আছে ! এবং সে স্পষ্টত শুনিল—এই হারামজাদা—পাপ কাহাকে বলে ! এবং যে তাবৎ বিশ্বাস যে সে আছে এই বিশ্বাস তখনই সম্যক যখন তাহার পার্শ্বী আছে, তখনই স্থাবর জঙ্গম সবই সংখ্যায়ে, যে যাহা মননে তদীয় অব্যবস্থিত প্রকৃতি ইদানীং সাধারণ ; আর যে ঐ লকড় কারণে ভয় হইতে শহরের এতক্ষণকার যে দ্বন্দ্বহীন ভয়ে সে দিকভ্রান্ত থাকে, তাহাতে আর সেই এতাবৎ বৈলক্ষণ্যের তেমন চেহারা নাই ; এখই সুঘরাই আপনকার দেহ হইতে হাতের পানে চাহিল, ইহা নিমেষেই ওতপ্রোত যেমন যে সেই হস্তে একটি খাঁচা আছে এবং আদতে নিজের গেঞ্জীটি তাই ডান হাতে লয়, যাহা যেন খাঁচা আর যে তৎবুদ্ধিতে নাচাইল, যে সে খাঁচার ভার অনুভবিল ; আশ্চর্য্য সে কি পাগল, তাই কেবল এত সময় হায় সে এক রকম নিজ নাম হইতে, যে মাথায় সে এমন অর্থাৎ উচ্চতায় এমন যে এরূপ তাহারে দেখিতে হইতে, স্থানবাচক হইয়া সর্ব্বত্রে ব্যাকুলভাবে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়াছে ! আঃ তাহাতে বুত্তি আসিল, সৎসাহস আসিল।

তথাপি এই প্রকার আক্ষেপে সুঘরাই স্বীয় বক্ষে চাপড় মারিলেক, যে হায় যদি পাখীটি থাকিত ! ইহাতে তাহার ডোমত্ব নিশ্চিহ্ন হইল ; আর একদিকে সে দশাসই ডোম যদি অপি, তবু সে এখন অনায়াসে ফুল চয়ন করিয়া কানে পরিতে পারে, এবং সে সেই—যে ছেলেটির সহিত একটি পাখী আছে, যাহাতে সে বাস্তব, যাহাতে সে এই জড় পূর্ব্ব পশ্চিমাদি দিকের অপেক্ষা নহে ! এ পর্য্যন্ত যত কিছুকে—যাহাতে তাহাকে সহজে পাওয়া যায়—সে আপন শরীরের অঙ্গ করিতে আপ্রাণ ছিল, তৎসমুদয়ের ঠিক লইল এবং বুঝে দেহ তদীয় সীমা আর নহে—দেহে সে আটকাইয়া নাই, সমস্ত কিছু মিশিয়া মিলিয়া এক অত্যদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়াছে, যাহা দেখার তথা অনুভবের সঙ্গেই সে বলিয়া উঠে যে, ছেলেটির সহিত একটি পাখী আছে।

এই দৈব সমাধান অহো কীদৃশী বিস্ময়াবহ ! যে সুঘরাই নিজেকে নিজেই জবর ডাগর প্রস্তুত করিতে থাকে ঐ বাক্যাবলী, যে ছেলেটির একটি পাখী আছে, তুমুল-ভাবে উচ্চারণ উদ্দেশ্যে সুমহান স্বরে তাহার কণ্ঠে গঠিত হইল, ঝটিতি ধ্বনিত উহা হইল, যাহাতে ধর্ম্মত ইহাই, ন্যায়ত ইহাই, ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, ঐ পাখীটি কোন একদিনের, সত্যযুগের, যেক্ষণে দেবতা মানুষ অভেদ ! ঝটিতি সুঘরাই-এ চাকচিক্য ছটা ধরিল, যে সে সুদারুণ নির্ভয়ে সে পুনরায় কহিল, যে, ছেলেটির একটি পাখী আছে। আর যে ইহাতে সে এই বসুন্ধরাকে অভয় দান করিল !

ইহা, এখানকার অবিভ্রান্ত স্তব স্তোত্র মন্ত্র পাঠে, গম্ভীর জয়-বাবা-বৈদ্যনাথজী জয়ধ্বনি-মহিমাতে, অধুনা যাহা সুদূর কুম্ভকাণম-আগত তীর্থযাত্রী কর্তৃকও শব্দিত, এহেন পরম শুদ্ধ উদাত্ত স্বরবিভঙ্গে এবমুক্তবচন যে ছেলেটির একটি পাখী আছে, চিরতরে আটকাইয়া গেল, সংমিশ্রিত নহে, কদাচ ডুবে নাই! এবং সে কান পাতিয়া শুনিতে যাহা উদ্‌গ্রীব, ঐ সকল তপোলভ্য উচ্চারণে তাহার আপনকার নিশ্চিতই সঙ্গীতময় পদবন্ধ বিঘোষিত শুনিল, যাহার অনুরণন দেহে হওয়া মাত্রই. তাজ্জব যে, ইহা যেমন সংস্কার, যে সে মোটেই উৎচকিত না, এ যাবৎ কিঞ্চিন্মাত্র সে হা হা রবে কাঁদে নাই এখন গেঞ্জী যাহা খাঁচার পরিণতি – যাহা সে বহুক্ষণ পূর্ব্বে গাত্র হইতে খুলিয়াছে এমত ভাবনায়ে যে, উহা পরিয়া থাকিতে তাহার চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কেন না ইহা খুব ফর্সা, আর তজ্জন্য মনিব মহাশয় তাহাকে, কিছুই অবিশ্বাস্য নহে, চিনিয়া লইতে পারিতে অসমর্থ নির্ঘাত, আর সে সুলভ ঘৃণা হইতে বঞ্চিত – সেই গেঞ্জী বড় খুসী মনে পরিয়াছে! গেঞ্জীর আর্দ্র স্থান নিজ ত্বক্ সংস্পর্শ হইতেই সে হাসিল; অধিকন্তু খাদ্যসামগ্রীর যাবতীয় দোকানের বোতলগুলি দূর হইতে দর্শনেও সে সাবধান, প্যাড়ার গন্ধে সে অধীর, চমৎকৃত। আবার মনিব মহাশয়ের স্বর শুনিল – এই হারামজাদা···মনিব পত্নী বলিলেন – কি পাপ!

এ শহরে ধূলা উড়ে, পলাশ পত্র যত্রতত্র; এ শহর মুহুর্মুহুঃ উৎকৃষ্ট ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত, পুষ্পমাল্য দীপ দেদীপ্য, ধূপ কর্পূর চুয়া চন্দন গন্ধ এই স্থানে আকৃছার, তীর্থযাত্রীদের কণ্ঠস্বর সুললিত, তাহার সর্ব্বব্যাপিত্ব এই তীর্থ দ্বারা অস্বীকৃত হয় নাই, এ শহরে ব্রাহ্মণগণের গাত্রবর্ণে জৌলুস চিক্কণ দিবা; এই শহরে, নিকটে কোথাও যেমন বা নিঃশঙ্কচিত্ত মৃগশিশু সকল পরিভ্রমণ করে, যে শিবগঙ্গায় অনেক চক্রবাক সকল, আর উন্মুখী পদ্ম কম্পন, আর যে সেই শহরে সে পিতৃহন্তা পাপীর তুল্য অশরীরী ছিল! সম্প্রতি বালক এই শহর তীর্থকামীর চোখে দেখিল, যে সে সজীবতা, যে ঈদৃশী পুণ্যভাক্ নগরে তাহার হারাইয়া-যাওয়ার কারণ যাহা আদত, সম্যকই, তাহা নির্ণীত হইল, বোধগম্য হইল – মানুষ নোঙর লইয়া দেশ-দেশান্তর করে!

যদিস্যাৎ তাঁহারা, মনিবরা উক্ত ধরনের সংজ্ঞা, যে তাহার একটি পাখী আছে, নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন, অর্থাৎ কিনা সংজ্ঞা রচনার সুযোগ ঘটিত, তাহা হইলে কাহারও প্রশ্ন এতদন্ত করিবার কথাই আসিত না, তাঁহারা মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া, সুঘরাইকে না দেখিয়া, এদিক সেদিক চাহিয়া, পাণ্ডাঠাকুরের পরামর্শ শুনিয়া নিম্নস্থ ডাহিনে অতঃপর বামে এঁদো দুর্গন্ধযুক্ত সঙ্কীর্ণ গলি, ও যে কতিপয় জীর্ণ ফাটা দেওয়াল অতিক্রম করত যে রকে ছাগল ঝিমায় তাহার পাশ দিয়া বড় রাস্তায় চর্ব্বিত চর্ব্বণকারী ষাঁড়কে, ইঁহারা নমস্কার করিয়াই দেখিতেন অসংখ্য কবুতর উড্ডীয়ান হইল এবং আলোছায়ার পর আলো ঘটিল, আর তথায়

সুঘরাই, ওষ্ঠে তাহার স্মিত হাস্যরেখা ও সে তাহার পাখী লইয়া স্থিতবান, এই সেই সুঘরাই যে হরিজনদের সহিত জিগীর দেয় না, ইহা এক ছত্র ভাগর দৃশ্য, আর পিছনে শিবগঙ্গা।

সুঘরাই পাখী আনিতে বায়না ধরিয়াছিল, মনিব মহাশয়কে এই কথা—সুঘরাইএর ইচ্ছা—নিবেদনও তদীয় পত্নী করিয়া থাকেন, কিন্তু তদুত্তরে তিনি বলেন,—দুর্গা তুমি কি উন্মাদ হইলে, একে উহা দেবস্থান মানে আমরা দেব দর্শনে যাইতেছি—সেখানে কোন জন্তু লইয়া যাওয়া যায়···।

তা'তে কি হয়েছে, ছোট ছেলে বলছে, আহা বেচারী পাখীটাকে এক মুহূর্ত্তও ছেড়ে থাকতে পারে না···আর জমমে নিশ্চুই কেউ ছিল ও ছোঁড়ার···এক মুহূর্ত্ত কাছ-ছাড়া করতে পারে না···ছোঁড়া দেখ না বাছে যাবে তা'ও পাখী···ওগো অমত ক'র না, ওর ভারী সাধ পাখীটাকে বোদ্দিনাথ দর্শন করিয়া আনে···।

না না তুমি বড়ই উহারে আহ্লাদ দাও—কোথাকার এক ডোম ছোঁড়া, তাহার জন্য···উহাকে রাখিয়া দেখিতেছি মহা বিপদে পড়িয়াছি···

মনিব মহাশয় ও মনিব পত্নী এখানে আসিয়া এক গ্রাম্য বালক ভোজন দেন, ইহাতে কেয়ারি-করা-বাগানের কিছু নষ্ট হইয়াছিল—কিন্তু ব্রাহ্মণেতর সকলেই আসিয়াছিল, মনিব মহাশয়ের খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই জানিয়াও খুব হট্টগোল হয়, উচ্চবর্ণের বালকরা একটি বালকের সংস্পর্শ এড়াইয়াছে—যেহেতু সে ডোম, ইহারা হাড়িয়াল ডোম। এই বালকের চেহারায় নিদারুণ দুঃস্থতার ছাপ ছিল, অভাবিত নির্জ্জনতা আছে, এখানকার জংলী বৈচিত্র্যও ছিল এবং তাহার হাতে একটি পাখী ছিল—ফলে সেই বালককে উপস্থিত উচ্চবর্ণের ঘৃণা অন্যদিকে তাহার মায়া এক অপূর্ব্ব দুঃখ বোধ দিয়াছে, তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গীও চমকপ্রদ, পশ্চাতের অজস্র মৌসুমী ফুলের চরিত্রকে সে আটকাইয়াছিল। অন্ন নহে, ঘুমের পুষ্টি তাহার চোখে ছিল। সে একান্তে নিজেই বসিয়াছিল—মনিব পত্নী জিজ্ঞাসিলেন, তুমি এখানে কেন, সে দাঁড়াইয়া উত্তর দেয় 'আমি ডোম'; মনিব পত্নী তৎক্ষণাৎ আঃ মাধব আঃ ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন। মনিব মহাশয় কহিলেন—এই ব্যাপারের তুমি আমি কিছুই করিতে পারিব না; সে যখন খাইতেছিল তখন তাহার পাখীটিও তাহার পাতেই খাইতে আছে, এই ছবি গ্রাম্য বালকদের কলরোল, রন্ধনের গন্ধ, পাখী কুকুরের চেঁচামেচি ছাড়াইয়া উঠে—ইহাতে শাস্ত্রের উদাহরণ দেখিয়া মনিব পত্নী পতিকে উহা প্রত্যক্ষ করিতে ডাকিলেন। তাহাদের সাধন নির্দ্দেশে প্রত্যেকের পাতা ফেলিয়া দিলেন—মনিব পত্নী ঐ ডোম বালকের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন।

মনিব মহাশয় কহেন—না, না, ইহা হইবার নহে, ঐ ভীড়ে তুমি ক্ষেপিয়াছ দেখি···কে···

না, কেন ভীড় তা'তে কি, পাখীটা নিক্ না বাপু, দিদি ত মরে ভূত হয়ে গেছে, সেখানে যে রেখে যাবে দেখ্-ভালের জন্যে, ফিত্‌তে কত বেলাই হবে

কে জানে—আর ঐ পাষণ্ড ভগনীপতি লোকটাও ভাল নয়, থাকতেই যা ও ছোঁড়াকে দেয়, সে'ও পাখীটাকে দেখতে পারে না···আর তা' যে মাগী, এখন যারে ভগনীপতি রেখেছে, সে'ও পাখীটাকে দেখলে পরে কাঁইমাই করে, তা' সঙ্গে সঙ্গে মিনষে মুখ পোড়াও ধুয়ো ধরে···সিদিন নাকি বলেছে বাবুরা চলে যাক্, তুই ফিরে ত আসবি, পাখীটা আর একটু বড় হোক···তখন একদিন খুব মহুয়া তাড়ি মিশিয়ে খাব, খুব বমি করব, বৌকে, মাগীকে, খুব মারব আর পাখীটাকে কেটে, কাঁচা কাঠে ঝল্‌সে খাব···অথচ ও ছোঁড়া রোজ দুপুরে ভাত নিজে কম খেয়ে ওদের জন্যে নিয়ে যায়···পোষা তিতির আবার খায় নাকি···এখন বেচারা··· বেচারী ভয় কাঁটা···

সত্যই দুঃখের কথা, বটে, ইহা ত অনায়াসেই হইতে পারে···যে সে এখানে ত রাখিয়া যাইতে পারে ! এখানেই ত থাকে ও হারামজাদা ! ওর পাখী থাকে !

ও বাবা এখানে ঐ মালী বেটা তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, শনি-চারোয়া (চাকর), বামুন ঠাকুর সব্বাই ওকে হিংসে করে, বলেছে তুই চলে গেলে পাখীটাকে জংগলে ছেড়ে দিয়ে আসব'খন···সহিস পর্য্যন্ত, আর আর সবাই বলেছে···!

ঐ সব কথা মস্করা মাত্র, তাহারা আমাদের ভৃত্য, কখনও সাহস করিবে না··· বৃথা চিন্তা করিও না···

কি যে বল, সে কথা কি আমি বুঝি না, তবে যদি বল কেন তাহলে বলছ ? তা' উত্তর এই, যে, দেবস্থানে গিয়ে ও ছোঁড়া শান্তি পাবে না, হরি কথা শুনতে এসে পুঁই আড়ায় (মাচায়) মন ; তাতে পাপ হয়, ও'র ত হবেই আমাদেরও··· বিলি মধুর-ও···

দেখ, তুমি দেখি বড়ই মায়াপ্রবণ, তুমি যাহাতে দুঃখ না পাও তাই সুঘরাই ভোম জানা সত্বেও অর্থাৎ ইহা জানিয়াও যে, যদি ঐ হারামজাদা পাপকে কেহ যদি আঘাত দেয়, ছোট করে, তাহা হইলে আমরা দুজনেই মরমে মরিব···ইহা বুঝিয়াও রাজি হই, কোন আপত্তি করি নাই, কিন্তু পাখী কোথায় রহিবে··· আচ্ছা পাখীটি গাড়ীতে যদি··· ।

খেপেছ, গাড়ীতে সে ছোঁড়া রাজি হইবে না···সে শিবগঙ্গার জল ছিটুবে, মন্দির···কত সাধ ওর !

সত্যই তুমি দেখিতেছি, স্নেহে অন্ধ হইলে, আমারে ভুল বুঝিও না, উহাকে মন্দির কি কথা সে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেয় কিনা দেখ, এতদ্ব্যতীত ঐ ঢাউস পর্ব্বতপ্রমাণ পিঞ্জর লইয়া, সেই জনারণ্যে, ভীড়ের চাপে কি খেলা কথা, কোথায় ঘুরিবে··· ।

অবশ্য যে সে পাখীটিকে লওয়ার জন্য আর পীড়াপীড়ি করে নাই। এখন বুঝিল

যে সে ভালই করিয়াছে এবং ইহা ভাবিতেই অচিরাৎ অলৌকিক বিবাহ, মিলন, যাত্রা দেখিল, মুহুর্মুহুঃ আমলকী আদি পুষ্পবৃষ্টি হয়, জয় ভগবতী তনু জয় জয়, এবং তখনই আচম্বিতে পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িল, যেন বন্যফল হরিতকী আমলকাদি ছিন্ন হইয়া উৎক্ষিপ্ত হইল, খাঁচাটি হস্তচ্যুত হইল, বিদ্যুতেই পা'য়ের চাপে ভাঙ্গিয়া নয়ছয় নিশ্চিত, পাখীটি থরহরি, বিশেষত মুখোসটির ভৌতিক গতিবিধি দেখিয়া, এখন মুখোস পরিহিত ভিক্ষুক ও হরিজন ও নেতৃবর্গের পায়ের চাপে সে পাখীটি মরিতই, পলাইবার পথ পাইত না, আর যে অন্যপক্ষে সুঘরাইও সরিয়া আসিতে বাধ্য হইত, এবং সে ক্ষেত্রে মনিব মহাশয় কি বলিয়া খুঁজিতেন ; সুঘরাই কোন কথাই গঠনে সফলকাম হয় না ; ক্রমে ইহাও বিচারিত হয়, যে যদি সে অনন্ত উপায়ে মোহিলির গাড়ীতে রাখিত যখন সে মোহিলি রিখিয়া প্রত্যাবর্তনে প্রস্তুত তখন পাখীটিকে রাখিয়া আসিত, তাহা হইল নির্ঘাত বৈকালে রিখিয়ায় পৌছিয়া শুনিত, মোহিলি লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলিয়া চলাফেরা করত, এক অঘটন বিস্তার করিয়া, পরে শান্ত কণ্ঠে উপসংহারে বলিত, সিটা ভুলাই গেল্ রে। ইহাতে বনস্পতি অসুখী হইতেন : এবং বরং বারবার ইহাই তদ্দ্বারা অনুমিত হইল যে পাখীটি হাতে থাকিলে মহারাষ্ট্রীয় তীর্থযাত্রিণীদের অকূলে অকূল যেরূপ বাঁধা, এই বন্ধনের ছবিখানি, তখানি, যদি তাহাদের, তাহার ও মনিবদের, মধ্যে অলক্ষ্যে জাগিয়া থাকিত, এমন যে আঁধি উঠিলেও সূর্য্য ডুবিলেও তাহা কভু ভ্রান্ত হইবার নহে।

এই সময় কোন পাণ্ডাঠাকুরকে, বগলে যাহার খেরোর খাতা, যে এক যাত্রীর পশ্চাদ্ধাবনে মহা উত্যক্ত করিতে দেখিল, অন্যত্রে ইহা, যে অন্য একজন পাণ্ডা-ঠাকুর স্বীয় বাম উরুদেশ উপরে ঐরূপ এক খেরোর খাতা খুলিয়া ছড়া-পড়া সুরে এক যাত্রীবর্গের বহুপূর্ব্বতন পুরুষের নাম সাকিন শাখাপ্রশাখার নাম ইত্যাদি পাঠ করিতেছে, শ্রোতৃবর্গ সকলে একে অন্যের মুখ অবলোকনে অদ্ভুত গৌরবান্বিত, তাহারা সকলেই প্রীত, যে তাহারা বহুদিন এই পৃথিবীতে বসবাস করিতেছে, তাহাদের বংশধারায় সময়ের অবাক ঐশ্বর্য্য, সৌরমণ্ডলের প্রতিটি নক্ষত্র তাহাদের চিনিতে পারে, তাহারা কুসুমের জন্ম দেখিয়াছে, নদী যখন প্রথম ধাবমানা হইল সে কথাও মনে পড়ে, তাহাদের পরিচয় অতীব মহান, অত্যন্ত সুন্দর ; শ্রোতা সমুদয়ের মুখ নিরীক্ষণে সুঘরাই সনিষ্ঠ হইতেই এক চমৎকার ক্ষুরের আওয়াজ শুনিতে পাইল এবং যে, হায় তাহাদের পাণ্ডা হয় না এমত খেদ তাহাতে আসিয়াছে, এবং তৎক্ষণাৎ যে দুঃখের কিছু নাই এরূপ দৃঢ়তা দেখা দেয় এ কারণ যে তাহার পাখী আছে যাহাই তাহার, তাহাই বংশধারা, সে'ও শ্রোতাদের মতই, যাহারা মধ্যে মধ্যে মহা শূন্যতায় আপনাদের ধারা দেখে সেও যেন পাখীটিরে লক্ষ্য করিল। তখনই দেখিল পথপার্শ্বে কোন মাতা সন্তানকে স্তন্যদান করিতেছে।

সুঘরাই এখন বুঝিল সে ক্লান্ত ; একদিকে রিখিয়ার রাস্তা অন্যদিকে এই ধর্ম-উদ্দাম শহর তাহারে যেমন চাপিয়া ধরিয়াছে, দক্ষিণ দিক ধরিয়া মীনাবাজারের দিকে বা ইষ্টিশানের দিকে যাওনের ভরসা কখনই পায় নাই, যেহেতু তবু এদিকে গাছপালা তবু এদিকে ঝিঁঝিঁর শব্দ, ইহারা তাহার বড় জানাশুনা, তাই সে এই দিকেই ছিল, বেশী করিয়া হারাইবার সম্ভাবনা এখানে নাই, আর কারণ যে এই পথেই রিখিয়ায় ফিরিতে হইবে ; যে অনবরত মাথা ঘুরাইয়া দৃষ্টি ফিরাইতে তদীয় ঘাড়ে ব্যথা, এতক্ষণ এই পথে ডাক্তারবাবুর গাড়ী ব্যতীত অন্য ভাড়াটে গাড়ীও যায় নাই ; এদিকে ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিতেছে, ইদানীন্তন পাখী ব্যাপারের সমাধান সত্য, তবু অন্তঃস্থল ঝিম্, হাতে ঘাম হয়।

সে ধীরে চলিতে থাকিল, যে সে তির্য্যকভাবে একদল দুর্বৃত্ত পদবাচ্য যুবকদের দেখিল, ইহারা মলিন বস্ত্র পরিহিত, ইহাদের রাশিকৃত চুলে তেল নাই, এখনও ইহাদের হাতে হাতে তাস, যে ইহারা জুয়া খেলিতেছে ; নিশ্চয় মনিব মহাশয় এখানে আসেন, ইহাদের প্রতি তিনি যারপরনাই ঘৃণাভরে তাকাইলেন, যে ছিঃ এহেন শ্রীসম্পন্ন শহরে যেখানে শিব নিজে বর্ত্তমান, যেখানে সেদিন গতবছর ভূমিকম্পে যাহার ক্ষতিসাধন করিতে পারে নাই, এই স্থানের সবকিছু শিব, তোমরা কেন সেই পুণ্যকে পরিহাস কর !—এই মনোভাব এই জন্য যে ইহারা কেহ তাস ফেলিতে সময়ে শিব জয়ধ্বনি দিয়াছিল।

যাহা হউক তিনি কিন্তু যেহেতু আপন দায়ে বাধ্য তাই উহাদের অতিশয় নম্র-ভাবে, ইস কি লজ্জা, জিজ্ঞাসিলেন,—ভাই যে ছেলেটি তোমাদের তাস খেলা দেখিতে আগ্রহশীল হয় এ কারণ যে সে মনস্থ করে, তাহার ভাগ্য যাহা ইতঃপূর্ব্বে গণৎকারকে প্রশ্ন করিতে পারে নাই, এখন তাহার অভীষ্ট কল্পিত দান দর্শনে,—যাহা তোমাদের কেহ ফেলিবে,—তাহার ভাগ্য স্থিরীকৃত হইবে। সে জানে না এইভাবে সময়ক্ষেপ হয়, সদ্ভাব্যের খেলার মধ্যে নিয়ত ঋতুপরিবর্ত্তনের আঙ্গিক—চরিত্র রূপ আরোপ করা বৃথা, এবং সে তাই ক্রোধপরায়ণ হইবেই, স্বীয় যুক্তি খণ্ডিত হইলে, যেমন আশা ভগ্ন হইলে, যেমন মানুষে বিকারপ্রাপ্ত হয় ! তোমরা তাহাকে বলিলে, তোমাকে দারোগাবাবু পাঠাইয়াছে। সে, সুঘরাই, উত্তর দিয়াছে, তাহা নহে. ঐ যে তোমাদের পিছনে যে ঢাকি ঢাক আঁকড়াইয়া ঘুমাইতেছে, তাহার ঘুম ভাঙ্গিলে, মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাঙ্গিবে, কেন না উহার পায়ের বুড়ো আঙুল ইতস্তত নড়িতে আছে, ঘুম ভাঙ্গিলে জিজ্ঞাসিব যে, বিসরিয়ার বাপ যে ডোম এবং ঢাকি, নিবাস রিখিয়ায়, তাহারে দেখিয়াছে কি না। ইতি-পূর্ব্বে কর্ম্মব্যস্ত ঢাকিরা কেহ বলিয়াছে জানি না তোমরা কহিলে, উহার, সেই ঢাকির এখন জাগিবার সম্ভাবনা নাই, আমরা জানি, সে অহিফেন সহযোগে মদ্য-পান করিয়াছে। ইহার তোমাদের একজন ঘুমন্তর নাসিকার নিকট উৎকট চরসের ধোঁয়া ছাড়িলে বালকের উদ্দেশে কুট মুখ খারাপ করিলে—বালক যেন তোমাদের

স্বরে আপন চীৎকারের আওয়াজ পাইল, সে তাই মাথা ঘুরাইয়া আত্মরক্ষা করে যেন, বলিতে পার সে কোনদিকে গেল।

তেমনই ম্যাজিকওয়ালাকেও একটি বালককে দর্শাইয়া নিবেদন তিনি করিয়াছেন,—এইরূপ একটি বালক ক্রমাগত বলদ চোখে অনেকক্ষণ ধরিয়া তোমার নৈপুণ্যে একদম নিঃসাড় জড়, এমনও যে, যে সে হারাইয়াছে তাহা সে ভুলিয়াছে ; অনন্ত যখন মাঝে মধ্যে সম্বিৎ আসে, সে তোমার সিদ্ধ মহাপুরুষ জ্ঞান করিতেছিল, অগোচরে সে'ও অলৌকিকতাকামী যে এবং তুমি তাহারে তোমার কোন বিশেষ ছল—হাত সাফাই প্রদর্শন জন্য দর্শক সাধারণের মধ্যে তাহারে মনোনীত করত আহ্বান করিতেই, বালক ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠে। তুমি অভয়দানে কহিলে,—আরে ডরো মৎ, ডর কেয়া। ডর এই যে, প্রথমত তাহা গ্রাম্য-ভীরুতা, এবং যে চিরতরে নূতন করিয়া সে হারাইতে চাহে নাই, কেন না এখনকার সমবেতকণ্ঠে, তদীয় কান্নায়, হাস্তরোলের মধ্যে শুনে যে,—যাও এখনই ভেড়া হইয়া যাইবে। বালকরা পুনর্ব্বার যোগ দিয়াছে,—যাও না উহাতে এ মাথায় মিলাইয়া যাইবে। এই বলিয়া সকলেই ভূমি 'পরে রক্ষিত চুনকপ্রদ কঙ্কালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছে। আর যে সে বোমকান চোখে, সেই কঙ্কালের পানে লক্ষ্য করে, প্রত্যক্ষ করে যে তাহার ঘরপথ সকল, সে নহে, বোকার মত উহাতে ক্রমান্বয়ে ঢুকিয়া যাইতে আছে। যে এবং ব্যাকুলভাবে কান্দিতে ব্যক্ত করিল যে,—সে বড় হতভাগা, সে দুঃখী, সে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে এই খেলা দেখার আগে—যে সে বনপ্রদেশে একদা হঠাৎ আত্রা ফল দর্শনে যেমন চিনিয়া লইতে অপারগ হয় এখন তেমনই তাহার ভাবান্তর, যে সে হারাইয়াছে কিনা ইহাও বিস্মৃত, এখন সে হারাইয়াছে। তাহার কথা শুনিয়া সমবেত ভীড় হাসিয়া উঠে ; যে সে খুসী, সে খুসী। হে ম্যাজিকওয়ালা, তুমি তাহারে অব্যাহতি দিলেও সে কোনক্রমে তোমারই পাশ বরাবর আসিয়া দণ্ডায়মান থাকে, এখানে সে ঐ পূর্ব্বদৃষ্ট সন্ন্যাসীর মতই নিশ্চিন্ত, ইহার আসল কারণ এই যে, আমি তাহার মনিব, তাহার খোঁজে আছি, এখানে যদি আসি, স্বভাবত আমি ঐ নরকপাল হেরিয়া কি খেলা চলে তাই ধারণার নিমিত্তই, তোমা পানে তাকাইব ইহাই মানুষের প্রকৃতি মানুষের চরিত্র, হৃত বস্তু সম্পর্কে নূতন করিয়া অবহিত হইব আর যে তাহাকে দেখিতে পাইব। সে অনেকসময় যাবৎ ঐ ভাবে ছিল, যেহেতুও সেখানে সত্যসত্য হাড়ের খানিক ছিল।

ইহা এক গূঢ় কারণেই যে সে এই পরিবেশ ত্যাগ করিতে চাহে নাই। তোমার বাঁশীতে তাহার মন ছিল না, সে শুধু এই স্থলকে কক্ষ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কেননা কিছুক্ষণ আগে তাহাতে কোন প্রকারের, ইহা সর্ব্বথা উৎকট, কীদৃশী কুটিল, অভিনব অমানুষিক বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল ; ইহা তৎকালেই ঘটিল, যে মুহূর্ত্তে সে আমাদের প্রমত্ত হইয়া অন্বেষণের মধ্যে অবলীলাক্রমে, ঐ

সুসজ্জান পানের দোকানের সৌখীন উৎকৃষ্ট আয়নাতে এক মায়াবী প্রতিফলন সাক্ষাতে নিশ্চল, যে সে ব্যামোহাবিষ্ট, যে সে পূর্ণ সম্মোহিত হইয়া থাকে ; এবার তাহার হৃৎপিণ্ড কাঁপিল, এবার তাহার তালু শুষ্ক হইল এবং যে সে পদমেক পশ্চাতে হটে। যে, আয়নাতে যে সে-ই, নিজেই, যে যাহাকে সুঘরাই নামে ডাকিলে সাড়া দেয়, যে জাতিতে হয় ডোম, গোত্র যাহাদের নাই; অতীব স্বাভাবিকভাবে সে হয় ডোম, যাহার দৈবাৎস্পর্শে পুজারিণী গরদ পরিহিতা করুণাময়ী সর্ব্বদা স্নেহশীলা মনিব পত্নী শিহরিত, জয়দেব পাঠ স্তব্ধ, হস্ত হইতে পুষ্প সাজিচ্যুত হয়, পুনরপি তিনি স্নান করেন—সেই তিলক পরিচয় অবধি বিশদ নহে সে বিজাতীয় ঘৃণা হইতেও ছাড় পাইয়াছে—আর উচ্চেবর্ণের ঘৃণা যাহা তাহার জীবন যে, যাহার পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা ভগনী নাই, পত্নী নাই ; যে যাহার মহান-হৃদয় মনিবরা আছেন ; যে যাহাদের সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়াছে ; যে সে অধুনা হারাইয়া গিয়াছে ; কিন্তু কিছুই বিশদ হইল না।

যে সে আয়নাতে নেহারিল মাত্র যে এক ভূমিকর্ষণকৃত জমি, পূর্ব্ব ফসলের গোড়া পর্য্যন্ত যেখানে নাই, এইবার খর অকর্ষিত জমি রঙের কাহাকে কোন অবয়বকে দেখিল, আশ্চর্য্য যে সে জল চাহিতেছে, —ইহাতে সুঘরাই ঢোক গিলিল, জল ! জল ত দান করা হইয়াছে—জল পিতৃলোকে গিয়াছে ! কিন্তু সে এতই তৃষ্ণার্ত্ত—তৃষ্ণার্ত্ত না ভীত—আয়নায় প্রতিভাত মূর্ত্তি গিলিল, ইহাই তাহার পূর্ব্ব-পুরুষ ; যে উহা কাহার প্রতিবিম্ব, ঈদৃশ প্রশ্নে সে বিস্ফারিতনেত্রে প্রৌঢ়শীলা সদৃশ ; এমনও সুতরাং ফলে, অর্থাৎ, যে উহা আমিই ত, এহেন বাক্য নিশ্চয়াত্মক করিতে, বাস্তবিক করিতে, যে, স্বভাবত লোকে নিজ বক্ষ হস্ত স্থাপনে, অথবা এক্ষেত্রে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নিজেকে করে এখন তাহার সুঘরাইএর সে বৃত্তির অভাব থাকে, আরও যে, 'উহা' এই শব্দ ব্যবহার করিতে আপনকার অজ্ঞাতেই সে মূঢ়মতি—আর যে ইহা অবিশ্বাস্য নহে। সম্মুখে তাহার শনৈঃ সংজ্ঞাবিধ্বংসী নিঃশব্দ ! চেঙ্গারুরা কহিল—ভাবা যায় না কি গ্র্যাণ্ড ! ইহারা তাহারা যাহারা স্বপ্নের ভার বহে ! যাহারা স্থাবরকে সংবেদনশীলতা দিয়াছে।

ইতঃমধ্যে সুঘরাই আপনার পিছনে তাকাইল, সেখানে কেহ নাই, সেখানে ধূলা উড়ে, সেখানে পাতা বিক্ষমান ; তখনই সে সভয়ে নেত্রপাত করিল, অদূরে বিভিন্ন তিলকধারী একের পর এক যায় ও আসে, ইহাদের দর্শনেই বুঝা যায় যে কে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত, সে অবাক নয়নে তিলকমণ্ডিত ললাট লক্ষ্য করিল, যে তাহার আক্ষেপ হইল, যে সে তিলক পাঠে অপরিজ্ঞাত ; ইহা ঠিক যে বিবিধ কণ্ঠের জয়ধ্বনি তাহাকে চালিত করিল এবং আবার সে আয়নায়, ইদানীং সে নিজ হাতের উল্টীকৃত নীলাভ ডাং-উদ্ভত কিদিমকাঠ কোম-টি ভারী আবাপসা দেখিল ; এখনও উল্টী বিধায়ে তদীয় হাত কিঞ্চিৎ ফুলো কেন না ঐ বিছা উল্টী ছুই হাটবার আগে, হাটেতেই, করান হয় ; ইহা তাহা স্মরণেই আঁকান যে, ঠিক

সেদিনই সকালবেলা তাহার তিতির, তাহার ভগ্নীপতির গায়ের প্রায় এক আঙুল নিকটে উপস্থিত এক কাঁকড়া-বিছাকে পড়িমরি করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া ধরিয়া লইয়া ঠোঁট টুকিয়া তৎক্ষণাৎ খাইল ; আর যে ইহা দর্শনে গর্ব্বিত সুঘরাই উল্কীকরণের সঙ্কল্প করে, যে একটি তিতির ও তাহার ঠোঁটে একটি বিছা ! কিন্তু দুইটির খরচা ছ'পয়সা, আপাতত অগত্যা শুধু বিছাতেই সন্তুষ্ট থাকে ; তিতির সে আঁকাইবেই, আঃ ! তাহার চঞ্চুপুট দ্বারা বিছা আক্রমণ, আঃ ! তাহার পক্ষদ্বয় কি মনোহর প্রসারিত হয়, আ ! যেমন তাহা অনাদি কাল যাবৎ অমনই অক্ষুরন্ত মেলিয়া আছে !

এমন আয়নাতে সে ওতপ্রোত, এবং বিছা উল্কী সত্ত্বেও এখনও কিঞ্চিত সন্দেহ তাহাতে বর্ত্তমান ; যে সে কিছুতেই ঠাওর কোন উপায়ে সে চিনিতে পারে না ঐ প্রতিবিম্বকে ; কেবলই আরবার আপনকার নিরীহতা, ইন্‌নোস্তন্সে ভ্রূ সটান করে। আবার অন্যপক্ষে নিজেকে নিশ্চয়ই 'উহাই' শব্দে অভিহিত করিতে, সনাক্ত করিতে, সে নিজে ভীতিপ্রদ প্রহেলিকা। কি হেঁয়ালীপুর্ণ আবছায়া ! অঙ্গভঙ্গী মুখবিকৃতির প্রয়াস সবই বিদ্রূপাত্মক অন্ধকারে পরিণত ; ক্রমে ইহা তাহার মনে পড়ে যে তাহারা কেহই এমনও যে তাহাদের জাতের মোড়ল, এমনও যে অনেক তাহাদের অপেক্ষা উচ্চবর্ণের, জল-চল জাতের লোকও যেমন আপন বয়ঃক্রম জানে না, ঠিক তেমনই, তেমনই সেও যেমন নিজ বয়স জানে না, তেমনই নিশ্চয়ই সে'ও আপনার চেহারাবিষয় কিছুই জ্ঞাত নহে, যে চেহারা সে কুয়োর কাঁচ-জলে, আর অন্যসূত্রে তাহা শোনা দেখা নহে ! সুঘরাইএর মনে হইল, সে যেমত ভাসিয়া আছে, তাহার দেহ নাই, মৃত্তিকা নাই, এবং হঠাৎ সে আপনার বিছা-আঁকা হাত আঘ্রাণিল, যুগপৎ দেখিল ঐখানে আয়নাতে যে উহা, যে সে সে-ই, যে হারাইয়াছে, ইতিমধ্যে একদা যে মনে হয় আমার চেহারা নাই, তবে আমি হারাইব কেমনে—এবম্বিধ ধারণা সর্ব্বৈব বলদ ; আমি উহা আমিই উহা এবং ইত্যাকার বলিতে ও ভূমিতে পা-বাজাইয়া কবুল করিতে, সবিশেষ আত্মপ্রত্যয়-নিবন্ধন সে মরিয়া ; আমি ও উহার যে অলৌকিক বিবাহযাত্রা আমি দেখিয়াছি, সেই চৈতন্য সত্তা তাহার জড়তা ভাঙ্গিল ; ইতিমধ্যের ঘোর অন্ধকারকে সে পান করিল, সে ইহাতে বেসামাল হইল ; সহসা শ্রুত হইল যে সে, সাদরে 'আতিতি-তি' শব্দে উহাকে তথা অপনাকে ডাকে ; এবার আচম্বিতে বোধিয়া উঠিল, —আমি সেই যাহার এক পাখী আছে। ইহার সঙ্গেই জয় বাবা বৈদ্যনাথ ধ্বনি তুলিতে চাহিলেও পারে না। যে এবং ধীরে কহিল, —উহা সেই আমি যাহার এক পাখী আছে। কেন যেন মনে হয় পাখী বেহাত হইল।

তৎকালে পানের দোকান হইতে, হে ম্যাজিকওয়ালা তোমার ডম্বরু ও বাঁশী শ্রবণে সেই উচ্চবর্ণের ভাবনার স্বপ্নের ছেদ পড়িল। ম্যাজিকওয়ালা তাহার উত্তর। সঠিকভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে সে যেন বাঁচিল ; ভাগ্যশ সে বালক,

তাই তোমার ম্যাজিক দর্শন জন্য ঔৎসুক্যপরতন্ত্র দৌড়াইয়া আসিতে এক নিমেষ ত্রিকূট পাহাড় তাহার চোখে পড়ে, তোমার এখানে সে অব্যাহতি লাভের পর একদিকে বড় স্বস্তি বড় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, তেমনই তোমার নৈপুণ্য দেখিতে তাহার মনে হয়, হায় মনিব মহাশয় ও তদীয় পত্নীর কত জিনিষ খোয়া যাইতে সে নিজে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করে, আর অদ্য সে নিজেই হারাইয়া গেল — এবং লকড়কে সে যথেচ্ছা গালাগাল দিল ; তাই সে ক্রমে পুনরায় বিমর্ষ এবং তজ্জন্যই তুমি যখন খেলা দেখানোর পর মহাচাতুরিতে নরকপালটি স্বীয় মুখের সন্নিকটে উন্নীত করত, তোমার বিড়ির ধোঁয়া, যাহা নীল, ঐ কপালের ছিদ্র দিয়া বালখিল্যতাবশত পাচার করাও, ফলে, কপালের করাল দন্ত বহিয়া ধূম অনর্গল বহির্গত হয়, ইহা প্রত্যক্ষেও সে অন্যান্য সবস্ত্র ও উলঙ্গ বালক বালিকাদের মত হাসে নাই, সে কোন দিকে গেল জান !

ইহা সত্য বটে যে, আপনারে সনাক্তকরণে অকৃতকার্য্য হওয়াতে এবং যে আমার একটি পাখী আছে — এখন উপস্থিত যাহা নাই ইহা ভাবাতে সে অধিকন্তু মুষড়াইয়া পড়িল, যেমত সে দ্বিগুণ হারাইয়া গিয়াছে ; তাহাতে বিজাতীয় আক্রোশের ধমক উদ্গত হইতে চাহিল, সে দুর্বৃত্ত যেমন, কাহার উপর যে রুষ্ট সে ইহা বুঝিতে চাহে নাই ; এমনও যে এখানে সোখানের মোটা নিম ডাল দিয়া পাথরে সিন্ধি পেশাই করা দর্শনে প্রলুব্ধ হওয়ত, প্রসাদের নিমিত্ত কিয়ৎ দূরে দাঁড়াইতে সম্প্রতি কোন সুমধুর পাঠের আওয়াজে সে আকৃষ্ট হইল ; এবার পাঠ বন্ধ হইয়া গীত হয়, যথা —

তুলসী উহাঁ যাইয়ে যাঁহা আদর ন করে কোই।
মান ঘটে মন মরে রাম কো শরণ হোই॥

আসমুদ্রহিমাচলে যে যেখানে রোমাঞ্চিত হইল, তাহার এই শুদ্ধ গীতের শব্দ-তরঙ্গই কারণ ; এখানে অনেকের পুলকাশ্রুতে নয়নযুগ সজল, অনবরত রামনামে স্থান সুন্দর হইয়া উঠে ; ইহাতে সুঘরাই বুঝে যে সম্মুখে রামায়ণ গান হইতেছে, কিন্তু তদীয় মানসিকতা অত্রাহি সত্ত্বে সে স্থান পরিত্যাগ করে নাই, প্রথমত সে মর্ম্মে মর্ম্মে জানে, যে তাহার সন্ধানের মধ্যে দেবালয়, সন্ন্যাসী, অবধূত, গীতা বা রামায়ণ পাঠ আমাকে চুম্বকের মতনই টানিবে, যেহেতু আমি ও মদীয় পত্নী অতীব ধর্ম্মপরায়ণ, যদিও জানি সে নীচকুলোদ্ভব এবং এই ত্রাণবিরহিত পবিত্র রামকথা যাহা মোক্ষ ও প্রীতিদায়িকা তন্নিমিত্ত তাহার কোনই মতি নাই, — উহার বয়ঃক্রম কোন হেতুই নহে, — তবু তাই সে কিছুকাল বাধ্য হইয়া যাপন করিবে ; এখন উক্ত গীতে সে আলোড়িত বিশেষত কথকের বিন্যাসই তাহার অনুপ্রেরণায়ে।

কথক ঠাকুর বলিয়াছিলেন, রে পাগল মন, ওরে তুলসী তুই ছায়া ত্যাগ করে রৌদ্রে যা ; তুমি কুজালিঙ্গন ছাড়িও, এমন স্থানে যাইও যেখানে অহঙ্কার অহরহ দলিত হয়, যেখানে তোমায় উচ্ছিষ্ট দেয়, লোকে দূরদূর করে, আগুনটুকু চাহিলে

হাঁ হাঁ শব্দে তাড়না করে, কাহার প্রজ্বলিত দীপ হইতে দীপ জ্বালিতে যাইলে সে ভাবে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম সেখানে মন যাও, যেখানে মরমে তুমি ম'র, তোমার কেহ নাই, পরিজন নাই, তুমি একা সম্পূর্ণ তুমি যখন আপন বোঝা তখনই যখন ঠিক ঠিক দুঃখ পাইবে ; তখনই রাম স্মরণ হইবে, অবশ্য দুঃখ অনুভবের মধ্যেও আমি আছে ; তবে, এই আমি'র দোষ নাই, সেই আমি'র রাম নাম স্মরণ হইবে। তেমন দুঃখের মধ্যে তেমন দুর্ভাগ্যের মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়ত হে মানুষ তুমি যাইও। রামের কথা স্মরণ হইবে। হা রাম বলিতে পারিবে।

যথা ভূমি সব বীজময় নগত নিবাস আকাশ।
তথা রাম নাম সব ধরমময় জানত হি তুলসী দাস।

সুঘরাই এই গীতে ডোমসুলভ চোখে, বালক-উচিত ভঙ্গীতে গায়কদের মুখপানে চাহিয়া থাকে, ইহা অলোকসামান্য কাব্য, কারণ সে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা সহকারে সরলতা নহে, যাহা ভক্তির বীজ, অবশ্য কোন শিশুরই সরলতা নাই, তাহার অপরিণত স্বভাব আছে, সরলতা সন্ন্যাসধর্ম্মের সরলতা, সন্ন্যাসীর অবতারাদির ভাবই সরলতা—ঐ সুর উঠা পড়া দার্ঢ্যস্থর রোমন্থনকারী মৃগশিশুর ন্যায় ক্রমে এখন দেখিতে লাগিল ; অবশ্য সে ডোমপুত্র, গীত শুনিতে ডিগব্বিয়ার পাহাড়, যেখানে সূর্য্য ডুবে তদবধি শঙ্খচিল যেখানে বিন্দুবৎ, পদ্মের কোরক যে পর্য্যন্ত গিয়া কুৎসিত তদবধি ভূমিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিল না, হায়! আমি ভূমি, বলিতে বিবেক তাহার হয় নাই ; অন্যপক্ষে অবশ্য, আকাশ কথাতে, তদীয় শরীরমধ্যে বিপরীত পাকে, কি এক কিছু যেমন বা ঘুরিতে থাকে, কিন্তু প্রক্রিয়া অভাবনীয় ধীরে ; সে অবশ্যই মশাল তৈয়ারী করে যদ্দ্বারা আকাশকে দেখিবে, যে সে তখনই নিজেরে ঐরূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত বুঝিয়া ধড়েতে আর ছিল না, তাহার ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, কেননা মধ্যে কোথাও, এই ব্যোমের, মেঘাশ্রয় নাই,—ক্রমাম্বয় সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে যাহা। হায় সে ঐ পদবন্ধের 'যথা'-র নিয়ন্ত্রিত, আনীত বাস্তবতায় আতান্তরে নিক্ষেপ করিল, সে গণৎকারের গলা যেন পাইল, যে এবং ইহাতে আরও মূঢ় সে হয় ; তবু কোনক্রমে কথকঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল ; ইনি বলিতেছিলেন, রাম নামে আঁখি ঝুরে···! এই সূত্রে, যদিও ঐ উপদেশ ইঙ্গিত চমৎকার, তবু বলি একদা, আমার পরমারাধ্য মাধব আমায় বলিয়াছেন, 'ভগবানের নামে, আমার নামে শিশু গাত্রগন্ধ যে না পায়, সে আমারে পায় না' আঃ শিশু গাত্রগন্ধই রাম! কথকঠাকুর এমনভাবে, রাম উচ্চারণ করেন যেন চিরজীব হনুমানের চোখে জল আসিল ; অন্যপক্ষে যে সুঘরাইএর অদ্ভুত রোমহর্ষাদি লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইলেও, ওষ্ঠ এখন আর্দ্র হইলেও, কোথাও যেমত বা আড়ষ্টতা জড়তা সঙ্কোচ জাড্য কুণ্ঠা অপ্রতিভতা, মেদাটে বৈলক্ষণ্য আছিল, এবার হঠাৎ সে ক্ষোভে অনুতাপে ক্ষিপ্ত, কেননা নেতৃবর্গশিক্ষিত কীদৃশী কদর্য্য, কি পর্য্যন্ত প্রমত্ত হিংসাপ্রযুক্ত, জগতের-নীচতম-বৃত্তি রাজনৈতিক রোলে তাহারই

সুঘরাইএর স্বজাতিবৃন্দ বেচারী হরিজনরা, এহেন সুন্দর রাম নাম মধ্যে মধ্যে করে, তাহাদের সেই চীৎকারের সহিত তাহাদের উৎকট গাত্রগন্ধ স্থানকে অপবিত্র করে! এবং সে হঠাৎ 'আমি ডোম আমি ডোম্' ইত্যাকার অনার্য্য চীৎকারে—এখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, 'আমি ডোম' 'আমি ডোম' বলিতে ইহাই ধর্ম্মত অর্থাৎ ব্যক্ত হয় যে মনুগণের পুর্ব্বে বহুকাল হইতে আমি হারাইয়াছি!—তাহার পশ্চাতে সঙ্গে সঙ্গে রাম নাম নিশ্চিত গিয়াছিল। এবং মনিব মহাশয় যে ব্যক্তির নিকট সংবাদ লইতে এতেক বর্ণনা করেন তাহাকে সুঘরাই বিষয়ে আরও প্রশ্ন করিলেন—এবং তৎসহ তাঁহার অন্তরে প্রার্থনা শ্রুত হইল, যে, হায় ঠাকুর তুমি অন্তর্য্যামী তুমি তাহার শুভাশুভ সবই জান, তবু—।

অনন্তর তিনি, মনিব মহাশয়, যারপরনাই অবসন্নচিত্তে, পরিশ্রান্ত হওয়ত শিব-গঙ্গার ধারে আসিলেন, এখানে তাঁহার গায়ে আর্দ্র মসৃণ বাতাস কিয়দংশে তাঁহার ক্লান্তির অপনোদন করিল, দেখিলেন উদ্বেলিত জলস্তর, অদূরে জনৈকা লোল-চর্ম্মাঙ্গিনী অশীতিপর বৃদ্ধা, দেহ যাহার স্থূল, এখন জলে রহিয়া মুখ প্রক্ষালনে নিয়োজিতা, যে এবং তজ্জন্য তদীয় বিশুষ্ক কদাকার প্রলম্বিত নির্ব্বাপিত স্তনদ্বয় জল-ছোঁয়া, সুতরাং জলস্তরে ভাসমান ফুল ও পাপড়ি যাবতীয় উহাতে আসিয়া লাগিয়া ঠেকিয়া সরিয়া আঘাতিয়া বিলি কাটে, অতএব এতাদৃশ সমাপতন, যদি অপি এলেবেলে, বড়ই কৌতুকপ্রদ, স্রেফ ফাজিল; ইহা প্রত্যক্ষেও যে তিনি কোনই মজা আরোহণ করেন না, এ কারণ যে সদাই তাঁহার মনে ইহা আঁচড়াইতে আছিল, পুষ্পদন্তের শ্লোক আমার কণ্ঠস্থ করা বৃথা, কোথায় শিবই মদীয় অদ্বিতীয় স্মরণ মননের বিষয়ীভূত হইবেন, না, কোথায় আমি ডোমপুত্র সুঘরাইএর সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। এই কি আমার নিয়তি!

মনিব মহাশয় ইদনীন্তন বৈচিত্র্যপরতন্ত্র সর্ব্বত্র শ্যেনদৃষ্টিতে বিশ্লেষিত করিতে এক মহা আনন্দময় অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান যোগীকে দেখিলেন, দর্শনমাত্রই বিশ্বাস ইনি মহাপুরুষ, ইনি যে পরমহংস তাহাও নিশ্চয়, কেননা ঠাকুর ইহাদের লক্ষণের কথা বলিয়াছেন; সেই মহাপুরুষের নিকট বেশ কিছু সবস্ত্র ও প্রায়ই উলঙ্গ বালক বালিকা, যাহাদের তিনি নিশ্চয় তদীয় সুদীর্ঘ ধীরনেত্র মেলিয়া একদৃষ্টে দর্শনে আপনাতে বালকস্বভাব আরোপ করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে মেওয়া মিছরি বিলাইতেছিলেন; তিনি নবাগত দেখিলেই,—ওঁ তৎ সৎ, এস এস আমার সমক্ষে দাঁড়াও, তোমারে আমি নয়ন ভরিয়া দেখি, খেলা কর, কথা বল, আমি শুনি, ওঁ তৎ সৎ।

মনিব মহাশয় সাষ্টাঙ্গে প্রণামের পর নিবেদন করিলেন,—ভগবান, আপনি ক্ষমাশীল, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, যেহেতু আপনি বালকবালিকারে সাধন আদর্শ বলিয়া মান্য করেন, জ্ঞান করেন ও তদ্দ্বারা অদ্ভুত সরলতা নির্ম্মাণ ও তদ্দ্বারা ঐ সরলতার দ্বারা, অদ্ভুত রজ্জু নির্ম্মাণ করেন, তাই নির্ভয়ে আপনারে

জিজ্ঞাসা করি, এক বালক – এই পর্য্যন্ত, বলিতেই তিনি, সেই মহাপুরুষ, মৃদু হাস্তে, ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব যেন নড়িয়া উঠিল, কাব্যবৃত্তি বিকচ হইল এবং তিনি কহিলেন যে, – সে কাছে আসে নাই, প্রত্যেক বালকবালিকা তাহারে অভয় দেয় তবু, – আর এক বালক যখন আর এক'কে অভয় দেয় – সে এক বলিহারি ছবি !··· সম্ভবত এত ছোটদের মধ্যে যাহারা মাথায় ছোট সেই সকলের উলঙ্গদের মধ্যে কি যাইর, ভাবিয়া সে চলিয়া গিয়াছে, আমার নিকট সে'ও ইহাদের মতই, তবু সে আমার আহ্বান বুঝে নাই···এখন এই মিছরি লও, মেওয়া লও, বেচারীর মুখ শুকনা। লও, তাহার মঙ্গল ইচ্ছাময় করিবেন।

মনিব মহাশয় সশ্রদ্ধায় করজোড়ে মেওয়া মিছরি গ্রহণ করত মহাপুরুষের পদার্চ্চনার পর ধীরে কহিলেন, – প্রভো, আপনি সেই যিনি পত্র উদ্গম রহস্য দেখিয়াছেন, আপনার হাস্তে অচিন্ত্যনীয় শ্লোকপ্রবাহ, আপনার চাহনিতে শত বাত্যাতেও দীপশিখা অস্পন্দ হয়, আপনি জ্ঞাত যে সেই অভাগা কেন আপনার সন্নিহিত হয় নাই ; সে ঐ সময় এক দাঁড়কাকের রব শুনে যখন আপনি তাহারে আহ্বান করিলেন, সে দেখিল যে এখানেই আপনার নিকটেই বাঘেরা খেলোয়াড়ের ঘুম ভাঙ্গিল, অর্থাৎ আপনার নিকটেই উহাঁর ঘুম থাকে, যে সে দেখিল এক উন্মাদ তুলা পিঞ্জিতেছে, এবং পরক্ষণেই আবার মহানন্দে অচেনা আকাশ লইয়া খেলা করিতেছে, আমার বুদ্ধি ব'লে, ইহা আপনি তাহারে দর্শাইলেন। সে অথচ ভীত হইল। সে কাষ্ঠচ্যুত কূর্ম্মবৎ এক অভিনব জীব, তাহারে রক্ষা করুন, হায় সে অবস্তম্ভাবিতার দিকে ছুটিল – !

তিনি, মনিব মহাশয়, অতঃপর চলিতে থাকিয়া আপন প্রসারিত করপুটে ঐ মিছরি ও মেওয়া দর্শনে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ইহাতে অত্যাশ্চর্য্য ভালবাসা ছিল। এ কারণ যে পশ্চিমের পত্রভেদী সূর্য্যরশ্মিতে স্ফটিকতুল্য মিছরি-খণ্ডে অজস্র রামধনুর আশ্রয় হইয়াছে, কিসমিস রঙ ধরিয়াছে, ইহারা বহু পুরাতন হইয়াছে। এবং যে ইহা হইতে চক্ষু তুলিতেই তিনি খ, হস্ত হইতে তখনই প্রসাদী সকল মাটিতে পতিত হইল, যে সেইদিকে তাকাইবার সময় পাইলেন না, অথচ যে তিনি প্রসাদ পতিত হওয়ার অপরাধে আপন জিহ্বা দংশন করত আপন কর্ণদ্বয় মলিতে থাকিলেন, কেন না এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিলেন : এক মৃত ব্যাঙ, যাহারে লইয়া দু একটি কাক ছিন্ন করিতেছে, তিনি ইহা যে তীর্থ-ক্ষেত্র তাহা ভুলিলেন, কোন শিব জয়ধ্বনি আর শুনিতে পাইলেন না ; যে এহেন দৃশ্য তদীয় গৃহদ্বারকে পর্য্যন্ত আঘাত করিল, সাঁওতাল গৃহদ্বারে কত লতাপাতা – বাঙ্গলার গৃহদ্বারে এস মা আনন্দময়ী – এহেন দৃশ্য তদীয় মমত্ববোধকে পরিহাস করিল। এবং যে তিনি নির্ঘাত, হাঁ, তিনি নির্ঘাত হঠাৎ, যেন মনে মনে কলের গানের কাছে যাইলেন, আপন আসবাবপত্র জামাজুতা দেখিলেন, স্ত্রীর ফোটগ্রাফের নিকট দাঁড়াইয়া খানিক, তৎপর পাইপ ধরাইয়া একটি টান দিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন,

যে ঈদৃশী নিন্দ্য দুষ্কর্ম অভ্রান্ত যে সুঘরাই কর্তৃক সংসাধিত হইয়াছে ; তখনই ম্রিয়মাণ ইহাতে, অবিলম্বেই বুঝিলেন যে সে যেন দারুণ শিক্ষিতের মত, যে তাহার নিজের মস্তকের করোটি সম্পূর্ণরূপে বদল হইয়া গিয়াছে৭ যে সে নিজের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে, একের পর এক সংস্থান্ সে ক্রমাগত আশায় কখনও কৌতূহল প্রবর্ত্তিত হইয়া ভাঙ্গিয়াছে ও যে ইত্যাকারেই ক্রমবর্দ্ধমান রাগে, বিশেষত নিজেরে আপাতক্তেয় কচিৎ জানিয়া, কভু স্বতঃই করিয়া, সে মায়াত্মক অধুনা হইয়াছে ; অধুনা সে যে ডোম ইহাও বিস্মৃত ; যে এবং সে মানসিক বৈগুণ্যে পথের কুকুরকে ঢেলা দ্বারা আক্রমণ করিয়াছে, যে অনেক নিরীহ কাঠবেড়ালীকে ক্ষুদ্র সর্পের হিস্ শব্দে খেদাইয়াছে।

যেমনভাবে সে তদ্রূপ বিষাক্ত আওয়াজে তাহার আপনকার প্রাণপ্রিয় জীবিত স্বরূপ তিতিরটিকে একদা ভয় প্রদর্শন ক্রমে খুসী হয়, মনিব মহাশয় বুঝিলেন, সেই প্রবৃত্তির নাশ হয় নাই, অথচ কিন্তু ঐ ব্যাপারের জন্য সে, সুঘরাই, তখন অপ্রতিভ হয়, তখন আধোবদন হয় ; যাহা এইরূপ ঘটে শনিচারোয়া সেদিন না আসাতে সুঘরাই ভিতরের বারান্দা ঝাঁট দিতেছিল, তদীয় পার্শটি নিকটেই এবং উহার গাত্রে সকালের রোদ বেলোয়ারি, যাঁহা সহসা সুঘরাই অবলোকনে আবিষ্কার করিল ; যাহাতে সে অতিশয় তন্ময় ; এতদ্ভাবাপন্ন রহিতে ক্রমে, তাহার সারা দেহ এক যাদু আবেগে তছনছ, রোমকূপে ঘোর শব্দ বহিয়া হৈ দিয়া উঠিল। যে আর, সে এরূপ বাক্যে আপনাকে, সেই উচ্ছ্বাসকে, প্রকাশিল,—ওরে আমার সোনার পক্ষী দেখ, দেখ, এখন আমার সর্ব্বশরীর তোমার প্রীতিবর্দ্ধন নিমিত্ত, তৃপ্তিসাধন হেতু, সম্পূর্ণ পতত্বরূপ ধারণ করিয়াছে, হে রে পক্ষী তুমি আমারে সত্বর খাও, হে রে তুমি আমারে বিনা লবণেই খাও, আমি সার্থক হই ! ইহা বলিবার পর মহা আদরে গদগদভাবে সোহাগাত্মক ভাব জানাইল ও তৎসহ সে নিজ হস্ত প্রসারিত করিল, যাহাতে তাহার প্রিয়তম পাখীটি চঞ্চুদ্বারা উহার হাতে মৃদু টোকা দেয়। সে ভারী খুসী, যে এবং ইহাতে অঢেল উৎফুল্ল হওয়ত আপন দেহ, উপস্থিত তদীয় দেহ, যাহা চতুষ্পদ ভঙ্গীতে ছিল, তাহাতে যেন গোপন কোন দুলর্ভ কিছু ভোজ্য বস্তু পাকিয়া আছে, তাহাই দেহ হইতে, অদ্ভুত ভাবে আন্দোলনে সুঘরাই উৎক্ষিপ্ত করিয়া তিতিরটিকে দিতে চাহিয়াছে কি-যে-নিবেদন--করে তাহা ব্যক্ত করিতে অনেকই বাস্তবতা, অনেক স্বাচ-প্রত্যক্ষ প্রতীয়মাণতা, স্মরিয়াছে ; ও যে অবিচারিত চিত্তে অসাধনেই ডোমবুদ্ধিতে বলিয়াছিল,—ওরে পক্ষী, এখন আমি নিজেই ঐ যে দুইটি পাহাড় স্পর্দ্ধাভরে একে অন্যের প্রতি চাহিয়া আছে সেই দুইটিই আমি, এখন আমি ত্রিকূট, এখন আমি ডিগরিয়া পাহাড়, এবার ইতোমধ্যে যে দিক সকল ব্যাপ্ত তাহা কব্জা করিয়াছি, তুমি সত্বর তাহা গ্রহণ কর গ্রহণ কর, আমি সুখী সার্থক ও ধন্য হই। আয় আমরা কামড়াকামড়ি করি, কুকুররা যেরূপ করে, আমার ভগনীপতি ও তাহার স্ত্রীলোক যেরূপ করে।

এবম্প্রকার বচন সুঘরাইএর নিজেরই, হৃদয়ঙ্গম হইতেই সে হরষে কণ্টকিত, সে অতিকায় সুবিশাল, এখানেই সূর্য্য উঠে ডুবে ইহা প্রমাণিত হইতেই সে অধীর; ভাগ্যে পক্ষী দূরে যায়, ভাগ্যে ঝাঁটা নিকটেই আছে, আর যেটিকে ধরিতেই সে প্রকৃতিস্থ হইল! তাই সাব্যস্ত হইল যে, সে ভীত ও যে এহেন ভীতি সম্পর্কে সুঘরাই একদমই অপরিজ্ঞাত; নিশ্চয়ই ইহা সর্প বিছা ব্যাঘ্র অন্ধকার ঝঞ্ঝা বজ্রপাত প্রেত পেয়াদা ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণ হইতে, বা ঠকিবার ভীতি হইতে ইহা, মোটর গাড়ী হইতে ইহা অধিক কূট, বাঁকা! এখন সম্মুখে কোন কিছু কল্পনে অনুভবের পূর্ব্বেই সে ঝাঁটার জলদি শব্দ কিন্তু তাহারে আকৃষ্ট করে, এখন দেশীয় ঘৃত মিশ্রিত মুরগীর মাংস পাকের গন্ধ তাহাকে প্রলুব্ধ করে নাই যেন গন্ধ হইতে ঘৃতগন্ধ যে স্বাদু তা বুঝে ইদানীং। ঝাঁটার আওয়াজে সে আর এক; ফলে ত্বরিতে উহা অনুকরণ প্রাবল্যে অচিরাৎ কালান্তক গোখুরা সর্পের হিস্ সুঘরাইএর জিহ্বায় ঘটিল, আর সে তখনই পরমাশ্চর্য্য ভালবাসাতে ঐ বিভীষিতকারী করাল হিস্ শব্দে তিতির পাখীটিকে, আতঙ্কগ্রস্ত করিতে বাহাদুর; মহা আহ্লাদ তাহাতে, সে আপন কৌশল দেখাইবার নিমিত্ত চারিদিকে দেখে, পরক্ষণেই হিস্ শব্দ খেলিয়া উঠিল, ইহাতে সকালের হাওয়া বজ্রাহত. মানুষের রক্ত নিস্তেজ প্রাপ্ত হইল।

অদূরে খাবার ঘরে মনিব পত্নী খানিক বাসি মুরগীর-মাংসর-তলা-পুড়াইয়া পাক স্টোভে সকাল-বেলাকার জলখাবারের জন্য প্রস্তুত তদারক করিতেছিলেন, তাঁহার কান খাড়া হইল, সেই মারাত্মক ধ্বনি স্টোভ অথবা তৎজাতীয় অন্য কোন আওয়াজের সহিত মিশিয়া যাইবার না, উহাতে নিঘতির পায়ের খস খস! শ্মশান-ভূমি যেন ফুঁসিতেছে; অন্য ঘরে যে শব্দে, মনিব মহাশয় রাত্র-আঙরাখা পরনে পাইপ মুখে কলের গানে কমলা ঝরিয়ার গান শুনিবার মধ্যে পরিষ্কার অবিধানে বুঝিয়া থাকেন; ফলে দুজনেই, মনিব পত্নী ময়দার তাল সমেত হাতে ত্রস্ত হয়ওত দরজার গোড়ায়, ও যে মনিব মহাশয় শঙ্কিত পদে বারান্দায় আসিলেন; এখন ইনি হিস্ শব্দের কারণ নির্দ্ধারণে অতি স্বাভাবিকভাবে পাইপ-ধৃত দাঁতেই কোনমতে হেই দিয়াছিলেন।

মনিব পত্নী অধিক উষ্মামতি তাহারে সতিশয় তাড়নাপূর্ব্বক এই কথা বলেন,—বলি পোড়ার মুকো নচ্ছর শয়তান বলি হচ্ছেটাকি, আবার দাঁত বার করে হাঁসছিস, লাজলজ্জার বালাই নেই, এই সাতসকালে বেচারা পাখীটার ···লাগা, কি কাণ্ড! আমি ত ভয়ে কাঁটা, আর কাজ পেলি না, ঐ এক রত্তি পাখী ছেলেমানুষ্ অবলা জীব, তাকে ভয় দেখাতে তোঃ বাধল না, তোঃ মতন শয়তান ত কখন দেখিনি, সাপ হয়েছিস্ ছ্যা ছা···দেখবি'খনে আঃ-জন্মে সাপ হয়ে জন্মাতে হবে···তোঃ ভালবাসার মুখে ঝাড়ু, তোদেঃ কি মায়া মমতা বলতে কিছুঃটি নেই র‍্যা, সাত সকালে ইকি কাণ্ড! ও ঘরে না ৺মা রয়েছেন, বুঝলি

অনেক পুণ্যে মানুষ জন্ম, অনেক পাপে ছোটজেতের ঘরে জন্ম হয়, ডোম চাঁড়াল হয়, ওঁর আদরেই তুই এত বাড় বেড়েছিস্! – এবং ইহার সহিত আপন স্বামীর উদ্দেশে কহিলেন, – তুমি ওরে কিছুটি বলনা বলেই ত এত আস্পদ্ধা, ইস ভাবলে গা হিম হয়, কতবড় পাজি, তুই শয়তান না মানুষ, নিশ্চয়ই ডাকাত হবে···আবার ওকে তুমি বন্দুক সাফ করতে দেবে বলেছিলে (!) তুমি কিছু বল না বলেই ত··· কি নরক যন্ত্রণা!

মনিব মহাশয় গান শুনিতে থাকিয়া উত্তর করিলেন, – বলিলাম ত, এই সব ফক্কুঝামেলায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, আমরা বেড়াইতে আসিয়াছি, আমরা খামখা পাদরীগিরির জন্ত বরাত লইয়া আসি নাই, অতশত হুজ্জুতে কোন কাজ নাই, আজ হিস্ করিতেছে, সেদিন পদাঘাত করিল, উহাকে এই মুহূর্ত্তে এক কাপড়ে পাখীশুদ্ধ বিদায় কর, পাপ! তাড়াইয়া দাও হারামজাদাকে। মনিব মহাশয়া বিব্রতচিত্ত মর্ম্মাহত হইয়া কর্ণে যেমন অঙ্গুলি প্রদানে প্রায় উদ্যত হইতে চাহিলেন, একদা তাহার খাঁচার প্রতি নজর গেল যাহা তিনি সাজাইতে সাহায্য করিয়াছেন, ইনি শিহরিত, 'নারায়ণ নারায়ণ' এবং 'তারা ব্রাহ্মময়ী মাগো' বলিয়া 'আনন্দময়ী মাগো' বলিয়া আনন্দময়ী ৺শ্রীশ্রীমায়ের চরণ স্মরণে স্বামীর জন্ত ক্ষমা চাহিয়া অত্রাহি হইয়া কহিলেন, – ছি ছি তোমার কি জ্ঞানগম্য হবে না কোনদিন, মাঠাকরুন কি ভাববেন! বকতে বললুম বলে ঐ সব অলুক্ষুনে কথা, তোমায় বলতে যাওয়াই আমারই ঝক্মারি হয়েছে···সাত সকালা এত বড় কথাটা কি করে তুমি মুখে তুললে; ছোঁড়া নয় তুলই···। যে এবং ঠিক এমত সময়ে তাঁহার কথার মধ্যে তিতিরটি মনিব পত্নীর পায়ের নিকট আসিয়া নখে ঠোকা মারিল, ইনি যন্ত্রচালিতের ন্যায় হস্তধৃত ময়দাপিণ্ড হইতে, কিঞ্চিৎ লইয়া তাহারে দিয়া সুঘরাই উদ্দেশে ইহা বলিয়াছিলেন, – আঃ মরণ দশা! তুই অমনতারা হাঁ করে মূর্ত্তিমান পাপের মত দাঁইড়ে রইলি যে, নে নে ঝটপট ঝাঁট দিয়ে, এরে, পাখীরে খাবার দিগে, ছাকদিকিন্ কি খিদেটাই পেয়েছে···এবং পাখীটিকে আপন সম্বোধনে কহিলেন 'আহা খিদে পেয়েছে তোমার বেচারী!' – এই সোহাগ বাক্যে পাখীটি আশ্চর্য্য যে, অদ্ভুতভাবে যে, মুখখানি তুলিয়াছিল।

বটেই উহাতে, ঐ হিস্-ধ্বনিতে, ভক্তিমতী মমতাময়ী সেই রমণী যারপরনাই ভীতা হইয়া থাকেন; যে কিন্তু অন্তপক্ষে, সুঘরাই যদ্যপি এই তীব্র বন্দুনিতে ভারী অবুঝবু, কিন্তু সে এ পর্য্যন্তও তাহার মুখে নীচজাতিসুলভ বাঁদুরে হাসি বিদ্যমান রহে, তত্রাচ এক সুদারুণ আত্মশ্লাঘা তদীয় সুন্দর নিটোল ললাটে প্রতিভাত, যাহা যেমন যে, এই পক্ষী হয় আমার, উহার যে পালক সকল অদ্যাবধি হাওয়াতে উড়িয়া গিয়াছে তাহাও, তাহাও; উহার হাঁটা চলা ঠোকরান ডাক্, উহার দুর্গতি, উহার কম্পন, উহার চাঁদ সর্ব্বের কিছুই আমার, উহাতে অভ্রান্তই মদীয় প্রভুতা থাকে।

ও তৎপ্রভাবিত সুঘরাই আপনার প্রাণ অপেক্ষা বুকের পাখীকে মহা হেদাইয়া তির্য্যকে লক্ষ্য করে করিতেই, তন্মুহূর্ত্তেই ঐ ভ্রমর অদৃশ্য হইল তৎপরিবর্ত্তে পৃথম্বিধ এক গম্ভীর চমক তাহার ভ্রূযুগে বর্ত্তাইয়াছে, তাহাতে ক্ষণেকই সে কুহকান্বিত হইলেক, ও ঝটিতি পুনরপি সর্পহিস্ দিতে সে অধীর হইয়া থাকে ; এই কারণেই যে, তৎকৃত ভুজঙ্গশব্দের ফলে অদৃষ্টপূর্ব্ব এক দুর্দ্ধর্ষ ঘটনা ঐ পক্ষীতে, নিরীহতা মধ্যে, উদ্ঘাটিত তদ্দ্বারা আবিষ্কৃত হইল ; আর যাহা সাক্ষাতেই তাহাতে ভাব লাগিয়াছিল, যে সে, সুঘরাই, অবিনাশী গোপনতা সেইক্ষণে নেহারিয়াছে, ইহাতে সে নির্ঘাত ডোমপুত্র নহে ; যে ঐ শব্দে যুগপৎ পাখীটিতে কীদৃশী মনোরমত্ব উজাগর ! কি এত অবার্থ অভয়, কি গৌরব, কি এক পেশী, ঝামরাইয়া তখনই উঠিল, ইহা যাহা অপরিসীম দিব্য ইহা যাহা খাসা, কি ঘটা ! সেই মুহূর্ত্তে ঐ কাল সদৃশ ঘোর হিস্ আওয়াজে তিতিরটি চমকে উৎকর্ণ সচকিত, কি যেমন তাহাতে ! মাল্য মৃত্তিকা কুসুমাদি পতঙ্গ ঘুড়িয়া তুমুল প্রকট হইল, করতাল ঝাঁজিয়া উঠিল ; সুঘরাই যেমন বনমধ্যে। আ পক্ষীর গ্রীবা কৌস্তভ মণিময়, অথও তেজে দীপ্ত দৃপ্ত সটান ! অগ্নি শীর্ষস্থতা !

এরূপ দেখা, এই দেখার জন্য আত্মপ্রত্যয়, সুঘরাইকে ঐ দিবস বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীযুক্ত, প্রজ্বলিত রাখে ; অনেকবারই সে সগর্ব্বে পাখীটিরে কিয়ৎদূর হইতে অবলোকন করিয়াছে আর তখনই সেই শীর্ষটান ঐ লতের গ্রীবার, কোন প্রহেলিকার কম্পন তির্য্যক গতি ঝটিতি নিরেট সোজা উহাতে যাহা তাহাকে নির্ভীক করে, সেও অজ্ঞাতে উহা রপ্ত করিতে অধ্যবসায়ী যে এবং এই প্রথম, ডোম জীবনে যে এতাবৎ ভীত, সে জিজ্ঞাসু হয়। তন্নিষ্ঠ যখন সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে, তৎক্ষণেই যে সে এক অনৈসর্গিক বিকট, ইহা প্রেততাড়িত-র অধিক, ভয়ে সে চেতনা-বিনা ; ইহার মধ্যে কি যেন মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল ; আবার গর্ব্বে সে ডোম ! অবশ্য ঐ দিন পুনর্ব্বার ঐ কাণ্ডের জন্যই বড়ই অবাঙ্মুখ তাহারে হইতে হইয়াছিল ; যখন সে হিরণার টিলায়।

আমরা জানি সকালে বিকালে সাঁওতাল পরগণা, তথা জঙ্গল মহলের প্রায় স্থান, বিশেষত রিখিয়া অভাবনীয় রূপ ধারণ করে—ইহার যে কোন স্থানে দাঁড়াইলেই, এই বিশ্বাস হইবেই, যে মানুষের বড় কাছে দূরত্ব, তাই সকালে এখানে রেখাব খেলিয়া উঠে, কেন না অমরতার দেখা দিবে, সন্ধ্যায় শুদ্ধ ষড়জ জাগর হয় কেন না অমরতা এখনই আসিবে ; শুকতারা আশ্চর্য্য হরিণ ; আকাশে চির ব্রাহ্মণ্য, মৃত্তিকা উৎসবময়ী ফোয়ারা ; এমনই বৈচিত্র্যের মধ্যে সকলেই ভ্রমণে বাহির হয়, বস্তু সমুদয় অবাক মুহূর্ত্ত হইয়া উঠিতে থাকে, ভ্রমণ-কারীরা তাহার সহিত করমর্দ্দন করে। সুঘরাইও মনিব মহাশয়েদের সহিত রিখিয়ার হাট পার হওয়ত উত্তরে হিরণার টিলায়, এখানে হাওয়া বড় বেশী, এখানে মনিবরা আঃ বলিয়া উঠিলেন, মনিব মহাশয় তাঁহার পাইপে মিকসচার

ভরিতে থাকিয়া কহিলেন – দেখ, ফাঁকা কথাটি এই স্থান সম্পর্কে যথার্থ নহে, ইহা আরও কিছু. কোন স্রোত এখানে নাই ফুল নাই – এখানে আমরা আবার নূতন – স্লেট আমাদের পরিষ্কার। এ স্থান এমনি যে, যে এই হিরণার টিলা এমনি যে ইহার জন্য সহজেই তোমার শয্যা ত্যাগ করিতে পারি –

মনিব পত্নী ঐ বাক্যের প্রতি কোনমতে চাহিলেন – উহা কঠিন উহা আমোদের ! – এই জন্য কোনমতে যে, ইদানীং তিনি কচিৎ নীল পালকের হাওয়াতে ভর করত নামিয়া আসা দেখিতে আছিলেন, তাই চক্ষুযুগতে, যাহা পান ও গুবাককে সংজ্ঞাতে পরিণত করিয়াছে, মৎস্যকুমারীর গন্ধর সংযম থাকে এবং ইনি উৎসাহিত ছিলেন, যে, কে জানিত ঐ পালকে মদীয় নির্ভরতা থাকিবে ! আর যে সেই আশ্বাসে ভ্রূদ্বয় সটান, এখন কহিলেন আহা বেচারী দেখ দেখ পালকটা, কি সুন্দোর ! ইহা প্রকাশিতে তাঁহার দেহলতা এরূপ কম্পিত তিনি যেমন বলিয়াছেন – এমন একটি নীল আসন হয়···যাহাতে বসিয়া ৺শ্রীশ্রীমা জননীকে ডাকি (সীতা স্বভাবত এইরূপ বলিয়াছিলেন) ; অথবা এখন সন্ধ্যা হইবে, শঙ্খ বাজিবে তাই।

স্বামীর কথা তাঁহার কানে ছিল, উত্তর করিলেন, ব্রাকেটে উচ্চৈঃস্বরে (!) হাস্যধ্বনি ! এবং বুঝলুম ম'পাইয়ের আমার উবরি মমতা অঢেল ! এখন এই নীল পালকটার জন্যেই আমার মনে হচ্ছে···এ জায়গাটা বড় আত্মীয় সমান !

এমত সময় একদল সাঁওতাল সারিবদ্ধভাবে ঐ টিলা অতিক্রম করিতে ক্রমে উঠিল, তাহারা নির্জ্জন প্রবাহ, তাহারা অদ্ভুত পায়ে চলিতেছে, তাহারা তাঁহাদের ইতিমধ্য দিয়া যায়, ইহাতে এক আজব আড়াল সৃজিত হইল, সম্ভবত এই ক্ষণিক বিচ্ছেদ-হওয়ার জন্য ভবিষ্যতে কখনও তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইবেন। এখন সাঁওতাল দল তাঁহাদের দুজনকে দুজনের স্পষ্ট করিতেই দুজনেই চমৎকার ভাবে হাসিয়াছিলেন, চেনা-মানুষকে দেখার হাসি যাহা ! এবং ইহার অবিলম্বেই, খানিক ইহাতে সলজ্জ মনিব পত্নী স্বভাবতই সুঘরাইএর কারণে এখানে সেখানে দৃষ্টিপাত করিলেন ; দেখিলেন সাঁওতাল দলের লাইন এবার বাঁকিয়াছিল ; এবং শনৈঃ সানোয়ার পথে নামিতেই খাঁচা-হাতে সুঘরাই প্রতি-বিম্বিত হইল, ইহা এক দৃশ্য বটে !

মনিব পত্নী তাহারে দেখিয়া বিস্ময়ে কহিলেন, ও মা তুই ওখানে, আমরা ভেবে মরি !···দেখ দেখ ছোঁড়ী যেন সদ্য জঙ্গল ! সুঘরাই তখনও সেইভাবে আছে, তাহাতে মনিব পত্নীর সাধ হইয়াছিল, চেঞ্জারদের মত বলিয়া উঠিবেন, কি গ্র্যাণ্ড দেখাচ্ছে না ! কিন্তু ইহাতে, ঘরিতে আগাইয়া-র (গ্রাম)···বাবুর বাড়ী আগত মোক্ষদা ঘোষালের গিন্নীর কণ্ঠস্বর জিহ্বায় থমকাইল, যাহা মনিব পত্নী শুনিয়াছিলেন। নিজ বাড়ীর উঠান হইতে মোক্ষদাবাবু, ইনি সদাশিব, ইহার

বক্ষঃদেশে নখর দাগ, হাতে একটি নস্য-মলিন ন্যাকড়া, ডাকিলেন,···চাঁপার মা শুনিতেছ! বলি ও গো শীঘ্রই আইস একবার। চাঁপার মা অর্থাৎ ঘোষাল গিন্নীকে মনিব পত্নীর সহিত গল্প থামাইয়া, যাই ভাই একটু ঝাঁকি দর্শন দিয়া আসি, বলিলেন। এসময় পুনরায় মোক্ষদাবাবুর কণ্ঠ পুনরপি ধ্বনিত হইল, উঁহারেও লইয়া আইস···। ইঁহারা দুইজনে উঠানে যাইতেই, মোক্ষদাবাবু ধ্যানঘন আবেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ব্যক্ত করিলেন, দেখ দেখ কি গ্রাও! এবং তাঁহারা দেখিলেন মাকড়সার জালে জল-বিন্দু! ইহা দেখিতে ঘোষাল গিন্নীর আশ্চর্য্য যে ঘোমটা স্খলিত ছিল, তাঁহার কণ্ঠলগ্ন দশ ভরির পাটি-হার কিছু অস্থায়ী, এই পাটি-হার এখনও পাটি-হার! ঘোষাল গিন্নী বলিয়াছিলেন, লোকে আমায় কত বলিয়া থাকে, ভাঙ্গিয়া অন্য কিছু গড়াও না কেন, কত নূতন প্যাটার্ন হইয়াছে,—আমি বলি সখের মুখে ছাই! এক পাটার্ন করিলেই তখন প্যাটার্ন প্যাটার্ন বাই হইবে···ন্যাকরা পোড়ারমুখোদিগের গহ্বর ভরাইতে ত জন্মি নাই···এখনও দুইটি মেয়ে পার করিতে বাকি। এখন ঘোষাল গিন্নীর স্বর সবিশেষ আদ্রুত, যেমন বা ফোক্‌লা, তদীয় মাড়ির আড়া দেখা যায়, জালস্থিত জল-বিন্দু প্রত্যক্ষে কহিলেন,···মাইরী কি গ্রাও না ভাই! উপস্থিত মনিব পত্নী সমক্ষে সুঘরাই বিষয়ে, ঐ রূপ 'গ্র্যাও' উক্তিটি বাধা দিল, নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন, সুঘরাইএর ক্ষেত্রে মহা বিশ্রী শুনাইবে। ইত্যাকারে তিনি আপন স্বরগ্রাম তুলিয়াছিলেন। কেন না স্বামী বলিয়াছিলেন, গ্র্যাও গ্র্যাও ড্যানচিবাবুরা এমতভাবেই বলে, বেচারীরা বলে যাহাতে মনে হয়, সৌন্দর্য্য কুৎসিতের পারভি মাত্র, অদ্ভুত না?

অথচ তিনি এখনও সেই পালকে-নির্ভরতা বৃত্তিতে ছেলে মানুষটিতে মনো-সংযোগ করিয়াছিলেন, এখন সুঘরাই বিশদ, যে বহুদূরস্থিত অভিমানী ত্রিকূট নিঃসঙ্কোচে উহার কাছেতে আসিয়াছে, যে বহুদূর হইতে বন সমারোহ—তাহাও, যে ধান ক্ষেতের ঝরণার শুধু মৃদু-শব্দ-গান—ইহাও, যে এবং খাঁচা হস্তে বালকের পশ্চাতে অনেক অনেক লাল পথ সকল ছুটাছুটি করিতে আছে! আরও যে, দেখা যায়, যে এই সময়েতে সুঘরাই আপন জিহ্বা দ্বারা ছোট করিয়া আর লেহন করে। স্রোত উহার বাল্যকাল, ঘড়ঋতু উহার ভবিতব্য! যে এবং ঈদৃশ জ্ঞানে এমনও যে মনিব পত্নী নীল পালকটি তুলিয়াছিলেন কেননা বিশ্বাস এখন হইয়াছিল যে সে বালক নিঃশঙ্কচিত্তে প্রদীপ জ্বালাইতে ও নিভাইতে পারে।

নিরহঙ্কার মনিব মহাশয় পাইপে মৃদু টান দিতে থাকিয়া, সহধর্ম্মিণীর উচ্ছ্বাস-হেতু সপ্রশংস প্রবণতাযে আপনকার প্রিয় ভৃত্যের প্রতি নজরেতেই, কোন এক মূর্ত্তির-লিপির এইটুক তাঁহাতে ঝটিতি খেলিয়াছিল, অভিনবতম ব্রতকথার উদ্দীপনা দেখিয়াছিলেন, যাহার উপচার ঐ পর্ব্বতশীর্ষের বৃক্ষপত্র, কেননা সেখানেই প্রথম বৃষ্টি হয়, কেননা সেখানেই প্রথম দিন দেখা দেয়। এই ভাঙা পদটুকু বড় আপনার যে ইহা বড় বৈদিক! আর সম্মুখে সুঘরাই, যে আর তাঁহার

চক্ষুদ্বয় ছোট হইল এবং যে তিনি খুসী সহকারে দমকা-উচ্ছল হইলেন,···হা ! লাল্‌লা সন আফ এ বিচ, হারামজাদাকে সত্যি চমৎকার স্পেলইনডি দেখাইতেছে··· মিসিং লিঙ্ক ! মিসিং···

মিমি-সিং লিঙ্ক !···ও হ্যাঁ হ্যাঁ কৈ ? – বলিয়া মনিব পত্নী ঐ সূত্রে সুঘরাইকে নূতন করিয়া বুঝিতে উদ্যোগী, তাঁহাতে অপ্রাপ্তির অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হইল : উহার পশ্চাতে কোথাও গেরি, কোথাও হরিৎ, কোথাও বা কমলা রঙ, কোথাও বা চলমান-রঙ অর্থাৎ যাহারা ভ্রমণ করে ইহা তাহাদেরই বস্ত্র ছটা.! এবং ঐ সকল রঙ প্রভাবে বিচরণের কালো মহিষগুলিও রঙীন ; যে আর যাহাদের ইতঃমধ্যে তীক্ষ্ণ তছনছে হাওয়া – ইহাতে এহেন ছবিতে, তাঁহার বাম আঁখি স্পন্দিত হইল, ক্রমে ইতঃপূর্ব্বকার উপলব্ধি হইতে তিনি কোথায় যেন বা : বনরাজি যেন সুঘরাইএর গা শুঁকিতেছে ; তিনি কিয়ৎ অপ্রতিভ যে স্বামীর সংজ্ঞা বোধগম্য হয় নাই, ও বিনীতভাবে প্রকাশিলেন,···সে কি গো আমি ত ছোঁড়াতে শুধু অন্ধকার দেখছি ! এই অন্ধকার কথাতে তিনি নিজে যেন সত্যযুগে, ক্লাসিক পর্য্যায়ে চলিয়া গিয়াছেন।

আ ! যথার্থ ধরিয়াছ, উহাই ত মিসিং লিঙ্ক···

ইহাতে এখন সত্যই মনিব পত্নী বহুদূর নিঃশব্দতায়ে অন্তর্হিত হইয়া থাকেন, যে তথাপি স্বামীর উচ্চারণের রকমে, যে স্পষ্টতই স্বভাবতই অনুধাবন করিলেন, যে ইহা তাহা, যে তাঁহাতে মনিব মহাশয়ের চোখে, মিসিং লিঙ্ক প্রাপ্তির কোনই আত্মম্ভরি উদ্বেলতা আহ্লাদ আদৌ ছিল না, বরং তাঁহার চক্ষুদ্বয় যেমন বা কোন দিব্য বিগ্রহে আকৃষ্ট ; ও এ কারণেই তাঁহার পানে মনিব পত্নী এমত নিরীক্ষণ-রত, যে যাহাতে, যেন ইনি উঁহারে বুঝিয়া লইতে চাহিয়া ইহাই যেন বলিয়া চলিয়াছেন যে যথা : সেদিন এই হিরণার টিলায় – এখানে উড়িতে থাকা কতক কাগজ-টুকরা প্রত্যক্ষে তুমি থমকাইলে চমকিলে, তুমি ত্রোভ্যুক্ত হও, তুমি আতঙ্কিত। ক্রমে তোমার নিরীহ ওষ্ঠ সংপুট স্ফীত হইল, যে এতই যে তুমি যেমন দারুণ হুঙ্কারে প্রতিবাদে দিকচরাচরে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়াছিলে, দূর হইতে জেব্রীল পক্ষী তোমার রোষযুক্ত ভাব অনুমানে আমাদের মাথার উপরকার আকাশ অতিক্রম করে না, একমাত্র টিলার যে দেবতা – টিলার অন্তর আত্মা যিনি, তোমার ঐ বৈগুণ্যে নির্ঘাত হর্ষযুক্ত হইয়াছিলেন।···

ততঃ অচিরাৎ তুমি বিপুলতর দাপটে নির্ঘোষিলে,···এখানেও কাগজ ! তোমার বাচনভঙ্গিতে চমক আয়রনি ছিল, অথচ তুমি শান্ত, অথচ তুমি নাটকীয় ভাবে দাঁড়াইলে, শিশিরবাবু যেমন ফুটলাইটের সমক্ষে, ফলে তোমাকেই তুমি, তোমার ঐ বাচনভাবকে তুমি নির্বাক করিলে, তোমার সবকিছুতে কেমন এক দুর্ব্বার খানখেয়ালী-ফের, কিয়দংশে মজার মনে হইলেও, আমি উদ্বিগ্ন, আমি ধন্দে আছি, যে তোমার মনুষ্যজাত দর্পী জিহ্বায় ঈদৃশ হাহন্ত বলিয়া উঠিল,

যে, এই মহাস্থানের কুমারীত্ব বিনষ্ট হইয়াছে, যে ইহার, এই টিলার পুণ্য যা কিছু ইহার গৌরীত্বের অহঙ্কার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

যে আমারে উদ্দেশ করত ইহাই ইঙ্গিত করিলে এবং, যে, হায় তুমি না একদা কামনা করিয়াছিলে—যে এরূপ মহিমার কৃষ্ণপৃষ্ঠ জমি কি শান্তাস্পদ! কি তদ্ধতা!—এখানে এক সুবিশাল নয়নসুখ নবরত্ন মন্দির উৎসর্গ করিব—অবশ্য যদি এমন সুকৃতি থাকে, অবশ্য যদি আদিষ্ট হই কখনও কখনও, এখানে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির স্থাপন করিব! ইহা অপার্থীয় হইয়াছে, এই টিলারে কেহ আর নালিশ জানাইবে না, সাক্ষী মানিবে না···অত্যাশ্চর্য্য যে কেবলমাত্র কাগজটুকুরা দর্শনেই তুমি এবম্ভূত মতিচ্ছন্নই!

তোমার সেই অপ্রাকৃতিক বিলাপ বচনে আমি অর্ধে-তে, আমাতে যারপরনাই এক পরমাশ্চর্য্য ভীতি সঞ্চারিত হয়! যে আর তোমার ঐ দুঃখদশা আমারে বিষণ্ণ মুহ্যমান করিলেক। জানি তুমি ধার্ম্মিক, তুমি অতীব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, তুমি অভিমানী, কত কত তুচ্ছ তোমারে হিম করে,···সেই যে সেই মনে পড়ে···সুন্দর মহিমাময় গম্ভীর গভীর খদির বৃক্ষ পূর্ণ আইবুড়া কুক্কুটিকাময়ী জঙ্গলে, যেখানে পোচকের আওয়াজে শিকড়গুলি ভয়ঙ্কর, যেখানেতে লতাগুল্মে প্রায়ই হরিণের শিং আটকাইয়া যায়, এহেন সংস্থানে তথায়ে অনেক লজ্জাবতী ও বিবিধ ভূমি গুল্মের কাছেতে সমক্ষে, এক টুকরা দৈনিক টাইমস কাগজ, সিভার্সের মারমালেড-জার ও সাদা-পিগ্ মুদ্রিত টিন ও IXL এপরিকট জামের টিন দর্শনে তুমি কি পরিমাণ গ্রাম্য, তুমি নিশ্চিহ্ন, তুমি মর্ম্মপীড়িত ম্রিয়মাণ হইয়াছিলে, তুমি তদানীন্তন কালে এক মৌমাছি যাহা ঐ বিকট (!) সংস্থানে পরিক্রমণরত, তাহারে তুমি নির্ব্বোধ বলিলে, তুমি বীভৎস দুষমনী দেখিয়াছিলে—তুমি ধার্ম্মিক যেহেতু—অথচ মজার কথা এই হয় যে, তোমার তাঁবুতে ঐরূপ আধারের দোকান সাজান! হায় সেই দিন তুমি ও তোমার প্রিয় বন্ধুদ্বয় জোসেফ কিরণ চৌধুরী ও ভবানী. সি. বাসু) হরিণের পশ্চাদ্ধাবন হইতে পর্য্যন্ত বিরত হইলে—সূক্ষ্ম তত্ত্বে তুমি বাণবিদ্ধ, যে তুমি ভক্তিযুক্তমনে চরণামৃত পান কর সেই তুমি···তোমাকে যখন যখন মনে পড়ে আমি কীদৃশী অচিন বালিকা!

ঐ সকল কাগজের টুকরা সকল তখনও উড়িতে আছে—আঃ ক্ষণজীবী পতঙ্গ সকল! তুমি সুঘরাইকে একটুকরা কুড়াইতে নির্দ্দেশ দিলে, টুকরা আনীত হইল—তাজ্জব, তুমি আজন্ম সংস্কার ভুলিলে, তুমি কি নেটিভ!—আনীত টুকরা পাঠে তুমি অতিমাত্রায়ে বিক্ষুব্ধ, কি এক বেদনা তোমাতে স্ফুটমান হইতে চাহিল, তোমাতে বাক্য বৈখরী হইল, কিন্তু ঝাপটা হাওয়াতে উহা গোঙানির ন্যায় বুঝায়। তোমার আদেশে তোমার প্রিয় ভৃত্য টুকরা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল, এই স্থান বৃহৎ হইল, যে অন্তপক্ষে আমি স্ত্রীলোক মাত্র—সতত পৃথিবীরে দোষারোপ করিতে ইতস্তত থাকি, অবশ্য আমি মদীয় গণ্ডদেশে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়াও

করি না, যে এবং তোমার পাইপ সত্ত্বেও আমি বিব্রত নহি, তোমারে আমি নেটিভ বলি নাই, তুমি শুধু তোমার পাইপের হস্তীদন্ত শ্বেত বিন্দু নিষ্পলকে দেখি ; যে সেই বালক ইতঃমধ্যে মহাউৎসাহে ছুটিয়া ছুটিয়া কাগজ সকল কুড়াইতে আছে, এ দৃশ্য ভয়ঙ্কর, ঐ দৃশ্য বিশ্রী যে তাহার আদরের তিতির পাখীটি এখন খাঁচা ছাড়া মহা আমোদে তাহাকে অনুসরণ করে কচিৎ কখনও বা উড়িয়া, এ দৃশ্য দারুণ খেলা।

…যে তুমি দুচারখানি টুকরা পাঠে ইহাই পড়িলে, লভ লেটাঃ! আশ্চর্য্য ঐ কথার কোন প্রতিধ্বনি ছিল না। মেঘ সকল নিঃশঙ্কচিত্ত ছিল, এবার তুমি যখন অস্পষ্টভাবে উচ্চারিলে 'লাভ লেটাঃ' কিছু প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়, যেই না তুমি নিরীহ শিশুকণ্ঠে ঘোষিলে 'লাভ লেটাঃ'! এইবার দিকে দিকে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল। শিশুস্বর নিবন্ধন উহাতে শ্লেষ ছিল নাই। আশ্চর্য্য মেঘ অপসারিত হইল, আমরা দুইজনে দূরে দূরে অজানিতেই অসহায়ভাবে নয়ন ফিরাইলাম, আমরা (?) বহুদূরাগত গন্ধসমূহ পাইলাম, যে এবং দুর্জ্জয় অপরিমেয় অতুলনীয় ঘ্রাণশক্তি ক্রমে বহু যুগের অতীতের স্বর শুনিলাম! এক প্রমত্ত জোলন কাব্যবীজ! দুস্তর গোপনতা ভাঙ্গিয়া যাহা আসিতে আছে।

অতঃপর তুমি টিলার দিকে পুনর্ব্বার অবলোকন কর, তুমি সম্বলহীন আদৃত ভাবে এখানে সেখানের পারিপার্শ্বিকতার কত গাছ, কত লতা, ধূলা উড়া হৃদয়ঙ্গম করিলে…যে ও তুমি কেমন যেমন ব্যর্থতায়, ইহাতে যে আমি মা জননীকে স্মরণ করিতেছিলাম। তুমি মথ্-এর তুল্য নির্ব্বিকার, দারুভূত! তৎকালে সেই বালক কখনও কখনও তাৎপর্য্যপূর্ণ জিগীর দিতে থমকায়, কখনও আপনারে ধিক্কার দিতে আছে, কখনও বা হঠাৎ উৎফুল্ল, এই যে আর এক খণ্ড আর এক খণ্ড! পুনরপি আর এক খোঁজ তোমার ঘ্রাণশক্তি, যাহা মানুষে কথঞ্চিৎ, তাহাই ক্রমবর্দ্ধমান।

আবার পরিলক্ষিত হয়, বালকের ছোট হাতখানি – সে নিজ ঢালু নিম্নে থাকার কারণে – এখন ওতপ্রোত এই বিরাট নশ্বরতার মধ্যে ফাঁকার মধ্যে উচ্চাইয়া উজাইয়া উঠে। তিলেক বাদেই সে ছুটিয়া আসে, যেমন তদীয় পক্ষী যেমন পোকা ঠোঁটে দৌড়ায় – ভারী সাদা সাঁওতাল গীতের লাইনের ব্যঞ্জনা যেমতবা।

আর যে তুমি ঐ সকল সংগৃহীত টুকরা সুদক্ষ প্রতিভাধর মণিকারের ন্যায় পরীর গল্প রচয়িতার প্রায় বিচক্ষণতায়ে কাজল-টানার যতনে, সাজাইতে বসিলে প্রত্যেক খণ্ডে মুড়ি চাপা দিলে, এবার তুমি অধিকতর চাতুর্য্যে নির্ম্মাণ করিতে লাগিলে ইত্যাকারে যে,…চিঠি সুবাসিত! সম্ভবত খোঁপায় উহ তৈল চিহ্ন নাই ব্লাউজের অন্তরে…বুকের ঘামে অক্ষর তাই নির্ঘাত আর্দ্র-হওয়ত ছাৎরা…মানে কিছুক্ষণ আগেই অর্থাৎ সদ্য ছেঁড়া…এই চিঠি প্রথম না, কিছু উত্তরের পর… পুরুষের হস্তাক্ষর। পুরুষেরই…ওঁ! প্লেটনিক…ফ্যা…ব্রাউন নিশ্চয় ক্যানী হইতেই

হইবে···কলেজের কোন ছোকরা···বেশ কথা ভালবাসিতে চাহিতেছে আর মেয়েটি বোধ হয় লিখিয়াছিল···বিবাহিতা? হয়ত না! শেলীয়ান হাইটের তোড়···চমৎকার পেগানাইজ!

—যে এবং এই পর্য্যন্ত বলিয়া তুমি আমার প্রতি নেত্রপাত করিলে, আমি অসহিষ্ণু হইলেও তোমার বাঁকলনে খুসী, অবশ্য হোমস-স্মরণে সমগ্র ব্যাপার শুদ্ধ করিয়া লহে—বরঞ্চ তোমার এতাদৃশ বৈচিত্র্য আমার এমনিতেই বেশ লাগিতেছিল—নিশ্চয়ই আমিও কোন ঘোরে! এখন তুমি স্নায়ু-বিধ্বস্ত কেন না চিঠির মধ্যে ফাঁকা—খানিক স্থান টুকরাবিহীন—সেখানে টিলার জমি গর্জ্জন করিতেছিল, পোকা, ঘাস, ফুল উদ্ধৃত, এই ফাঁক নিরখিয়া তুমি জড়, খ, তুমি আধ্যাত্মিক! যে ঝটিতি ব্যক্ত করিলে, আঃ নিষ্ঠুরতা! পত্রলেখক এক বীভৎস নিষ্ঠুরতা প্রত্যাশী হস্তে নিষ্ঠুরতা তাহার স্বর্গ—ইহার পর তুমি প্রচণ্ড প্রসারিত রিখিয়ার সভ্যতার দিকে ব্যগ্রতায় তাকাইলে 'আঃ রিখিয়া' তুমি মহাশক্তিতে শ্বাস গ্রহণ করিলে যাহাতে বহুদূরস্থিত বৃক্ষলগ্ন পরগাছা চমকিত হইল।

শনৈঃ যে আরও যোগ দিয়াছিলে···মনে কর পেগানাইজেশনের তোড়ে দুজনে দুই জনকে একে অন্যরে কীদৃশী ভয় পাইতে চাহে সমস্ত অস্তিত্বকে!—আর আমারে জিজ্ঞাসিলে, না না আমার সায় প্রত্যাশায়ে কহিলে,···কেন মানুষ এতেক নিষ্ঠুরতা চাহে···নিষ্ঠুরতাই কি প্রেমের মৃত্তিকা···অনৈসর্গিক মরালিটি···ফুলের ঘায়ে যে মূর্চ্ছিত এখন সে দলিত হইতে প্রস্তুত!—এবং ঐ সময় সুখরাইএর পক্ষীটি তোমার সাজানর নিকটে, পাছে উহা ভাঙে তাই তুমি তাহারে হেই বলিয়া তাড়া দিয়া আরবার মন্তব্য করিলে যে,···অবশ্য ইহাতে আমি মনস্তত্ত্বর যুক্তি বলি নাই।

—তোমার উক্ত আলাপ আমার নিকট ঝাপসা অবশ্য আমি হেঁয়ালী নামে উহা সকল দূরে ঠেলি নাই—যেহেতু আমি সন্ধ্যাকালীন শঙ্খের আওয়াজে অন্য-মনস্কা, অবশ্য তোমার ঐ শেষোক্তিটিতে আমার বারম্বার মনে হইতেছিল যে তুমি শঙ্কা হইতেছিল যে তুমি এখনই ললাটাঘাত বিষণ্ণতায় বলিবে আঃ মনুষ্য-জাতি। অবশ্যই নিরাশার যে উহা, অবশ্য বাবার গলার স্বর ঐ ব্যঞ্জনায় নাই, তবু বাবার মতই মনিব পত্নীর শ্বশুর বলিয়া উঠিবে আঃ মনুষ্য জাতি!

আঃ বাবার হাতে কি অমোঘ পরমাণু! তাহার হাত ট্যালকের গুঁড়ায় কি অদ্ভুত অশরীরী—কি সাদা! হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস হাতে খোলামকুচি! হাঁ হাঁ মনে পড়ে বাবা একবার বলিয়াছিলেন, অসট্রাকন! এক টুকুরো খোলামকুচিতে কি বিদ্বেষ, কি অট্টাহাস্য, সঞ্চিত ক্ষোভ।···আবার একটুকরাতে কি হদিশ, এমন একরেখা মোটিফ, এমন এক নিরবচ্ছিন্নতা···মিসিং লিঙ্ক! আর মনুষ্য জাতি!—ইহা বলিতে থাকিয়া বাবার চক্ষুদ্বয় আশায় বিস্ফারিত, আর তুমি আর এক, সেদিন তদ্রূপ উপলব্ধিতে আমি যথার্থই অশান্তিতে ছিলাম, আবার ইহাও যে,

সন্দেহ হইতেছিল যে তুমি রহস্যপ্রিয় যে কোন মুহূর্তেই চমক দিয়া হা-হা হাসিতে আমাকে অপ্রতিভ আমার রমণী স্বভাবকে অপদস্থ করিতে পার!—এখন আজ উপস্থিত আপনার স্বামীকে সম্যক বুঝিবার চেষ্টা হইতে বিরত হওয়ত ইনি কপট বিরক্তি প্রকাশে তর্ক করিলেন,···আহা বল্‌লেই হ'ল কোঁথায় ঐ চোর চোর দেখতে ডোম ছোঁড়ার মধ্যে তোমার সেই যে বলছিল—এবং ইহার সহিত প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর ধারায় বলিলেন,···একশোর মধ্যে জিরো···যাও!

কিন্তু পরক্ষণেই মনিব পত্নী আত্মস্থ কেন না তাহাতে আভাসিত ইহা যে, সেই দিনকার সেই চিঠির টুকরার পাশে বসিয়া তাহার প্রেমাস্পদ স্বামী নিজ ভাবুকতার সূচনা করিয়াছিলেন যথা···ধর···অবশ্য বলা যায় কোন এক অলিখিত অপেরার মহতী দৃশ্য···হয়ত তোমার মনে হইবে বড় খুকু কল্পনা···তবু···একদল অঙ্গুলিনির্দ্দেশে খণ্ডিত পত্র সকল দেখাইল, তাহারা ক্রন্দিত নয়নে কুড়াইতে লাগিল, এই কুড়াইতে হাত বহুবার চম্‌কিয়াছে এক এক খণ্ড চমকপ্রদ মনোভাব প্রকাশিয়াছে, কখন বা মসৃণ হাতকে ভ্রমবশত, যে উহা পত্র-খণ্ড, কতবারই না একে অন্যের হাত কেহ ধরিয়া থাকে। খণ্ডিত পত্র সকল উড়িতেছে, দ্রুত পদ-ক্ষেপে তাহারা এখন তাহাদের বসন চেহারায় যেমন পাথর নির্ম্মিত, এইভাবে ক্রমে তাহাদের বসন পাংশু মলিন বর্ণ ধারণ করিল, তাহারা প্রেক্ষাগৃহের একুসটিক্‌সকে নূতন বর্ণাঢ্য সংজ্ঞা তথাপি দিল। তাহারা সংগৃহীত খণ্ডিত পত্র-গুলির চারি দিকে চক্রবৎ ঘুরিল, এবার তাহারা সজল নয়নে একক সুমহৎ বৃক্ষের সন্নিধানে গেল, ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লতা ছিন্ন করিল এবং লতা দিয়া পরম রমণীয় এক সাজি নির্ম্মাণ করিল—কি আজব! কি কুহক! বিজোড় না হইলে আধার অসম্ভব! তাহারা বেদনায় ঝঙ্কারিল, আমরা কোথাও বিজোড়, আমরা কোথাও বিজোড়! সাজিতে খণ্ডিত পত্রসকল রাখা হইল, এখন তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া চলিল, অন্ধকার হইল, তাহাদের হাতে মশাল, তাহারা চলিতেছে দিকাভিমানী দেবতা সকল মুগ্ধ প্রীত হইলেন, তুমুল বরষণ হইল, তাহাদের মশাল নিভিল না, তাহারা ধীরে প্লাস্‌টিক (মনুষ্য) অঙ্গের সীমা অতিক্রম করিল, সম্মুখে বনরাজি, ক্রন্দনই তাহাদের নির্ভীকতা, সম্মুখে বনরাজি। সেই বনস্থলী অলৌকিক, শিশুর হাততালি পুষ্প এখানে, অপেক্ষমানার নয়ন ফল। এবং তাহারা সেই বনে আনীত খণ্ডিত পত্রসকল ছড়াইয়া দিল, বারম্বার কহিল, এই পত্র যদি সত্যযুগের হয় তাহা হইলে শূন্য-স্থান ইহার পূর্ণ হউক! বনস্পতি নিশ্চয় শুনিলেন! নিথর বনভূমি! শুধু শ্রুত হইতেছিল সেই বনের পূর্ব্বাঞ্চলে কোন গৃহাভিমুখী কাঠুরিয়ার দল কোন গীতের এক ছত্রই—এখনও অন্তরায় বিবর্ত্তন হয় নাই—বার বার গাহিতেছে! সকলেই খণ্ডিত পত্র বাহকরা ভক্তিযুক্ত মনে দণ্ডায়মানা, আরক্তিম চোখে প্রতীক্ষায়, এমত কালে সম্মুখের কোপ জ্বলিয়া উঠিল।

···অনেকটা তেমনিভাবে···মনে পড়ে যেমন দাবদাহর সূত্রপাত আমরা সেই হাজারীবাগ অঞ্চলে জায়নোফর বনে দেখি, উঃ কি দারুণ নয় সেই গাইডটা, নির্জন বনের মধ্যে অদ্ভুতভাবে মুখে হাত দিয়া দারুণ প্রলুব্ধকারী ডাক দিতে থাকিয়া হঠাৎ তর্জনীসঙ্কেতে এক ঝোপ দর্শাইয়া ফিস্‌ফিস্ স্বরে জানাইল, খসখস ফট্! শব্দ! শিকার! আমিও শিকার ভাবিয়া বন্দুক তুলিলাম, পরক্ষণেই সেখানে ধিক ধিক অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, আশ্চর্য্য। ধূমহীন একেবারে···ক্রমাগতই শিখা, গাইড সেইভাবে তখনও তাহার চক্ষুদ্বয়ে ধন্ধ! আমি জলের বোতলের প্রতি নির্ব্বোধের ন্যায় তাকাইলাম, ইস্!··· তারপর সেইদিন তোপচাঁচির বাঙলায় আমরা মনমরা, আমরা অবসন্ন···ভাগ্যে সেখানে আশ্চর্য্য যে সার্ভিস সবই রূপার নির্ম্মিত। তুমি সন্দেহে হল-মার্ক দেখিলে, কহিলে নিশ্চয় মেপিন এণ্ড ওয়েব··· বেশ পুরাতন ও লেইট ভিক্টোরিয়ান।—আমরা সেই ওয়েজ দ'আর পাত্রে ভোজন করিলাম, এসপারাগ্যাস স্যুপ ভুলিবার নহে, আমরা অনেক অনেক বাড়ী বাসনপত্রের গল্প করিতেছিলাম, তাহার পর, তাহার, পর···হ্যাঁ ওইসটার না কি একটা খাইবার সময়···আমি মস্ত হা করি, না না বিশ্রীভাবে চিবাইতে দাঁত দেখা যাইতেছিল, তুমি আমারে অবাক হইয়া সাবধান কর, কাঁটা ছুরির অস্ত্রস্র শব্দ করিয়া থাকি, তুমি অবাক হইয়া আমায় সাবধান কর। কেন না, উহা ত ঘটিবার নহে।···ওয়েজে দ'আর-এ আমরা কি সেই দাবদাহ সূত্রপাত ভুলিয়াছিলাম? ···কিন্তু দেখ ভুলি নাই···।

ঠিক তেমনই ঐ বনের ঝোপ জ্বলিয়া উঠিল। যাহারা খণ্ডিত পত্র লইয়া আসিয়াছে তাহারা তৎপ্রবর্ত্তিত নতজানু হইল।

প্রজ্বলিত ঝোপ হইতে এক কিশোর সুন্দর বনদেবতা দেখিতে সুঘরাই-এর মত এক অভিনব চমৎকার ফড়িং দর্শাইয়া কহিলেন—ইহা কি সেই?

তাহারা সভয়ে উত্তর দিল, প্রভু উহা তাম্রবর্ণের যে! তুমি ভাল জান!

তখন বনদেবতা অদৃশ্য হইলেন, কিয়ৎ পরেই তিনি হীরকপ্রভ এক শম্বুক দেখাইলেন, কহিলেন, ইহাই কি সেই?

তাহারা সভয়ে উত্তর দিল, প্রভু উহা রৌপ্যবর্ণের যে! তুমি ভাল জান!

তখন বনদেতা অদৃশ্য হইলেন, কিয়ৎ পরেই তিনি এক নরাঙ্গুল সদৃশ ক্বচিৎ পান্নার ঘটা গঠিত এক বিচিত্র ক্রৌঞ্চ দেখাইলেন, কহিলেন ইহাই কি সেই?

নতজানু সকলে আর্দ্র চোখে উত্তর দিল, প্রভু তুমি জান জান।

সেইদিন তখন ঐ মনস্তাপ জাতীয় পরমাশ্চর্য্য উপাখ্যান শ্রবণে মনিব পত্নী হাসিয়াছিলেন, অথচ তামাশায়, কেন না যে এতাদৃশ লিরিসিজম্‌কে শোভনীয়তা, ঔচিত্য, মানে বাস্তবতা দানে বহুকাল আগের তোপচাঁচির ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাচীন এক ক্ষোভ বিস্মৃতির কথা যাহা—তিনি ইহাও সঠিক বুঝিলেন যে ঐ কাকা স্বামীকে উৎচকিত করিয়াছে, তাই যুগপৎ তিনি, পত্নী, সমালোচনায়—

বলিয়াছিলেন যে, ধর ঐ স্থান শূন্য ভাঙ্গিলে ও সেজানে স্থান কবিকৃত, মানে অক্ষমতার ছাড় বা শিল্পীর ছাড় যেখানে তাহারা ভাবিতে পারে না। মনিব মহাশয় তদ্বিষয়ে উত্তর দিলেন – আঃ সে শুভ্রতা সে শুভ্রতা ! আজ এখন সেইদিন-কার সেই বালকবৎ ভীরু স্বামীকে স্মরণে অধুনা তীব্র কটাক্ষপাতে প্রতিবাদ করিলেন, মিসিং লিঙ্ক না ছাই পাশ···কোথায় ছোঁড়া তেমনটি চেয়ে দেখত ?···

সাক্ষাৎ চোর-চোর বুঝিয়া তুমি সন্ত-জঙ্গল দেখিলে কি রূপে তাহা হইলে···

তখন কেন জানি নি জঙ্গুলে ব'লে মনে হ'ল··· । মনিব পত্নী ইহার পর ছেলে-মানুষের মত আব্দার করিলেন, – ওগো এইভাবে পোড়ারমুখো ছোঁড়ার তুমি একটা কোট তু'ল···ওরে বাবা পালকটা কুড়ো কুড়ো···কিন্তু তোমার কি করে মনে হল ?

তোমার মনে পড়ে, সেইবার ঘুটঘুটিয়ার জঙ্গলে পিকনিকে যখন যাই তখন তুমি হুপ্ পী (কাঠ ঠোক্রার মত দেখিতে এক রূপ সাদা কাল মিশ্রিত পাখী), দেখিতে চাও আমরা সুঘরাইকে কাজের সাহায্যে রাখিয়া বহুদূর চানোয়ার তীর ধরিয়া পূর্ব্বদিকে যাই ! বেশ সময় বাদে, আমরা যখন ফিরিয়া আসি, তখন তুমি ভৃত্যকে না দেখিয়া উতলা হইয়া যাহারা রান্না তদারক করিতেছিলেন (অনেক চেষ্টায় এই পিকনিকে মিলিত হইয়াছিলেন) তাহাদের তুমি প্রশ্ন কর ! তাঁহারা কেহই, তাহার সংবাদ দিতে পারিলেন না, তুমি বড়ই শঙ্কিত যুগপৎ অপ্রসন্ন যে তোমার অনুপস্থিতে কেহ যদি বেচারীকে ডোম বলিয়া ছোট করিয়া থাকে, খেদাইয়া থাকে, রান্নার কাছ হইতে তুমি আমাদের অন্য ভৃত্যদের ও অন্য চেষ্টার বাড়ীর বালকদের তাহার খোঁজ করিতে বলিলে । তাহার নামে বন চমকাইতে লাগিল ! অজস্র প্রজাপতি পার হইয়া অনেক গভীরে সেই ডাক প্রচারিত, এমত সময় মূর্ত্তিমানের উদয় হইল, হাতে খাঁচা দেখিয়া তুমি তাহারে চিনিলে ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসিলে, মুখপোড়া জানোয়ার কোথায় ছিলি···এই ভয়ঙ্কর বন, তোর কি কোন ভয় ডর নেই র‍্যা··· । আজও আমার মনে আছে, জানোয়ার মৃদুহাস্যে উত্তর করিল, মা গো, কোন ভয় করিবেন না, আমার জন্য এখানে – এই দীপ্তিময়ী বনে আপনকার কোনই শঙ্কার কারণ নাই··· এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করত কহিল, মাগো জানিবেন, মহতী বনস্থলী আমার গা ঘেঁষিয়াছে··· । যে এবং ইহা প্রকাশিয়া সুঘরাই সমস্ত লতা গুল্ম পত্রবিকাশের, পক্ষী রবে ছন্দিত যাহা, ঐশ্বর্য্যময়ী যাহা, তাহারই পানে সগর্ব্বে নির্ভীকতায়ে মস্তক সঞ্চালনে দেখে – কি এক অহং এখন তাহাতে··· ! যে ইহা শ্রবণে তুমি নিশ্চল, এমনও যে ঐ বাক্যে স্বভাববশত স্বীয় মাথায় ভক্তিভাবে হাত স্পর্শ করিতে ভুলিয়াছিলে ! তখন আমরা দুজনেই হারামজাদার প্রভায় আচ্ছন্ন ! অবশ্য অন্যান্যরা সারিবদ্ধভাবে যাহারা তাহাকে আধা ঘিরিয়া ছিল, তাহারা হাস্য করে, কিন্তু হঠাৎ তখনই বৃক্ষ পত্র খসিতে তাহারাও ঈষৎ থ ! শুধু জগুর পিসিমা,

তিনি খানিক দোক্তা মুখে ফেলিতে, তাঁহার আড়াই প্যাঁচ সাপ মুখো চোখে চুনীদার তাগা পরিলক্ষিত হইল, ইনি সাহসে মনিব পত্নীকে সম্বোধনে কহিলেন, ওগো বৌমা, বলি শোন, আমার পক্ষা যখন পেটে তখন একবার ননদ বাড়ী যাই—তখন তাহাদের ঘাটে একজন একজনকে বলিতেছে শুনিয়াছি যে সেই বলে না—

গরুর কুটুম চাট্‌লে চুট্‌লে
কুকুরের কুটুম শুঁক্‌লে শাঁক্‌লে
মানুষের কুটুম্ এলে গেলে।

…তা তোমার সুঘরাইএর গাত্র শুঁকিবে না?…ইনি সেই জন্তুর পিসিমা যিনি, '…' নিবাসে-তে আগত চেঞ্জার ঘোষবাবুর পুত্রের, যে বিশেষত ধরাগলায় নবযৌবনা যাহারা তাহাদের সমক্ষে, সৌন্দর্য্যের স্তুতি করার বহর স্মরণে, ইনি তাঁহার বিরক্তিতে বলেন,…ওমা সেদিন ভোর থাকিতে আমরা আমি, মিনি, রাধা, নিভা, ইতি, চায়না, সিরিয়ার পাহাড় বেড়াইতে গিয়াছি, দেখি, ঘোষেদের সুপুত্রকে, আমারে দেখিয়াও, ঘোর কলি কি বলিব মাইরি, কোন ভ্রুক্ষেপ নাই, খালি ব্যায়াম…ইহা উহা সব কিছু সুন্দর, আবার বলিল, সদ্ভাব বাবু না কে লিখিয়াছেন…ঝাড়ু মারি! সোমত্ত মেয়ে সব সঙ্গে লাজলজ্জা নেই, আমি বলি ছোঁড়া তোমাকে ছাড়া পৃথিবীটা…মরণ! লোকে আমায় আনকাল্‌চার বলে বলুক, এত সুন্দরের কি দরকার!…ও ছোঁড়ার মনে পাপ আছে! একদা আবার এই পিসিমাই তাঁহার ভাই-বৌ রাধা'র মাকে সঙ্গে লইয়া '…' বাবুর বাড়ী পাম্বপাদপ গাছ দেখিতে গিয়াছিলেন! সেখানে বেচারী রাধার মা ও সুমহৎ বৃক্ষ সমক্ষে কম্পিত, রোমাঞ্চিত, তাহাতে ভাবান্তর, তাঁহাতে রাত্র সমাগত! তদীয় মুখ-মণ্ডল আরক্তিম নাসাপুট অতীব জবা, ননদিনীকে কোনক্রমে কহিলেন,…দিদি এই পাম্বপাদপ অবলোকনে আমার দেহমনে এক আলোড়ন সঞ্চারিত হইতেছে, এক অভিনব পুলক ঝাপটা দিয়া উঠিতেছে, এমন একটি সুকৃতির সন্তান আমাতে আসে, সত্যই জন্ম সার্থক হয়! ইহাতে ঐ সরল বাক্যের সহিত রাধা'র মা-র ঘন শ্বাসের শব্দ প্রাচীরে প্রাচীরে লাগিয়াছে।

ইহাতে জন্তুর পিসিমা ভূতচালিতপ্রায় হা হা করিয়া উঠিয়া ভর্ৎসনাস্বে বলিলেন,…ছ্যা ছ্যা মরণ দশা, গাছ দেখিয়া তোমার ভাব লাগিল যে, এই সেদিন বিওইলে আবার? তাহার নাম রাখিলে চায়-না…অগেরটি ইতি, তারপরও চায়-না, আবার? —আর যে ইনি গল্পচ্ছলে পাম্বপাদপ সম্বন্ধে এই মত নিম্ন স্বরে ব্যক্ত করেন যে, সত্যই বাপু…গাছটা যেন মরদপানা! এবং ইহা প্রকাশে তিনি বস্ত্র সংযত করার পরে ঘোমটায় ঠিক দিয়াছিলেন।

…জন্তুর পিসিমার ছড়া কাটাতে, ঘুক্তিতে, আমরা দুইজনে সুঘরাই হইতে সেই বিরাট বনস্থলীর প্রতি দৃষ্টি সঞ্চার করিলাম, দেখিলাম কুহক, আমরা—

বুঝিতে প্রয়াসী হইলাম, দেখিলাম হস্তী-দন্ত নির্ম্মিত রমণী, যিনি কহিলেন···শত পুত্র গর্ভ ধরিলেও আমি কুমারী। এমনও যে কুড়লের আওয়াজ আমাদের চীনে বুলবুলির ডাক বলিয়া ভ্রম হইল, এ বনভূবঃ কুমারী যে! দূর হইতে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বন্দুকের আওয়াজ আসিল, আমাদের ঘাত্র বিবেচিত হইল, কোন পত্তর মেইটিং কল! আ! বন্দুকের আওয়াজও মেটিং কল! এ কারণ যে এ বনভূমি রোসনাই! আমরা দুজনেই বড় মন-কেমন অনুভবে, আবার কীদৃশী ঈর্ষায় আমি, কি ভয়ঙ্কর রোষে আমি, তখন পিকনিক পার্টিতে পোরটেবল গ্রামোফনে একটি কমিক রেকর্ডের ফাটাতে পিন ঠেকিয়া ক্রমাগত একই শব্দের অদ্ভুতভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটিতে আছে, যাহা আমারে অধিকতর উন্মত্ত করে! কোনক্রমে আমি সুঘরাইএর প্রতি লক্ষ্য করিলাম, সেই দ্বিপ্রহরে এখন যেন সন্ধ্যাপ্রসবী শিঙ্গা বাজিতেছে! আমার আবার অক্ষর পরিচিতি ঘটিল! বুঝিলাম আমার মনিব আছেন, তাই আমি আর এক বুনো!

এই পর্য্যন্ত বিস্তারিয়া মনিব মহাশয় সদম্ভে প্রতিষ্ঠা করিলেন, ঐ বালক সেই মিসিং লিঙ্ক!

লাভ লেটার-এর···! ইনি এবং উচ্চারণের পরক্ষণেই মনিব পত্নী বিদ্যুতে জিহ্বা দংশনের পরই কহিলেন, ও মা, ঐ কারা আসছে দেখ···

এই ভাগর মনোহর হিরণার টিলার উত্তরে আরও দেশদেশান্তর সকল আছে, এখন উত্তরে প্রতীয়মাণ ঐ ভাগে যোজনব্যাপী আলুলায়িত প্রলম্বিত রম্য উত্তম শ্রীমণ্ডিত উৎরাই, কোথাও একলা আতা গাছ, কখনও বা পাথর-পৃষ্ঠ, মহুয়া স্থির সপ্রীক, তারপর সমতল; তারপরও চিঠি যাইয়া থাকে; ঐদিকে মানুষের নিঃশ্বাসে আকাশ খুব নীলিমা; চোখে জল; ঐ রাস্তা যারপরনাই লক্ষ্মী, যায় ও আসে, ইদৃশ পথটি বেচারী ঘুমকে কভু সমালোচনা করে না। মনিব মহাশয় ঐ পথে শরৎকে আসিতে দর্শনে বলিয়াছিলেন, শরৎ আসিয়াছে এস কাঁদি—তাঁহার চক্ষু সজল হইয়াছিল।

এখন পত্নীর ইঙ্গিতে, মনিব মহাশয় তাঁহার মানসিক শান্তি হইতে—তিনি যেহেতু বিচারই শান্তি—বিশ্বাসী যেহেতু, তিনি কিছু সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, তিনি আপন বালকভৃত্যকে আর এক সৌখীনতায় আপন সৌখীনতাতে (!) অন্তরিত করিতে পারিয়াছেন—উৎরাই পর্য্যবেক্ষণ করিলেন; পরিদৃশ্যমান হইল এই যে, চৈত্রের ঘূর্ণায়মান বাত্যায় জব্দ কিছু পাতার ন্যায় একটি দল, ইহা প্রভাময়ী; যে উহারা জনে জনে তুমুল-গোঁয়ার বাতাসে গাত্রবস্ত্রাদি কেহ ফ্রক কেহ সাড়ী সামলাইতে যে ইহা জলবৎ যে অপূর্ব্ব উৎসুক, যে ঐ আলোড়িত দল গীত গাহিতে আছে, যাহারই এক আধ মাত্রা ঘুরন্ত বাতাসে এত দূরেও ছিটকাই আসে, এহেন দৃশ্য মারচন্! অভিরাম রঙ্গিলা! উহারা যেন প্রকৃতিকে ডাকিতে গিয়াছিল, না না, তাহা কেন প্রকৃতিকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে গিয়াছিল, যে

ইহা নজরে মনিব মহাশয় পুর্ণ, ধীরে ধীরে বলিলেন ;···বেশ দেখিতে লাগিতেছে না বল ! আজব হেরোইক ! উহারা যেন ব্রাহ্মণী হংসের রুট ধরিয়া আসিতেছে না ? স্প্রেনইনডিড ! স্প্রেনড্যর !

কে ওরা বুঝতে পাচ্ছ ? মাগো আমার কথা ওরা বোধ হয় শুনতে পেয়েছে গো···লাজে মরি !···যে ইহা শুনিয়া মনিব মহাশয় তদীয় বৈষ্ণবীয় মনস্কতা হইতে, স্বীয় সহধর্ম্মিণীরে আশ্বাস স্বগতভাবেই দিয়াছিলেন, তুমি কি পাগল ! ওরা কে···

বুঝতে পাচ্ছ না, ছোট-বাইরেরা গো যতি ওরা খুব শুনে থাকে···বাবা যেমন বলেন বড় জবরদস্ত মৌলবী !···হইবে না-ই বা কেন ! হেডমিসট্রেস বলিয়া কথা··· !

সম্প্রতি তাহারা দূরে থমকাইল, এখন কেমন একরূপ কামনা করিতেছিল অগ্রসর বিষয়ে, স্পষ্টতই যে এখন তাহারা রাস্তা ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী জমিতে ইতস্তত ! যাহা নেহারিয়া মনিব পত্নী ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করেন, ব্রীড়ায় অবনত মুখে জানাইলেন,···না গো, ছ্যা ছ্যা ওরা নিশ্চই আমার 'লাভ লেটার' বলাট্টা শুনতে পেয়েছে ! বড় তরাসে ওরা যতি এতটুকুন আঁশ গন্ধ রইল ত অমনি হাঁ হাঁ করবে'খুনি···

তুমি খেপিয়াছ···আমার ধারণা বলে উঁহারা আমাদের এড়াইতে চাহিতেছেন···সেদিনকার ব্যাপারের, মানে সাঁওতাল নৃত্যের দিন ! রকমারি লণ্ঠন ও পেট্রোমাক্সের বিকিরণ গাছলতাপাতা নানা ছাঁদে, বহুস্তরে, ভেদিয়াছে – কভু বা আজব রামধনু ! ছটাসকল কতক নাবি ডেলিয়াতে, কখনও আন্দোলিত চামেলীতে (আমাদের জানলার নীচে কি অফুরন্ত চামেলী ! কি তারিখহীন !), আবার অন্যদিকে সাঁওতাল রমণী যাহারা ইতস্তত তাহাদিগের দেহে যে এবং এই সকল সেই ছায়ার হেতু যাহা ক্ষণিক নিমিত্তই চকিতেই জাগাইতে পরিশ্রম করিয়া করিয়া যায় মুরারীবাবুকে ; ইনি যিনি রৌদ্র-প্রত্যক্ষ-বোধ লইয়া নিম-নিদ্রিত ! ইনি টুলেতে বসিয়া, একটি ইজিচেয়ারের শিয়রে পশ্চাত হইতে মাথা রাখিয়াছেন ; এবং এইভাবে তাঁহার ঘাড়ের রেখাটি সম্মোহ ; নিশ্চয়ই তিনি এখানকার পাহাড়ী হাওয়ার মধ্যকার পারিপার্শ্বিকতাকে উক্তাকার অতুলনীয় অভিব্যক্তিতে স্বপ্নে আনিতেছিলেন ; যে তদীয় মুখমণ্ডল এরূপ যে স্বতঃই মনে হইবে যে মুহূর্ত্তেই তিনি চোখ মেলিয়া ঘোষণা করিবেন, কি গ্রাণ্ড !

এবার ঐ মুরারীবাবুর আঁখিপক্ষ কম্পিত ছিল, তিনি সজাগ, কেন না তিনি সজাগ, কেন না তিনি অলৌকিকতা শুনিতেছিলেন, কেহ, পরিতোষবাবুই তাহা বর্ণিতেছিলেন যে : আমার স্ত্রী, শুধু আমার স্ত্রী বলি কেন, উহাদের গোষ্ঠী মানে ফ্যামিলির সবাই খালাস করিতে খুবই অর্থাৎ পারদর্শী, কি এক পুণ্য আছে ! যদি কচিৎ বাই চান্স একটি নষ্ট হয় ত কান্দিয়া আকুল হন, দু-তিন দিন অন্ন গ্রহণ

পর্য্যন্ত করেন না, খালি কান্না! হায় ভগবান, আমি জন্ম-রহস্য দেখিতে বিহ্বল কেন হইলাম! সে ক্রন্দন শুনিলে পাষাণ দ্রবীভূত হয়! কেদার দাস বলিয়াছিলেন এরূপ পাকা হাত কচিৎ···একবার এক ছোকরা ডাক্তার এক পোয়াতি দর্শনে গৃহস্থদের বলে, যে গাছ তোমরা চাহ না ফল চাহ···

ঠিক এই সময়েতে বাড়ীর সিঁড়ির কাছে একটি ছোট ভীড় দ্বারা মধু মধু হাস্য খেলিয়া উঠিল। যে বালিকা সেদিন চানোয়ার রোগা তীরে বালির বসত নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আর যে, যে বালকেরা ভাগ্য অপরূপ-কান্তির নুড়ি সকল প্রাপ্তি ব্যাপারে অতি অতি অতি শুভ সুপ্রসন্ন, আর এই বালকই বড় তীক্ষ্ণ তীব্র ভাবে চানোয়ার স্রোত দেখে এবং এই দেখাটি ভবিষ্যতে যে কোন বহমানতা, নর্দ্দমার দ্রুত গতিপ্রবাহে আরোপিত হইবে, সে হাততালি দিয়া উঠিবে, চানোয়া! ক্রমে ঐ ছবি তাহারই মধ্যে মরিয়া শুধু কম্পন! আঃ কত বাস্তবতাই আমার রক্তে! এখন ঐ বালিকা আর ঐ বালকের ছায়া সেই হাস্য-খর ভীড়কে শমীকৃত করিয়াছিল; এবং মুরারীবাবু তদীয় (আমাদের মনগড়াই নহে) ঘোষণা করার মনোবৃত্তি হইতে অর্দ্ধনিমীলিত চোখে লক্ষ্যে আয়াস করিলেন।

এখন তাহার ঠাওর হইল, যে সিঁড়িতে, স্তর পি-র পরমা সুন্দরী নাতনি চতুর্দ্দশী অলোকা! পিছনে জড়োয়া ক্যাপিটাল দেওয়া ফ্লুটেড থাম—আর উপরে খিলানের রেখা; সামনে অলোকা; পাশেই চমৎকার সয়াইল কুকুর ও টর্চ্চ হস্তে পরিচারিকাবৃন্দ, সে বেচারী সদাই বিভীষিত, উজর হাসনুহানা যাহার আতঙ্ক, স্ফূর্ত্তমান কামিনী দেখিলে যে নীল! ঐশ্বর্য্যময়ী অলোকার মধ্যে চোরা-স্বেদ! তাহার অনামিকা যে নয় ক্যারেট হীরক খণ্ড ক্রমাগত ঐ সকল কিছুকে মহাস্পর্দ্ধা শাসন করিতেছে, যে অলোকা চরাচরের দিকে চাহিয়া বলিতেছে, তোমরা আমাকে হে সৌরভিত বৃক্ষসকল, আর শঙ্কিত ভীত করিও না, তথাপি যে সেই অলোকাই ঐখানে থাকিয়া ঐ হাস্যে যোগ দিয়াছিল! ঐ উদ্দীপনা এক শিশুকেন্দ্রিক।

অদূরে বিলি, যে এতাবৎ এক পেয়ারা গাছের একটি নমনীয় ডাল টানিতে থাকিয়া—ফলে তাহার দেহে আলোর হিলমিল!—নিজ জীবনযৌবনের উপাখ্যান কহিত আছিল, আর যে বহুতেই নিলর্জ্জ হইয়াছে তাহার নিমিত্ত, এবং সে স্থলে··· যখন তখন টপসী প্রমদা, যাহারে কাফ্রীর মত দেখিতে, যে তাহাদের ক্লাসে সর্ব্বপ্রথম সাড়ী পরিতে বাধ্য হয়, অনিমেষনয়নে দেখিত, প্রমদা রূপসী। কিন্তু কি ভয়ঙ্কর তাহার ঠোঁট, গা কণ্টকিত হয়। এই বিবরণে শ্রোতারা ব্রীড়ায়ে চারিদিকের ঠিক লইয়াছে। আরও বিলি জ্ঞাপন করে, যে সে ইন্‌সট্রুম্যাণ্ট বক্সের ডিভাইডারের কাঁটা দিয়া (তখনকার দিনে খুব চলন ছিল) আপন হস্তে প্রমদার নামের অক্ষর পি লিখিয়াছে, রক্ত পড়িয়াছে—ইহাতে যত কিছু ডাক বাবা-মা-ভাই ইত্যাদির স্বরভঙ্গ হইয়াছে—সে মরিয়া ইতিমধ্যে ফ্রক পরা ও পুরুষ

পোষাকে একটি মেয়ের সান্নিধ্যে আসিতেই সে বলিয়াছে, অভাগীর স্বর্গ চমৎকার ! কখনও ভগনী নিবেদিতা, কভু পণ্ডিতানী রমাবাঈ ! বলিয়াছে, অজস্র শত চিঠি আমার নিকট জমিয়াছে···তাহা দিয়া আমি এলবামের মত (!) করিয়াছি··· অতএব সে, বিলি, বহু প্রাচীন-রীতির চতুর। যে বিলি আবার আরম্ভিল যে একদা প্রমদার কুহকময়ী অগ্নি উদ্গার দেহ স্মরণে 'এ কি এ কি !' শব্দ উচ্চরিয়াছিল, এবং যে তাহাতে ঘুম ছিল না ! যে ইহা ভাবনা হইত তাহার নিজের দেহ লীলা-র মত হয়, সত্যি যাহার বক্ষ সমতল ছিল ! আমি রাতদিন ভগবানকে ডাকিতাম !

এ হেন যে বিলি সেও ঐ খুসী উচ্ছ্বাসে আকৃষ্ট হওয়ত যে তখন বেচারী জানে নাই যে উহার কারণ কি, (আপন অনুগত) শিষ্য-সমানদের লইয়া গ্রাভল পথে কর্কশ আওয়াজ তুলিয়া জলদিই এখানে, যেখানে মাধুর্য্য ! এবং এই সময় এমন ঘটে মুনশেফের স্ত্রী স্বীয় কন্যা যে মায়ের অজস্র সঙ্কেত দেখিয়াও দেখে নাই, যে বিলির সংস্পর্শ ত্যাগ করে না—অনুপমাকে কবলিত করিয়া গোপনতা সৃষ্টি করত, উষ্মবর্ণে-প্রায় বাক্য উচ্চারণে তিরস্কার করিলেন,···রহ তোমার বাবাকে আমি বলিতেছি তুমি ওই ঢলানীর দুর্ব্বিনীতার সহিত মাখামাখি করিতেছ, উহার পদদ্বয়ের গড়ন বানরতুল্য ! সে বিপথগামিনী, অনবরত মিথ্যাবাদিনী, বলে ডাইসেসন হইতে পাশ করিয়াছি, উহা মিথ্যা··· !

প্রথমে, এবম্প্রকার কটুবাক্যেও অনুপমার চোখ জোর হারায় নাই, যে সে বলিতে ইচ্ছুক যে বিলি খুব কালচারড ফরওয়ার্ড ! সে একা কলেজে যায়, সে আলোকপ্রাপ্তা !···অথচ এবং তাহার কর্ণে বিলির শ্লেষ্মা-জড়িত স্বর ছিল, যথা প্রমদা বলিয়াছিল, বিবাহ না-হওয়া পর্য্যন্ত এ দেহ স্পর্শ করিতে দিবে না, বিবাহের পর যাহা খুসী ; অথচ একদিন শিলাবৃষ্টিতে বিলির সারা অঙ্গে কি শিলা বাজিতেছিল ! এখন অনুপমার মৌনভঙ্গ হইল, জানাইয়াছিল গত সরস্বতী পুজায় বিলির নিজেকে কি পর্য্যন্ত রমণীয় সুলক্ষণীয়া দেখিতে হইয়াছিল তাহারই কথা ! কিন্তু যে আদতে ঐ সূত্রে বিলি ঘোষণা করিয়াছিল, যে আমাকে অপূর্ব্ব দেখিতে হইয়াছিল, মাথা ঘষিয়াছিলাম, সাগর-খেলা চুল মাথায়, পরনে বাসন্তী রঙের সাড়ী, কলেজের মেয়েরা সমস্বরে 'আঃ !' আনন্দিত ফুকারিয়া উঠে, উঃ সত্যই আমাকে যা চমৎকার দেখিতে হইয়াছিল, রাস্তার অবালবৃদ্ধ, সবাই হাঁ হইয়াছে, এক অতি নীচু ক্লাসের একজন লোক আমারে দেখিয়া উল্লাসে আতিশয্যে হাঁটু পর্য্যন্ত লুঙ্গি সংবৃত করত আপনার সমগ্র দেহ যেন ছুঁড়িয়া দিল, শ্রুত হইল,···মাইরি দুইটি খাইতে দিও—(পায়ে) পড়িয়া থাকিব ! এবং বিলি মন্তব্য করিয়াছিল, কি অসভ্য ! কি আস্পর্দ্ধা ! ছোটলোক ! আর যে অনুপমা যাহা স্মরণে জন্মমূর্খের মত আপনকার মুখে ভাব আনিয়া স্থির থাকিয়া অন্য আর একটি মেয়েকে আপন সপক্ষে মানিল, কোকো জানে !

ষ-বাবুর ভগনী, ইনি নিকটেই ছিলেন ; ইনি বর্ষীয়সী, ইনি বিধবা, ইনি উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম মুখস্থ বলিতে পারেন, ইঁহার পায়ে কেড্‌স যাহার কারণে ইনি ঈষৎ কিন্তু-তে, ইনি কোকো নাম শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, অবিলম্বেই তাঁহার দৃষ্টি ঐরূপ নামধারিণী অল্পবয়সী মেয়েটি প্রতি, এত বয়সেও তাঁহাকে ভ্রূকুঞ্চিত করিতে হইল, যেহেতু ঐ মেয়েটি তাঁহার বোনঝিরে বলিয়াছে যে তাহার নাম লাভলি, অথচ উহার নাম দুর্গা, আশ্চর্য্য উহার মাতা প্রথমে ঐ লাভলি নাম অস্বীকার করে, পরে বলিয়াছিলেন, উহার মামা রাখিয়াছিলেন ! ষ-বাবুর গৃহিণী অবাক হইয়াছিলেন, এখন তিনি থ, নিশ্চিত ভাবিলেন রিখিয়াতে আসিয়া এক একজন এক এক রূপ ধারণ করে···রজতগণের কথা মনে আসিল—যে ইহা ভাবিলে গাত্রে সিক্কিড়া উপস্থিত হয় ; মেয়েটি বিলির সহিত অহরহ ! অথচ দুর্গার মা বলিয়াছে, যে আমার কন্যা দুর্গা সেরূপ নহে, সে এখনও জানে, চুম্বনে পুত্র গর্ভে আসে, দুর্গা 'মেস'-বাসী অসভ্যদের জুতা ঝাঁটা দেখাইয়া থাকে। ষ-বাবুর ভগনীর একটি বচন এই সূত্রে মনে স্বভাবতই আসিল, পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই। তবে মেয়ের গুণ গাই ॥ এবং চকিতে ইনি, খানিক বিলির প্রতি চাইলেন, তাঁহার দেহ মোচড় দিল, এই বিলিই তাঁহার ভাইঝি, হাতে টাট্‌ লইয়া যখন ফুল তুলিতেছিল তখন পাজি লিখিত তিল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতেছিল ; যে এবং ইহাও সিদ্ধান্ত করিলেন, যে বিলির মাতাই ইহার জন্য দায়ী, বেহায়া মেয়েরে কখন শাসন করে না এবং ইহাও, যে নিজে, বিলির মাতা, এত সোমত্ত মেয়ে থাকিতে রঙীন কাপড় পরেন, তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান কৈ ! এই মাতা, ইহা প্রচলিত যে, বিলির পিতা কিছু বিলির বেচাল দর্শনে কিছু বলিলে তর্ক করিয়া থাকেন যে এই যুগ নূতন ! তুমি বৃদ্ধ !···বিলাতে কি হয় ! লোকের মুখে ছাই, তাহারা কি খাইতে অথবা পরিতে দিবে ! আমরা জীবনে কোন সাধ আহ্লাদ করিতে পারি নাই, মেয়ের সম্পর্কে তোমারে ভাবিতে হইবে না ! (আশ্চর্য্য বিলির পিতা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী) যে এবং এই সকল কথা বিচারিয়া ষ-বাবুর ভগনী উপলব্ধি করিলেন, দুই দিনের জন্য আসিয়াছি, আমার কি প্রয়োজন ! তাহার সাক্ষাতে নবযৌবনারা কেমন যেমন নগ্ন তাহাদের গাত্রবর্ণ, মেঘতুল্য ধূসর, যে এবং ইনি সংযতভাবে মুনশেফের স্ত্রীর সহিত ইহা যোগ দিলেন, না মিশিলেই পার, আমি অন্য কিছু বলি না, তবে যে ঐ ব্লাউজ পরা কেন, ঘটি হাতাই ত ভদ্র···আবার হাতাবিহীন··· শুনিতে পাই কাঁচা রসুন খাইয়া···গোবিন্দই জানেন !

অনুপমা এহেন তিক্ততার মধ্যে থাকিয়াও বিদ্যুতে বিলির নজর লইল, কেমন যেমন ভীরু, কেমন যেন জেল্‌লারহিত, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কি কুহকিনী যে সে ! উহার হস্তীদন্তের (আসলে হাড়ের) ঝুমকো, উহার মীন অথচ টানা নয়ন, গৌর গাত্রবর্ণ, উহার কাজল, সিন্দুর টিপ এ সকলেতে যেন পৃথিবী নড়িতেছিল সর্ব্বের ফোয়ারা। এখন বিলি উপস্থিত ঐ শিশুকেন্দ্রিক আবহাওয়ায় নিজে যেন

অনেকটা বিলি-র স্বীয় উক্তির ন্যায় নির্ঘাত ক্যাড, চিবি, বিশ্রী ; যাহা এই সূত্রে যে ঐ সরস্বতী পূজার দিন তাহার কোন বন্ধুর ভাই তাহার এক কোট তুলিয়াছিল, ফোট আসিল, কিন্তু কোথায় সে বাসন্তী রঙ, কোথায় সেই অপূর্ব্ব কেশরাশি ! যথার্থ বিপরীত তাহারে দেখিতে যেন রাক্ষ···চিবি বিশ্রী ক্যাড।

এবং এই বিবরণের পরই বিলি অধোবদনে থাকে, খানিক বাদেই হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আমার ফোট কেন যেন ভাল উঠে না, বোধ হয় তুক আছে।···এবং এই স্বীকারে সে উৎসব-মাতৃক বিলি ফ্যাকাশে, হায় বিলির শুষ্কতা আছে, কোন এক গ্রহে অজানিতেই তাহার পরমার্থ অপহৃত হইয়াছে ! কিন্তু ঝটিতি তিলেক মধ্যেই বিলি নিজের কথাকে উড়াইয়া দিল···ধ্যেৎ মা বলিয়াছে উহাদের হাত খারাপ, ক্যামেরা বাজে। তথাপি তাহার এই যুক্তির পরও তাহার সেই বিষণ্ণতা গুণগ্রাহী সকলে দেখিয়াছে, দেখিয়াছিল, বিলি যখন একাকিনী !

এখন শিশুর সান্নিধ্যে বিলিরে অনুপমার যথার্থই তেমন তেমন উপলব্ধি হইল, যে সুতরাং সে বেচারী, এতেক স্তম্ভিত যে যাহাতে সে আপনার অতি ধ্যানে কৃত কেশবৈচিত্র্যে হাত দিয়াছে অসাবধানতায়, বিলি যেমন ময়লা যে বিলি ধূপের ধূম্র রেখার তুল্য ম্লান, সেই স্পন্দিত দ্বীপ তাহার কোথায়, চন্দ্রালোক যে দারুচিনি অরণ্য মর্ম্মরিত করিয়া বিচ্ছুরিত হইত তদীয় ভ্রমণের হেতুতে ; যে তরঙ্গ সকল তাহার লাগিয়া অলঙ্কার নিমিত্ত, বিবিধ প্রকারের ঝিনুক আনিত, তাহা শুধুই যেমত বা কবিপ্রসিদ্ধ। এখন অনুপমার ইহা পরিলক্ষিত হইল, যে বিলি ঐ চম্পক শ্যাম হইতে অপস্রিয়মাণা। যে সে শিশু আদৌ ভালবাসে না, ইহা অনুপমা জানিয়াছে এবং ঈদৃশ হলপে আশঙ্কিত হইলেও চোরা-মনে রাখিয়াছে, কিন্তু অন্তপক্ষে শিশু যে নির্দ্দোষ মাধুর্য্য যে ইন্‌নোসেন্স যে বিলিকে এইভাবে যে আঘাত করে তাহা নির্ব্বোধ অনুপমা কভু বুঝিবে না ; আ ইন্‌নোসেন্স কি মারাত্মক !

যে বিলি সদলে চলিয়া গিয়াছিল, গ্রাভেলের কর্কশ আওয়াজ পুনরায় বিস্তারিয়াছিল, যে ক্রমে বিলি বেষ্টিত সহচরীদের মধ্যে আপন মুখখানি বিষাদ হইতে উন্নতকরণে সক্ষম হয় ; এবার সে তীক্ষ্ণ, প্রকাশিল, যে ঐ হাস্যসূত্র গ্রাম দোষযুক্ত, যে উহাদের ভাষা অশালীন আনকালচারড, প্রায় ক্যাড। আধা বৃত্তাকারে সহচরীবৃন্দ নির্ব্বিচারে তাহার ডাগর মানসিকতা দেখিয়াছে। তাহারা, উহার ঢলঢলে বেলোয়ারি মুখ—যাহার কারণে এক্সইবিশনের স্নো-এসেন্সের দোকানদাররা অকাতরে সাম্পেল উপহার দেয়—সেই আকর্ষণ হইতে চোখ ফিরায় না, বিলি সাবাস ! তাহার ক্যাড শব্দ উচ্চারণ সর্ব্বত্রে খেলিয়া ফিরিতে আছে।

কখনও সভয়ে ইহাও সহচরীদের মনে পড়িবে, অমলাকেই বিলি ক্যাড বলে, ইহারা যাহারা লাভম্যারেজ অবধি শুনিয়াছে তাহারা বিলি-কে কখনও শুনে নাই। অমলা ক্যাড। এ অমলা সেই যে খুব সরল যে খুব লক্ষ্মী যে খুব ভাল,

যাহার দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হইয়াছে, যে সগর্ব্বে কলী পরে, তাহার বিবাহতে এক কাণ্ড হইয়াছিল, যাবতীয় মিষ্টি গুড়ের তৈয়ারী হয়, সবই নষ্ট হইল। সে সুন্দর গান জানিত, বহু সভায় উদ্বোধন সঙ্গীত বন্দেমাতরম সেই গাহিত, সে কাজী সাহের গান আরও ভাল করিত। এই সেই অমলা, যাহার গানের খাতাটি অতীব মনোমুগ্ধকর ছিল। এই অমলাই সেই যে গত পুজায় ৺বিজয়ার দিন সিদ্ধি খাইয়া একটু এলোমেলো হয়, গীত গাহিতে প্রথমে 'পাতকী বলিয়া কিগো' পর-ক্ষণেই 'লালদীঘিতে আগুন' অবিলম্বেই 'আয় মন বেড়াতে যাবি' সঙ্গে সঙ্গে 'শত কোটি কল কল নিনাদে' ইত্যাকারে গীতপ্রবাহে বহুবারই উহার বস্ত্রাঞ্চল স্খলিত হয়, আর বহুবারই সে জিহ্বা দংশন করে! তাহাতে কোন মতিচ্ছন্নতা নাই—সে বড় ঘর-বোলা। গত ভূতচতুর্দ্দশীর দিন সে কোথা না কোথা হইতে এই রিখিয়াতে চৌদ্দশাগ তুলিয়া আনিয়া সকলকে বিলাইয়াছে। সে বহু পাখী চেনে, উহাদের ডাক নকল করিতে পারে—এই অমলাই একটি চেয়ারে বসিয়া আপন পুত্রকে স্তন্যদান করিতেছিল। আঃ সমগ্র ধরণীর মঙ্গল হউক; আঃ দিক সকল সৌর সম্বন্ধীয় না হইয়া আপনি স্থিতিশীল হউক! আঃ পতঙ্গ সকল স্রোত-স্বিনীতে নির্ভয়ে স্নান করুক!

অমলার এই নিপটতার, চলমান লণ্ঠনে, ছায়া গাছে পাতায় দেওয়ালে জানলায়, লিলি কঠিন দৃষ্টিতে ঐ প্রতীয়মাণতা লক্ষ্য বিতৃষ্ণায় করিল, তদীয় হাল্কা দুল ঘোড়া ক্ষিপ্র আন্দোলিত হইল, ব্লাউজের গলার নিকট রাখা রুমাল লইয়া স্বেদ অপনোদন করিল। (হাতব্যাগ তাহার নাই) যে সে নিম্নগ্রামে উচ্চারিল, ক্যাড! সহচরীরা ভাবতঃ ঈষৎ অপরাধী। লিলির খাসা শ্রীযুক্ত মুখখানি, যাহা দক্ষিণ ভারতীয়দের মত সদাই নড়ে, তাহা খানিক স্থির, জানাইয়াছিল, অধুনা স্তন্যদান কুশিক্ষা প্রণোদিত, উহাতে রম্য সুষমা খর্ব্ব হইয়া থাকে, যে অমলা বৃথাই স্বদেশী (!) করিয়াছে। আর যে এহেন বাক্যে সকলেই ত্রস্ত, ক্রমে অবশ্যই দৈবক্রমে দেখিল, স্তন্যদানের বিপরীতে যে রমণী সে রমণী আর এক রহস্য!

আঃ বিলি তুমি আহেলী ডিকাডেন্স বহন করিতেছ! আঃ বিলির শুধুমাত্র বাম হাতের অনৈসর্গিক কালো চুড়ীর পৌনঃপুনিকতা কি সবুজতা!

এখন ঐ শিশুকেন্দ্রিক দলের আশেপাশে গিরি ঝরণা নদী সৃজিত হইতেছিল, শিশুটি তখনও সমানভাবে খুসী, আর আর সকলে তাই বড় উৎফুল্ল। কাণ্ড এই যে, মনিব মহাশয় মহা-অথৈ আদরে বিজলী সাত মাসের কন্যারে কোলে লইয়া-ছিলেন, আর সে সেই শিশু হঠাৎ প্রস্রাব করে! মনিব মহাশয় তাঁহার মহামূল্য চীনাংশুক পাঞ্জাবীর নিমিত্ত কোন খেদ না করিয়া বরঞ্চ উদাত্তে, গ্র্যাও··· গ্র্যাও! বলিয়া এই সংবাদ সমবেতদের দিয়াছিলেন, তাই ঐ হাস্য-ঝটিকা!

এখন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, যিনি রাশভারী, ইনি তড়িৎ দাশ সি. আই. ই-র স্ত্রী, এবং এই সময়েতে ইনি পুরুষদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে থাকিয়া—পুরুষ-

গণের সহিতই আলাপ তাঁহার শোভা পায় – ক্বচিৎ অন্যত্র মনস্থা ছিলেন, রকমারি আসন ইজিচেয়ার টুল তক্তাপোষ হইতে বহু আকৃতির পশ্চাতে এখন সাঙতাল রমণীগণ ইতস্তত ! প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সহবতে ঐ সূচনাতে মন সংযোগ করিলেন ; ···আপনকার চশমার তলা-কার কাঁচ দিয়া দেখিতে ব্যগ্র ; তৎক্ষণাৎই কোন সুলক্ষণা আলোকবিহীনতা হইতে শিশুকে কপট শাসন করিলেন···ওরে আবার হাঁসা হচ্ছে, শয়তান মুতিয়াছ আবার··· এবং মহিলার রম্য দন্তপাতি ভাস্বর হইয়াছিল।

যাহা শ্রবণেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর স্নায়ু দৃষ্ট, অভিজাত মনিব পত্নী এবং অলোকার প্রতি অসহায়ভাবে একাধারে নেত্রপাত করিলেন, অবশেষে স্বীয় স্কন্ধের কাছে বস্ত্রাঞ্চল প্রান্ত ধৃত ব্রচ আছে, যাহা মনোহর কাজ নিদর্শন – সোনার কসায়ে প্রত্যাগত এক পক্ষী, লার্ক সম্ভবত, তাহাতে যত্ন দিলেন ; এবং পার্থক্য ইহাদের সহিত তাহার হৃদয়ঙ্গম হইত, পুরুষদিগের প্রতি চোখ ফিরাইতে পারেন না, ভাগ্যশ অনেক আলো থাকিলেও ছায়া ঢাকিবার মত জোনাকী ব্যতিরেকেও, গোপনতা থাকে, সেই স্থলে উপস্থিত তিনি ক্ষিপ্রতায় 'মূত' শব্দটিকে নিজের কারণে সুখকর অনুবাদ (!) করিলেন 'ছোট বাইরে' এবং অতঃপর তিনি অবোধ বালিকার ব্যবহারে ভদ্রতাবশে মৃদু হাস্যে কহিলেন : ও, ছোট বাইরে ক'রেছ বুঝি ! প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর চমকপ্রদ মনোলোভা স্বরে, সকলেই বুদ্ধির অঙ্ক, তখন সকলেই খানিক সচেতন ছিল, অবশ্য পরে বড় অসংযম উজাইয়াছে নিজেদের মধ্যে ঐ পদসূত্রে।

দূরে সেই ভাবমুগ্ধকারী দল, আঁকিয়া বাঁকিয়া আসিতেছে, তাহারা আপনাদের স্বাভাবিক রাখিতে গীত গাহিতে ছিল, 'নূপুর বেজে যায়,' ক্রমে ঐ দল কোথায় যে তাহাদের স্বপ্নত্ব বাহার ত্যাগ করিল গোপন করিল তাহা বিস্ময়ের, পট তেমনই উজর, পথ তেমনই মায়াযুক্ত, সম্প্রতি যেমন বা ইহারা ঘোর জড়বাদের অন্তর্গত। মনিব মহাশয় ও তদীয় পত্নী সহজ হইলেন উদ্যোগী হইলেন, সুঘরাই অল্প তফাৎ আছে।

ইহারা বিভিন্ন ধরনে সাড়ী পরিহিতা, তাই কিছু সলজ্জ, তাহারা একে অন্যের পশ্চাতে আশ্রয় লইতে সমুৎসুক, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী রুমাল দিয়া কপালে থুপি দিলেন, উপস্থিত দুই পক্ষই মৃদু মৃদু আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। কিয়দংশে এই ব্যবহার নিম-কমিকাল বৈকি ! তথাপি এই বিরাট ফাঁকা মানুষের যাবতীয় উপহাসাত্মকতাকে নিশ্চিহ্ন করিল। পার্শী মারাঠি মদ্র ও হুল সামনে-আঁচল রীতির কাপড়-পরন দর্শনে মনিব পত্নী অনেক প্রশংসা করিলেন।

তৎকালে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী একবার বাবুটির একবার পশ্চাতের সানোয়ার ছোথায় নিরীক্ষণে কহিলেন – প্লেইজেনট ! অপূর্ব্ব ! বলিয়া তিনি মনিব মহাশয়ের

দিকে ফিরিলেন। তাঁহার মধুর স্বরসঞ্চার ব্যাপ্ত হইল ; অবশ্য ঐ উক্তির রেশে যেন 'কিন্তু' আছিল, সঙ্কোচ নাই, অন্যপক্ষে যেন নিজ উপস্থিতি সম্পর্কে উহাদের সচেতন করার মতিত্বও যেন তাহাতে, এবং আরও তিনি মনে মনে যুক্তি রচনা করিতেছিলেন ; যে কেন তাঁহারা লোকালয় ছাড়িয়া উত্তরে যাইয়া থাকেন !

মনিব পত্নী তাঁহার অভিমান ত্বরিতেই বিচার করিতে পারিয়া সত্যই মজা পাইতে গিয়া সাবধান হইয়া, তথাপি অসতর্কতায়ে তাঁহাকে তাঁহাদের গিরিডি চলিয়া যাওয়া বিষয়ে প্রশ্ন সূত্রে, গিরিডি প্রসঙ্গে - যে চমৎকার উস্ত্রি, কি অদ্ভুত মেঘ করে ! ধন্য পরেশনাথ ! কি শান্তাস্পদ বারগন্ডা ইত্যাকার বাক্য স্থির করিতে অধুনা স্যায়ত থমকাইয়া আছে যে তাহাতে, ঐ উল্লেখে, বেজার দেখা দিতে পারে, যেহেতু প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর অভিজ্ঞতা হয় যে রিখিয়া অত্যন্ত গ্রাম্য ! কুসংস্কারাচ্ছন্ন ! আর যে তিনি সিন্দুর পরাতে বিশ্বাসী নন, সত্যনারায়ণ শুনিতে যাইতে রাজি নন ! তিনি বলিয়াছেন স্ত্রীলোকেরা অশিক্ষিত ; তাঁহার লার-ডারের উপরে কাঁচে কালোর উপরে সোনার জলে লেখা 'ঈশ্বর মঙ্গলময়' আছে এবং সেই লেখার মধ্যে 'ঙ' অক্ষর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মিটিয়া গিয়াছে, এবং ইহা লইয়া এবং তাঁহার ভাষা লইয়া গ্রাম্য-রিখিয়ার সকলে তামাশা করিয়াছে ! এবং তাঁহারা তাই গিরিডি যাইবেন, সেখানে নিজেদের গোষ্ঠি আছে, একটি সমাজ-মন্দির আছে ! প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ ছাড়া প্রাচীনতা সাবেকত্ব উপরন্তু নাই।

অতএব এখানে মনিব পত্নী অল্প অস্বাচ্ছন্দ্য বোধের ক্ষণেই আপন সরলতায় আসিলেন, একারণ যে সমক্ষেই ফুলমুহ বালিকার যে তাহাদের অনেক অলৌ-কিকতা ছিল। তিনি খুব বন্ধুতায় কহিলেন···একদিন আসুন না···

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এই আহ্বানে, সম্ভবত খুসী হইয়া তৎক্ষণাৎই, নিশ্চয় আমরা খুব খুসী হইব, বলিয়াই অল্প অন্যমনা, মিথ্যা তাঁহারা প্রয়োজনে বলিয়া থাকেন, কহিলেন,···সময় যদি পাই। অন্তরে তিনি মনিব পত্নী, যিনি ধর্মপ্রাণা, তাঁহাকে এড়াইতে চাহেন যেহেতু ইঁহার ভাষা কুশ্রী, যেহেতু ইনি ভূতপূজক, হিন্দু ; জন্মান্তরবিশ্বাসী ও গঙ্গা-সমর্পিত মন, যাহাদের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঘৃণা করিতেন অপছন্দ করিতেন ! সুতরাং এই ক্ষেত্রে তিনি যে কি করিবেন তাহা মনস্থ হইবার পূর্বেই ফ্রক-পরা বয়সী মেয়েটি যে মারাঠি ধরনের সাড়ী পরিহিতা সে বিস্ময়াবিষ্ট হইল,···পিসিমা দেখুন দেখুন, কি বিউটিফুল পক্ষী, দেখুন পক্ষীটি বালকের হাত ঠুকরাইতেছে ! ইহা অশ্চর্য্যের ! উহা কি পক্ষী !

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঐ অপ্রার্থিত সুযোগ লাভে স্বস্তিতে যোগ দিয়াছিলেন, সত্যই চমকপ্রদ ! মহাশয় উহা কোন জাতীয় পক্ষী ? এবং যুগপৎ স্বীকার করিলেন,··· যে এইসব বিষয়ে আমরা এত অল্পই জানি···এবং যেক্ষণে তিনি হাসিয়া উল্লেখ করিবেন যে ঈসপস বা হিতোপদেশে ইহার কথা নাই, তখনই শুনিলেন যে, উহা-

তিতির ! এবং ঐ তিতির শব্দ তিনি সুষ্ঠুভাবে উচ্চারণের পরে পার্শ্ববর্ত্তিনী মারাঠি সাড়ী পরিহিতা কিশোরীকে প্রশ্ন করিলেন, তিতিরের ইংরাজী কি বল ত দেখি···সিনি, অত দুলিতেছ কেন ! ওকি ! ভদ্র হও···ছিঃ ! এই মেয়েটি এবং ঐ মেয়েটি আমার মধ্যম ভ্রাতার কন্যা···গত পরশু আসিয়াছে···আবার দুলিতেছ···যেখানে থাকে সেখানে ভাল স্কুল নাই···দুঃখের···বল অমন করিও না···ইহারা কি ভাবিতেছেন ছিঃ··· !

ঐ তিরস্কৃত মেয়েটি তখন মনিব মহাশয়ের চোখে অলৌকিক শোভা ধারণ করিয়াছিল এ কারণ যে,—সম্ভবপর ইহা যে সাড়ী পরার অনভ্যাস বা অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই—তাহার পদদ্বয়ের একখানি যাহা সর্ব্বলোক বন্দনার জন্য প্রণামের জন্য গঠিত তাহা যেমন সাঁচিতে (!) আছে তেমন তেমনভাবে পশ্চাতে ঈষৎ উত্তোলিত ছিল। মনিব মহাশয় আপন সহধর্ম্মিণীরে নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন, কি মিষ্টি না,···যেমনটি সাঁচিতে···নয় ? আহা কি—মনিব পত্নী জানাইলেন, আহা কি ভাব···কি—এবং এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি ইতস্ততর মধ্যে, প্রায় তাঁহার ওষ্ঠে আসিয়াছিল, যে, ঐ মেয়েরে পূজা করা যায়, কিন্তু প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর রুচি তাঁহার অবিদিত ছিল না, এখন এইরূপে শেষ করিলেন, ওদের দেখ্, প্রত্যেককেই বড় খাসা দেখতে নয় !

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী পুনরায় আজ্ঞায় মেয়েটি উত্তর দিল,···পারর—টরিজ··· !

ছিঃ কি উচ্চারণ ক'রিতে আছ, 'র'য়ে মানে প্রথমটিতে···তাপর বলিলাম ত ঐ স্থানে ভাল স্কুল নাই··· ।

পার্শী সাড়ী পরিহিতা যুবতী ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞ কিছুটা উদ্বেলতায় প্রশংসায়ে বাধা দিল,···শুনিয়াছি ইহাতে খুব ভাল রোষ্ট হয়···খাইতে খুব ভালও··· !

নিশ্চয় খুব ভাল খাইতে···তুমি তখন খুব অল্পবয়সী, যখন আমি পেশোয়ারে···স্কুলে···উনি কলেজে···এই তিতিরের মাংসে অপূর্ব্ব রান্না হয়, তবে সেই রন্ধনে কাশ্মীরজাত লঙ্কার প্রয়োজন হয়···আমরা একটু হলুদ দিয়া থাকি বটে, এবং সাহা মরিচ···বুঝিলেন, বেশ ভালভাবে কাটিয়া···প্রথমে ভিনিগার বা নেবু রসে ভিজাইয়া অথবা মাখাইয়া···হ্যাঁ কাটার পরই···

মনিব মহাশয় ইহাতে অবশ্যই অবাক, সুঘরাইএর প্রতি আপরাধীর ন্যায় চাহিলেন, যে এবং খুব সোজাই মৃদুস্বরে বলিয়াছিলেন,···বেচারীর পাখী-অন্ত প্রাণ !

স্বামীর এহেন নির্ব্বুদ্ধিতায়ে মনিব পত্নী ঝটিতি অপ্রতিভ হওয়ত, যাহাতে অভাগতরা না ক্ষুণ্ণ হন তন্নিবন্ধন অতীব তিক্ত শ্লেষে বলিলেন, ছাড়ুন ত ওঁর কথা, পাখী অন্ত প্রাণ না হাতী, অষ্টপ্রহর ওর পিছনে লেগে আছে আবার কথা, ওই মুখপোড়া ছোঁড়ার ভগনীপতিই যে বলে···বলে পাখীটাকে কাটবে ব'লে সাশায়, ও ভয় পায় এখন···তখন ছোঁড়াও হয়ত দেখব একটা ঠ্যাং খাচ্ছে···

আজই পাখীটিকে এমন হিস্ শব্দ ক'রে জাত সাপের শব্দ ক'রে ভয় দেখাচ্ছিল, যে আমার এবং ওঁর পিলে চমকে গেসল !···বল···অথবা আঁৎকে উঠি···খুব বকলুম ব'লে অবলা জীব তারে পোষাই বা কেন···কি বলবেন বলুন,···জাতে ওরা ডোম, ছোট জাতদের আবার মায়ামমতা···মন বলতে কিছুটি নেই···উনিও বললেন পূর্ব্বজন্মের পাপ হলে হাড়ি ডোম হয়, যে এবং তাঁহার স্বর ক্রমবিলীয়মান হইল।

মনিব মহাশয় বলিলেন, সত্যই বলুন ! হাড়ি ডোম উহাদের মন থাকিবে ইহা আশা করাই বাতুলতা···

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ও তদীয় পার্শ্ববর্ত্তিনীরা সরমে কুণ্ঠিত, আধোবদন ; মারাঠি সাড়ী পরিহিতা ও তাহার দিদি পর্য্যন্ত, যদিও তাহারা বঙ্গের বাহিরে প্রায় বাঙালীবর্জ্জিত স্থানে থাকে, তবু, যে সকলেই মলিন, যে সকলেই নিজেদের আড়ষ্টতা কাটাইবার মানসে সুঘরাইএর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এহেন নোংরা ধারায় বলার ভঙ্গী জীবনে শুনেন নাই, একমাত্র এখানে স'স টানের রাহিত্য থাকে ; অতএব তাঁহার ভিতরে প্রলাপ উদ্ভূত হইয়াছে, তাচ্ছল্য যে এমনও সিদ্ধান্ত করিলেন যে অন্তত সব সত্ত্বেও মনিব পত্নীর আরশোলা ভীতি আছে জানিয়া যে একদা তাঁহাকে মার্জ্জিত বলিয়া বিবেচনা তাঁহার হইয়াছিল,···প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বড় সুখী হইয়াছিলেন, নিজের সহিত মিল দেখেন, যে মনিব পত্নীরও একই ঘৃণা আছে।—তাহা মিথ্যা বালখিল্যতা, তথাপি সম্প্রতি কোনমতে যেন স্বগতেই তাঁহার ওষ্ঠে বাক্য স্ফুট হইল ! কি অসভ্য ! তৎসহ উহার গোষ্ঠির সকলেই সুঘরাই প্রতি নেত্রপাতে সমস্বরে মন্তব্য করিল, ওমা কি অভ্যাস ভাই !

অবশ্যই এবম্প্রকার উক্তি তাহাদের স্বীয় ইজ্জতের কারণেই বিশেষত করিয়াছিল। এবং, ঐ পদ প্রকাশের বৃত্তিতেও কিন্তু যে পূর্ব্বলব্ধ ভ্রষ্টতা যেমন তিরোহিত হয় না, এক ঘৃণা হইতে অগণন ছুঁৎমার্গে বিশালা ব্যক্তিত্বশালিনী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী উৎক্ষিপ্ত হইলেন, যে এরূপ সঙ্গীন অন্তপক্ষে যে তদীয় অভিভাবকত্ব অধীনাদের প্রতি তাকাইতে অসমর্থ ; ক্বচিৎ আপনার সূত্রের কথা মনে হইল যেন, ধীরে তিনি শিক্ষয়িত্রী-বিহিত রীতিতে মস্তক আন্দোলিত করত সকলকে একাগ্র করত অনেক কষ্টে আরম্ভিলেন, সিলি স্কাটাস ব্যাড !—যে এইটুকুতে তাঁহার হৃতমান ফিরিল, যে এই টুকুতেই ক্লান্তি বিদূরিত হইল, যে এই টুকুতেই প্রত্যয়ের সঞ্চার হইল। ঐ ছোট ইংরাজী পদ ব্যবহারে ভব্যতা সম্পর্কে তিনিই প্রথম সচেতনতা আনিলেন, যে অবশ্যই তিনি সদসৎ তত্ত্ব পর্য্যায়ে মনিব দম্পতিরে লইতে পারিবেন। সুতরাং সুঘরাইকে কেন্দ্র করা তাঁহার কোন অভিপ্রায় নাই—শুধু মাত্র তাহারে উপলক্ষ্য করিয়া সাজাইতেছিলেন যে ডোম বলিয়া ইত্যাদি ! কিন্তু অসাধনেই যেন বলিলেন,···আপনি না শুনিলাম, খাদ্যাখাদ্য বিচার করেন না···

অক্‌সো খাইয়া থাকেন, এবং যাহাতে এই উক্তি আঘাতরূপে না বুঝায় তজ্জন্য তাঁহার মুখে স্নেহপ্রযুক্ত হাস্য ছিল।

অউক্‌সো! কে বলিল···

আমিই সিদিন বল্‌ছিলুম, যে মুরগীগুলো সব মারা গেল হঠাৎ, রাতে কিছু নাই···সব্‌বাইকে খুঁজতে পাঠালুম; অবশেষে অক্‌সো···

* এ সময়ে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাঁহার সঙ্গের বালিকাদের বিশেষ সম্পর্কে কৌতূহল দর্শনে তাহা নিবৃত্তির মানসে নিম্নস্বরে কহিলেন, অক্‌সো···না বভরিল কোনটি বিফ ইন বুফ্!···আমার ত ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে, কোথায় দেখিয়াছি··· আ আমার বয়স হইয়াছে, রহ মনে করি, ইনসিওর ইট্ উইথ গিলেন-ডারস্··· সম্ভবত অক্‌সোই···কিন্তু ইহার পরক্ষণেই উৎরাই-নামার বেসামাল তাহাতে. কেননা ঐ অক্‌সো সূত্রে মনিব পত্নীর ভদ্রতা-ব্যভিচারিণী কথা তাহাকে জ্বরগ্রস্ত করিল।

এই বিষয়ে বিলাসিতা-বিরোধী স্বদেশী নেতার জবাব প্রথমে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর আরামপ্রদ বলিয়া বোধ হয় (যেহেতু প্রথমত ঐ ব্যক্তি মনিব দম্পতিদের বুজরুক বলিয়া থাকে ও তাঁহারা অত্যন্ত ধনী বিধায় খয়ের খাঁ বলে) তাই এই নেতাকে তিনি পছন্দ করেন—আবার অপছন্দ করেন খুবই, কেন না স্বামী বলিয়াছেন যে তাঁহাকে এ্যানারকিষ্ট দীননাথ জানাইয়াছে ঐ লোকটি নিজের ব্লক করিয়াছে, দুঃস্থ নির্ব্বোধ পত্রিকাওয়ালারা যাহারা ব্লক ছাপান উচ্চমানভাবে, তাঁহাদের দিয়া থাকে। এইভাবে সে জনপ্রিয়। লোকটি রাজনীতিবিদরা যেমন হইয়া থাকে, চরকা কাটে, অনেক গ্রামে প্রহৃত হইয়াছে, অনেক বন্যার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে···এ-ক্লাস প্রিস্‌জনার ত দূরের কথা কখনও বি-ক্লাসও নয়! এখন কোন এক মিউনিসিপালিটির ধাঙ্গড় নেতা, সে তাহাদের শোষণ করিতেছে, বলে পৃথিবীতে রাজা বলিয়া কিছু নাই! যুবতী দেখিলেই কাম-গোঁয়ার হইয়া উঠে! এই বিলাসিতা-বিরোধী স্বদেশী নেতা মনিব পত্নীর মুখে অক্‌সো গো-মাংস শুনিয়া ধিকার অঙ্গে কহিলেন, গরু খাওয়া ঠিক নয়···একে গরম দেশ, গরু মানুষের উপকারী···আমাদের দেশ···

ইহাতে মনিব পত্নী নিদারুণ অবজ্ঞায় মুখ ঘুরাইয়া লইয়াছিলেন, এমন যে তাহার সহিত তাঁহার বাক্যালাপে মানহানি ঘটিতে আছে, বিলাসিতা-বিরোধী স্বদেশী নেতা প্রস্থান করিল! তিনি এখন নির্লজ্জভাবে বলিয়াছিলেন···গরম দেশ ···উনি যেমন বলেন মেয়েছেলে সহ্য হচ্ছে আর গরু ত কি কথা···! সমবেত সকলে এই সরলতায় বিশেষ আমোদিত হয়। একমাত্র প্রধানা শিক্ষায়িত্রী ব্যতিরেকে, যিনি এখনও যুবতীর ন্যায় কণ্টকিত লাল হইয়া থাকেন। তিনি বড়ই অপদস্থ হইয়াছিলেন।

এখন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী কোনক্রমে ঐ বিষয় এড়াইতে খরতর হইয়া

কহিলেন,···কিছু মনে লইবেন না, আপনাদিগের তুল্য এত উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ মানে···যা বলিতে চাহি তাহা ইহা যে···ইত্যাকারে তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্লেষাত্মক হইতেছিল, ঝটিতি বলিলেন, আমাদের কাহাকেও ছোট ভাবিয়া বড় ভাবা··· মানে ঈশ্বর যাহাকে যেমন করিয়াছেন···কি উচিত···শোভা পায় না···

মনিব মহাশয় অত্যন্ত বাধিত হইয়া উত্তর করিলেন, আমার বাক্য আপনি মার্জ্জনা করিবেন – আমাদের এই চমৎকার ঘৃণা অবজ্ঞাটা থাকিতে দিন···

যে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী একদা নিঃসংশয়চিত্ত হইলেন যে মনিব মহাশয় নিজে আত্মসমালোচনা করিলেন, আবার একদা ভ্রূকুঞ্চিত তাঁহার হইল, অতএব কোন তত্ত্ব অনুমান নির্ঘাত তাহা অবধারণে তিনি মুস্কিলে, সম্ভবপর হইলে এই স্থান তিনি ত্যাগ করিতেন, তবু স্বভাববশত ব্যক্ত করিলেন, মানুষ কোন কদভ্যাস বা···আপনার ন্যায় ব্যক্তি এরূপ···

সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার মন্দদশা বুঝিয়া মনিব মহাশয় বিচলিত হইয়াও বলিতে উদ্যত হইলেন যে আপনি কি মদীয় জীবনী পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি স্তব্ধ।

এক্ষণ ধানিক শাসনের ভঙ্গীতে বিড়ম্বিত প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ব্যাখ্যা করিলেন··· উহাদের ডোম বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না···আমাদের কর্ত্তব্য উহাদের শিক্ষা দেওয়া···ক্রীশ্চান ধর্ম্ম বলে···আমরাও বলি মানুষকে সৎপথে চালিত করা··· বালককে···সে চপলমতি তাহারে শিক্ষা দিতে হইবে·যে পক্ষী হইলেও উহাদের সুখদুঃখ বোধ তথা প্রাণ আছে···এখন হইতে যদি শিক্ষা দিতে অবহেলা করি তাহা হইলে, একটু একটু করিয়া পাপ আত্মায় প্রবেশ করিতেছে!

মনিব মহাশয় তদুত্তরে, যিনি অবাল্য জানিতেন আত্মার ভগবান কি বলিয়াছেন তিনি আলস্য ত্যজিয়া মৌখিক বিনয়ে নিবেদন করিলেন,···সুঘরাইএর ভাবান্তর কোন আলোচনার বস্তু নহে,···ইহা অবশ্যই একশবার, আপনি যাহা যাহা বলিলেন তাহা অভ্রান্ত, তবে যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে বলি যে সুঘরাইএর উক্ত ব্যবহারে কোন আত্মসুখ নাই – সে নিষ্পাপ! উহা নিষ্পাপ! যেমত যেমন পিঠপিঠে ভ্রাতা ভগনীতে ঘটিয়া থাকে···আমি দেখিয়াছি ও নিজে পার্শ্বটিরে আঘাত করিয়া বলিতেছে, আমারে তুই মার না কেন?—তাহা ব্যতীত অন্য না,···জানিবেন ইহা খুনসুড়ীই, কেহ বলিতে পারেন যে মাত্রালঙ্ঘিত খুনসুড়ী, তবু ইহা খুনসুড়ী।—এবং ইহার সহিত যে তিনি শিক্ষিত যে তিনি চিন্তা করিতে পারেন ইহা যাহাতে সুস্পষ্ট হয় তৎপ্রবর্ত্তিত উত্থাপন করিলেন যে, ইহার মধ্যে সেই ঐতিহাসিকতার আঁশ নাই, কোন পাদরী মনে পড়ে যাহারে 'প্লেইজের ইল্লিসিট' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ইহা তাহা নয়!··· ইহা অতীব প্রাচীন মনুষ্য বা বালকস্বভাব মাত্র···দেখুন মনুষ্যে অনেক বিশ্রী বস্তুর সুন্দর নামকরণ করে, তেমনি উচিত ছিল এই সহজ সাধারণ স্বভাবের.

একটি বিশেষ নাম দেওয়া···তাহা হইলে···আমরা ইহার চরিত্র বা প্রকৃতি নিরূপণে নিশ্চিত হইতাম···সম্পূর্ণ পূর্ব্ব-কথিত সম্পর্ক···

চশমাটির ফ্রেমে টিক দিয়া প্রধানা শিক্ষয়িত্রী অল্প হাসিয়া অর্থ এই যে কাহারও বিদ্যার অভিমানকে চোট দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নহে, বটে আপনার যুক্তি অন্যায় মানিবেন না, বলা যায় পক্ষপাত অর্থাৎ···শূন্য নহে···(!) আপনি একটি অনৈমিত্তিক বৃত্তিরে র‍্যাসিওন্‌লাইজ করিতে চাহিতেছেন···আমরা দৈনন্দিন জীবনেতে···জীবনের মধ্য হইতে অনেক তত্ত্বাভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি, তখন সিদ্ধান্ত হইবে যে, কথিত ঐ প্রকার খুনসুড়ী বা তদর্থবাচক শব্দ যে কোন···যে কি পর্য্যন্ত বিঘাতক···উদাহরণস্বরূপ ভাই-ভাইএর তাদৃশ পরস্পরের প্রতি আচরণকালে কলহ এবং যে কলহের পরিণামে পরিবারের সকলেরই মর্ম্মপীড়ার কারণ হয়,···এইরূপে প্রতিবেশী ও সমাজে বিশৃঙ্খলতা···প্রতিবেশী আমরা দেখিব যে লঘুতা খেয়ালখুসী, বড়ই দুঃখজনক, বড় ব্যথার কারণ হয়···ঈশ্বর বড়ই···

···ক্ষমা করিবেন, যতদূর মনে হয় ভগবান উহার, সুঘরাইএর, জন্য লজ্জা পাইবেন না···আর যে, আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝায় উহারে আইন অনুগ করা—এবং যুগপৎ,···দেখুন দেখুন, দেখ দেখ সম্বোধনে আপন সহধর্ম্মিণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, সুঘরাইএর প্রতি তদীয় গাত্রে জামা সত্বে ইহা ওতপ্রোত যে সে প্রজলিত কিছু শিখা সকল, তিব্বতীয় টঙ্ক যাদৃশ তেমনই, এখন ডিগ্‌রিয়া একদিকে, সূর্য্য তাহারই কিরণমালা, সুঘরাইএ প্রতিফলিত! মনিব মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন, তাজ্জব সেই মনে হয় প্রজলিত ও দুঃখিত,···দেখুন উহার বা উহাদের ভগবান নাই।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এবম্প্রকার উক্তিতে অত্রাহি হইলেও, তাঁহার অধীনারা বিমূঢ় হইলেও, সকলেই এককালে সুঘরাইকে লক্ষ্য অভিভূত, ক্রমে তাহারা সকলে চীৎকাঠের বাধা, ও অগণন তালবৃক্ষ সিজেল জাতীয় বৃক্ষ (!) মহিমা অনেক সম-বিসম ইদানীং ফলসা-টে জমির পিছনে ডিগ্‌রিয়ার দক্ষিণে মারচস্ সূর্য দেখিল! তাহারা বিমোহিত। ইহাদের মধ্যে পার্শী সাড়ী পরিহিতা সম্ভ্রান্ত সৌভাগ্যবতী যুবতী কহিল,···যে ঈশ্বর আছেন তাহা উহারে···জ্ঞাত করা বিধেয়···আঃ ঈশ্বর বলিয়া সে আপনকার উত্তমাঙ্গ বড় নিশ্চিন্তে অলৌকিক নির্ভাবনায় রিষিয়ার বৈভবের চারিদিকে ঘুরাইল। সে নিকটে ছিল, সুতরাং বৈকালিক প্রসাধনে ব্যবহৃত জলসেকের আর্দ্রতার এখনও, এত ভ্রমণেও, চাকচিক্য প্রতীয়মান, পার্শী কায়দায় সে বড় দূরে ছিল, তাই সে অদৃশ্য।

তাহার ঐ বাক্য মনিব দম্পতি, যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসে অন্ধ, ভগবান বলিতে যাঁহাদের নয়ন সজল হয় তাঁহারা সমস্ত সৃষ্টি হইতে হস্তদ্বয় তুলিলেন, মনিব পত্নী গললগ্নিকৃতবাস হইলেন, আপন আপন জুতা ত্যাগ করিলেন ও বক্ষস্থলে কর-জোড় স্থাপন করিলেন। তাঁহারা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। অতঃপর

এবং ঐভাবেই মনিব মহাশয় বলিলেন, আমার ধ্রুবজ্ঞান যে বালক আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস আপনি বহন করিতেছে।

মনিবপত্নী তদীয় সমৃদ্ধ পুষ্ট দেহ দুলাইয়া এদিক সেদিক নজরের পর শান্ত স্বরে সুঘরাইকে আজ্ঞা করিলেন, আ মোল যা ছোঁড়া, সন্ধ্যেবেলা বলেছি না স্থির হয়ে থাকতে হয়, এত ঘুগঘুর করছিস কেন···কাছে কাছে থাক না—ইহাতে এই শেষোক্ত পদে ইনি হয়ত কিছু ব্যক্ত করিলেন—এখানে আয়···ও লজ্জা কচ্ছে বুঝি, বুঝেছি খবদ্দার পাখীটারে কষ্ট দিস নি···শুনলি ত ওতে পাপ হয়।

এবদ্ভূত অভিযোগে, সুঘরাই বটেই যে নিগৃহীতই, যদ্যপি যে সে সহজ হইতে উন্মুখ, কিন্তু সে আপনাকে প্রকৃতই শান্ত রাখিতে লায়েক না, সে অসংলগ্ন হইয়া আছে, সে মনিব পত্নীর উপর যারপরনাই তাক্তবিরক্ত হইতে সাহসী হইয়াছে, নিশ্চয় সে ভাবিয়াছে যে এত লোকসমক্ষে তাহাকে হেয় করা (!) সঙ্গত হয় নাই ও তৎপ্রভাবে সে দূরে থাকে, এবং সপক্ষে এই কথাই তাহাতে উত্থাপিত হয় যে সে বিবেচনা করে যে, যে কেন এই শালা!—এবং এই শালা উচ্চারণেই সে সচেতন যে তাহার কোথাও এতক্ষণ গর্ব্ব হইতেছিল—অর্থাৎ আপন পাখীর কারণে ঐ গঞ্জনা তাহার গৌরব—যে সে আত্মপ্রসাদে, যাহা এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায় যে, তবু ত অর্থাৎ তবু ভাল ইহা যে সে তদীয় পক্ষীর হেতুতে কথা শুনিতে আছে! পুনরায় সুঘরাই আপন পক্ষীর দিকে নজর রাখিয়া ইহা যেন কহিতে লাগিল যে—

এই শালা, এখন, যে, এই বিরাট জবা টিলায় ঘুরিতে ফিরিতে আছে শালা, তোমার জান না বড় খচ্চড়, কিছু দিন পূর্ব্বে আমি যখন খাঁচার কাঠি বদলাইতে সারাইতে কাঠি চৌরস করি, একনিষ্ঠভাবে মোহিলির দেওয়া মন্তর উচ্চারণ করিতেছিলাম, যদি না করি তাহা হইলে, ভূত খাঁচার কাছে আসিবে; ভূত খাঁচায় ঢুকিবে—উহাকে বধ করিবে,···আমি যে কত উহারে ভালবাসি···আমার তিতির তখন আমার কোলেই বসিয়াছিল, মন্তরের মাঝে মাঝে আমি তাহার সহিত গল্প করিতেছিলাম, আশ্চর্য্য যে সে আমার কোল সে নোংরা করে নাই, আমার হাতে ধারালো ছুরি, বাঁশ ফাড়িয়া দুই একটি কাঠি সবে মাত্র তৈয়ারী করিয়াছি হঠাৎ এমত সময় পাখী নড়িতেই আমার এই আঙুলটি কাটিয়া যায়, যে অনেক রক্তপাত হইল, আমার পরনের বস্ত্রে কিছু পড়িল,—অনেক অনেক মেজেতে; আমি লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলাম, আমার এত আদরের পাখী শালা কিছুই বুঝে না; পাখী দূরে দূরে অবশ্য আমার দিকে চাহিয়াছিল, শুনিয়াছি··· পাণ্ডাঠাকুরের ময়না পাখী পাণ্ডাঠাকুর মরিতে অনেক কাঁদিয়াছিল, দু-তিনদিন কিছু গ্রহণ করে নাই, শুনিয়াছি বদরী বাবুর কুকুর তিনি মরিতে পাগল হয়।···. দেওঘর হইতে দারগা আসিয়া তাহাকে গুলি করে! বেচারী।—,অনেক রক্ত দর্শনে আমার ঘোর উপস্থিত, আমি আঙুল চাপিয়া বসিয়া পড়ি, প্রথমে পাখীটি

আমার সেই পতিত রক্তের উপর দিয়া নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়, মেজেতে অনেক পায়ের রক্তাক্ত ছাপ অবলোকনে আমি ভীত হই—আ নাট্যকাররা কি সুদক্ষ কি চতুর, এহেন ভীতিকে চমৎকার স্বগত উক্তিতে রাখিয়া থাকে !

তাদৃশ সদ্য রক্তাক্ত ছাপ সকল বিস্ফারিতনেত্রে সুঘরাই দেখিতে থাকে, সে যেমন যে ইহা গণনা লিখিবে, ঐ এলোমেলো মুদ্রণে তাহার জিজ্ঞাস্য ছিল অঢেল, কিন্তু সে আর স্থির থাকিতে পারে না, সবেগে বাগানে গিয়াছিল দ্রুতই, কিছু গাঁদাপাতা আহরণ করত ক্ষতস্থানে চাপিয়া, ঐ কথিত স্থানে ফিরিয়া আমি বজ্রাহত, তাহার মাথা আপনা হইতে আনত হইল, যে সে যেমন উচ্চবর্ণসম্ভূত, সে ডোম নহে, কেন না ছোটজাতদের মস্তক কখনও আনত হয় না, তাহার বেচারী নেত্রপক্ষ ভারাক্রান্ত হইল, তখনও সে হতবুদ্ধি সে তটস্থ, যে তাহারই রক্ত তাহারই প্রাণাধিক প্রিয় পক্ষী খানিক মস্তক কাৎ করত অপূর্ব্ব শোভতে চঞ্চু দ্বারা রক্ত পান করিতে একমনা, ক্রমে তদ্দর্শনে সুঘরাই শনৈশ্চর হইল, চক্ষুদ্বয়ে জবাবর্ণ দেখা দিল, যে সে উঠানে মৃত্তিকায় দানবীয় ক্রোধে পদাঘাতে আপনারে জাগ্রত করিল, যে সে ঢেলা তুলে নাই, শুধু দৌড়াইয়া গিয়া দুশ মরন্ত জোরে লাথি মারিল ; এই রক্ষা যে লাথির সবটা অর্থাৎ পায়ের পুরা চোট, উহার গায় লাগে নাই, তাহা হইলে, বেচারী পাখী তৎক্ষণাৎ প্রবল বেগে উৎপাটিত উৎক্ষিপ্ত হওয়ত দেওয়ালের সংঘাতে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইত ! এখন লাথির স্বল্প ঘা'য়ে পাখীর দু-চারটে পালক খসিল, আর যে পাখী ত্রাহি চীৎকারে এক কোণে যাইল, কম্পিত ছিল ; ঐ আতঙ্কিত পক্ষীর ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদ অনুরূপ তাহারও কণ্ঠে ধ্বনিত আপনা হইতেই অগোচরেই হইতেছিল, আপাততভাবে মনে হয় সে যেমনবা ভ্যাংচাইতেছে ; এবং সুঘরাই নিজ বেগে বেসামাল হওয়ত, সশব্দে পতিত হয়।

ঐ শব্দে মনিব পত্নী দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা উত্থিত হইয়া ঐ স্থলে যাইয়া এবং তখন সুঘরাইকে ছুটিতে দেখিয়া ও তৎসহ রক্তাক্ত মেজে প্রত্যক্ষে হা হা রব করিয়া উঠিলেন, তাঁহার মাথা কেমন করিয়া উঠিল, তাঁহার মাথা কেমন করিয়াছিল, তথাপি জিজ্ঞাসিলেন—ওরে এত রক্ত কোত্থেকে এল সব্বনাশ, তোর পাখী কৈ রে···কিরে অমন হাঁ দাঁড়িয়ে আছিস···পাখী কৈ···শব্দ হল কিসের—তোর কাপড়ে রক্ত কি সব্বনাশ !

সুঘরাই আনুপূর্ব্বিক সকল কিছুর বিবৃতি দান করিল না।

সত্বর ফার্ষ্টএইড বক্সটি লইয়া আসিয়া তাহার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করিলেন, সুঘরাই আইওডিনে লাফাইতে লাগিল, মনিব পত্নী তখনও বিস্মিত হইয়া আছেন, বলিলেন, বেচারী তোর দুঃখেই বুঝি অমনধারা ক্যাঁক্যা করে উঠল ! আমি বলি বেড়াল টেড়াল···

সুঘরাই এখনও দারুণ রোষদগ্ধ, তাদৃশ বীভৎস কদর্য্য দৃশ্যে সে মতিচ্ছন্ন,

তাহার ওষ্ঠ কাঁপিতে আছে, প্রকাশিল যে,···বেড়ালে ধরিলে খুব ভালই হইত, ঐ পক্ষী রাক্ষসী, উহাকে আর সে পুষিবে না···উহা রাক্ষুসী ভূত পেত্নী···আপনি শুনিলে বিকল হইবেন যে, উহা আমার রক্ত নির্ঘন্ধ মনে মাড়াইল, ঐ দেখুন সারা মেজেতে উহার রক্ত লাগা পায়ের দাগ, তখনও কিছু বলি নাই, দেখিলাম সে আমার রক্ত খাইতেছে, আমি রাগিয়া যাই আমি লাথি মারি আমি পড়িয়া যাই ! উহা পেত্নী মনে হয়···এই বার তাহার চোখে জল আসিল।

স্নেহময়ী মনিব পত্নী তাহারে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এইরূপে যে, তুই ছোঁড়া মহা পাগল,···দেখছি সাক্ষাৎ পাপ তুই···যা আগে কাপড় ছাড়···ফের যদি করিস তোর কান ধরে বার করে দেব – পরে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, দেখ দেখি কি কাঁপছে বেচারী, তুই না ওকে দারুণ ভালবাসিস···ওর কি জ্ঞান আছে···ও সব করবে, তুমি তাতে ছাড়বি কেন···তুই না বলিস মা আমাকে তি তি করে ডাকবে আমি আসব···তুমি না সিরিয়া পাহাড়ে ওর নাম লিখবি···ছোঁড়া উনি শুনলে তোকে আস্ত রাখবেন···তোর পাখী হারাতে উনি না খুঁজতে যান, কতগুলি নষ্ট হল (অবশেষে মল্লিক লজের পশ্চাতে ভাঙা বাড়ীর কাছে যখন গুলি ছোঁড়া হইল তখন– তিতির কোথা হইতে বাহির হইয়া উড়িল,– এবং একজন যুবক ও যুবতী, ইহাদের মুখ পাংশু ছিল। যুবতী শুনি, দুল হারাইয়াছিল, তাই খুঁজিতেছিল)···ওর গায়ে পা দিলি ! নমস্কার কর ছোঁড়া, ওতে না ঠাকুর আছেন ?···জানিস ওদের চোখেও জল আছে, নে ছোঁড়া নমস্কার কর শিগ্‌গীর।

সুঘরাই আপনার পক্ষীরে নমস্কার করিল। তিতিরটি গ্রীবা তুলিয়া সুঘরাইকে দেখিতে আছে। সুঘরাইএর দেহ সুমহৎ বেপথু পেলিয়া উঠিল, একদা শ্রাবণের ঘোর শ্যামবর্ণ মেঘের নিকট সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সে পাখীটিকে বুকে রাখিবে, সে পিঙ্গল-রক্ত রজস্বলার স্রোত স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সে পাখীকে বুকে রাখিবে, যে সে গম্ভীর অশ্বত্থ বৃক্ষের নবোদ্গত পত্র স্পর্শে প্রতিজ্ঞা করে যে সে উহাকে বুকে রাখিবে !

প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কন্যা তেমনই শান্তকণ্ঠে তাহার মাতাকে অনুজ্ঞায় জানাইল, মা গো, এই সুন্দর স্থানে তুমি, মারভিলের সেই 'অন এ ড্রপ অফ ডিউ', কি মায়াময় স্থান ইহা হয় যে – একবার বলিলেও মনে হইল সে যেমন বা এক বক্তব্য তিনবার বলিতেছে।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঐ প্রশংসায়ে ছেলেমানুষ হইয়া থাকেন, সগর্ব্বে ঝিটিতি কহিলেন,···তোমরা পড়িবে আমি শুনিব – এবং তখন সুঘরাইকে নিকটে আসিতে দেখিয়া কিয়ৎ তাঁহার সারমর্ম্ম নীতিসূত্র করার বৃত্তি হইতে, খানিক পূর্ব্ব-তর্কসূত্রে নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে, অবশ্য ইনি ঈষৎ খুসী ছিলেন যে, মনিব মহাশয় তর্ক নিয়ম অনুযায়ী করিতে পারেন নাই, মাত্র নিজের জাত্যাভিমান, যদি তাহা ব্যক্তিত্ব হয় – তাহাই – ব্যবহার করিয়াছেন, আরও যে তিনি

প্রমাণিতে চাহেন, মনিব পত্নীর নাকছাবিতে হাত দেওয়া, যে তাঁহার নাকছবি নলক দাগ নাই, আরও, আর যে তাদৃশী বিতর্ক তাহার ভাল লাগিতেছিল— তৎপ্রভাবিত সংজ্ঞাভূত করিলেন,···নিশ্চয় মানিবেন—কোন প্রাণী বিশেষত··· এই সব জিনিষ পোষা ভাল নয়···সেদিন যেমন উনি বলিতেছিলেন···মনে পড়িবে।

'সেই সাঁওতাল নাচের দিবস! আর প্রধানা শিক্ষয়িত্রী যিনি বসন্তের হাওয়াকে নির্দ্বন্দ্বচিত্তে শাসন করিতে পারেন।

বেশ তফাৎ, এই বাড়ীর যেখানে কুঞ্জ গোছের, ছিটকান আলোয় দেখা যায় সাঁওতালরা পুরুষ-রমণী মিলিত সমাবেশ, চুটার ধোঁয়া উত্থিত, মহুয়া তাহারা যেন চর্ব্বণ করিয়া খাইতেছে! ঘুমন্ত মুরারী ঐ শিশুকেন্দ্রিক গুলজার—যেখানের আধ-গদ্-আপ্লুত স্বর শুনিতে আছেন, কিন্তু উহা ছাপাইয়া তাহাতে পরিতোষ বাবু যিনি তাঁহার স্ত্রীর দক্ষতা বলিতে ক্রমশঃ একস—তথা যে পুরুষ, রমণীর রহস্যময় বৈপরীত্যপরতন্ত্র মুগ্ধ বিহ্বল; ত্রাস-মিশ্র-শ্রদ্ধায় যে সদাসর্ব্বদা আছে সেই সেই ব্যক্তির ওমরানী ধরনে—তিনি বিশদে বলিতেছিলেন, আমার স্ত্রী, নিজে ভুবন বাবুর মেজমেয়ে, ছেলে হওয়ার আগে খুব পাত খোলা চিবাইত; খুব চট সেলাই করিতে পারিত—তাঁহার পরম সুন্দর পুত্র হইল, এই পুত্রের আঁতুড়ের পাশে আমার স্ত্রী নিজ হাতে চমৎকার দোয়াত কলম তালপত্র রাখেন—এই দোয়াত কলম তালপাতা আজও মদীয় গৃহে আছে—হাঁ···রাত্র যখন নিস্তব্ধতি—এক চমৎকার ফুলের গন্ধে তাঁহার তন্দ্রা কাটিয়া যায়, দেখিলেন এক তেজের সংহার বিধাতা পুরুষ! মদীয় স্ত্রী বুদ্ধিমতী, প্রণাম অন্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভু মানুষে এত কষ্ট পাইয়া থাকে কেন! বিধাতা পুরুষ কহিলেন—যে সে জন্মায় এই কারণে।

আশ্চর্য্য যে পরিতোষবাবু কদাচ 'বলিলে বিশ্বাস করিবেন না বা পৃথিবীতে কত কি ঘটে আমরা কি জানি' ইত্যাকার বচনে কৈফিয়ৎ কভু দেন না। মন্তপ মনিব মহাশয় আপ্লুত স্বরের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিলেন—দেখ জামি কি দারুণ চৌরস হইতেছে, এক অভিনব স্থাপত্যের গড়ন ও ভাঙ্গন পুনর্নির্ম্মাণ হইবে··· ভাগর নৃত্য হইবে! সুঘরাই তুমি খুবই ভুল করিয়াছ, যাও পক্ষী লইয়া আইস, সেই এ-ই আঁকাল নৃত্য দেখিবে। ভয় পাইও না···কুকুর তোমার পক্ষীরে কিছু বলিবে না···

সরসীবাবু যিনি মামলায় প্রিভি কাউনসিলে তিনি জিতিলেও তিনি বা তদীয় পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাহাদের অট্টালিকার মর্ম্মর বিক্রিত হইয়া সুদূর সিংহলে গিয়াছে—বিনামূল্য রাবিশ দেওয়া হয়। এখন বাগান করেন, ইহার নিকট পরিতোষবাবুই, কেহই একস-রূপে পরিণত হয় না, ইনি সেই বিধাতা পুরুষের দুর্ব্বল উত্তরে হাসিলেন, তখনই শিশুকেন্দ্রকে ভাঙ্গিয়া দ্রুত পদে যাইতে প্রত্যক্ষ

করিলেন। ইনি উদ্ভট অপ্রাকৃতিক, যে অথচ ইনি সুপুরুষ যে এবং একাহারী! সকলকেই চিঠি লেখেন।

লোহার গেটের ছায়া গ্রাভেলে, অরকেরিয়ার গাছ হইতে মাগনোলিয়া-গ্র্যাণ্ডিফ্লোরাতে—আঃ মাগনোলিয়া কি অদ্ভুত কৌশলে তাহার পাপড়ী মেলিয়া থাকে—এ কারণ যে এই বাড়ীর গেট আগে-পাছে করিতেছিল! এ কারণ যে একটি সুকুমারমতি বালক, নবম বর্ষীয় যে মাত্র, গেটের পাল্লার সর্ব্বনিম্ন বাতায় পা রাখিয়া, পায়ের দ্বারা ঠেলিয়া দুলিতে আছে, গেটে হাঁস-কলের করুণ শব্দ উত্থিত হইতে থাকে, তৎসহ মাঝে মাঝে অন্য মৃদু সুখকর্ষী শব্দও আসে যাহা একটি চাবির সংঘাত, যাহা বালকের গাত্রের দোছুটিতে লগ্ন আছে, যেহেতু কয়েক দিবস হয়, বালকের পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে, এখন যে এখানে; উৎসবের মধ্যে যাইতে তাহার মন সরে নাই, সকলে যখন সমীপে, যখন সকলে আপন আপন উচ্ছ্বাস-উদ্গমের নিমিত্ত সবিশেষ অপ্রতিভ, যখন সকলেই কথঞ্চিৎ বিমূঢ়, তখনও বালক পাল্লাতেই! গরাদের অন্যপার্শ্বে তদীয় দুঃখ-চাবকান মুখখানি বড় সুন্দর, বড় ক্লেশ অন্যদের দিতেছিল; সকল সম অভিব্যক্তিতে উর্দ্ধে তাকাইয়াছেন, ঐ ইউক্যালিপটসের চামর পাতার আরও উর্দ্ধে, পুনরায় দৃষ্টি আনত ইহাদের, সমস্বরে বলিলেন, বেচারী, হায় ভগবান!

একান্তে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আতঙ্কিত মনে তর্ক তুলিলেন,···ইহা খারাপ, এই হয় প্রকৃতই নিষ্ঠুর! ছোট ছেলে, দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়, ঐই নির্দ্দোষ শিশুকে এহেন বস্তু···উহাকে দোষী করা···ঔচিত্য দেখি না···কবে আমাদের দেশ হইতে এই সকল যাইবে! আশ্চর্য কোন ভদ্রলোক নামটা করিব না (মনিব মহাশয়) বলিয়াছেন, আমাকে ব্রাহ্মণ ভোজনে উহারা বলিতে চাহে, আমি নিশ্চয়ই যাইব···কি হৃদয়হীন!

কয়েকজনের, নারী ও পুরুষ, সত্যই ঐ লৌকিকতা যে নির্দ্দয় এমত বুদ্ধি হয়, তাহারা সত্রাসে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর প্রতি গভীরভাবে চোখ মেলিয়াছিলেন। তৎকালে গৃহকর্ত্রী আপনার ঘোর ছাড়িয়া, মধুর স্নেহযুক্ত কণ্ঠে জানিতে চাহিলেন, ও মা তুমি হঠাৎ।

হ্যাঁ আমাদের চাকরটি বোকা কিনা, তাই মা বলিলেন তুই যা উহার সহিত, ঐ জঙ্গলী 'স্পিরিট' কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারে নাই—এই বল ত স্পিরিট! দেখুন কি মজা হয়···এই বল না···।

এই সরলতায় সকলেই অত্যধিক শোকে নিমজ্জিত, যে সকলের বক্ষদেশ আলোড়িত হইল, আঁখি নিষ্প্রভ ও যে সজল হইল, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী যিনি আপন উক্তি কারণে এতাবৎ কিন্তুতে, যে তাঁহার কথার সারবত্তা, বালকের চাপল্যে (!) অর্থ-সামঞ্জস্য লাভ করিল, ফলে কপালে বিকার নাই, অবশ্য তিনিও সন্তপ্ত হইলেও তাঁহার কণ্ঠে, ইহা হয় খারাপ, ইহা হয় অমানুষিকতা, আওয়াজে ধ্বনিত!

অথচ ইহা অচিন্তনীয় যে চোরা খুশী, যে ঈদৃশ এক বর্ত্তমানতা এখানকার ফাজলামি হইতে রক্ষা করিবে, ইহাতে প্রশ্ন হয় কঠিন কি তিনি, তাঁহার কন্যাদ্বয় ঈষৎ বিমূঢ় হইয়া তবুও ছিল।

বালকের এক হাত উত্তোলিত ছিল, উহা গরাদ ধরিয়াছিল, সে কহিল, নাচ হবে বুঝি···আমি নাচ বড় ভালবাসি, আমার বাবাও খুব নাচ ভালবাসিত, মাও ভালবাসে আমি ভালবাসি নাচ···নাচ···কতক্ষণ হইবে···রাত্র বারোটা অনেক রাত পর্য্যন্ত আমি জাগিয়া থাকিতে পারি···।

সকলেই নিম্নস্বরে, 'বেচারী' উচ্চারণ করিল। আবার সকলেই ভারী পদক্ষেপে গেট হইতে ফিরিয়া আসিতেছে; যাহারা বিলিকে ঘিরিয়া তাহারা এহেন পদধ্বনিতে সচেতন, তাহারা ঘাড় বাঁকাইয়া পশ্চাতে নেত্রপাত করে! ইহাদের মধ্যেই জনৈক ভদ্রলোকের হাতের অন্যমনস্কতায়ে কত ছড়ির এলেবেলে আওয়াজ গ্রাভেলে সংঘাতে হইতেছে, যুগপৎ আরও অন্যান্য হস্তের ছড়ি লাঠির উৎসাহহীন ঘটিল। সহচরীবৃন্দ এই সূত্রে অবলোকনিয়াছে যে নাচের জন্য মাঠ চৌরস করা চলিতেছে, এই ব্যক্তি কপাল হইতে ঘাম অপনয়ন করিল, উহার পশ্চাতে জল-পানের ত কালী।

নাচ হইবে। মাদলের আওয়াজ আসিতেছে, মদ চলিতেছে! অভ্যাগতরা সকলেই এখন অনবরত একটি পদ মুখস্থ করিতেছিল, 'পেট ত ভর'ল মহন ভর'ল না হে'—ইহা সাঁওতাল সর্দ্দার মহুয়া খাইতে খাইতে বলিয়াছে; চিঁড়া গুড় তাহারা পেট ভরিয়া খাইয়াছে, কিন্তু মদের অভাব! তাই মন ভরিয়া উঠে না। সাঁওতাল কথায় ঐ সংজ্ঞা ওষ্ঠ হইতে ওষ্ঠান্তরে! বাবুরা উহা প্রতিধ্বনিত করে, বাতাস ভারী হইতেছিল, যে সাঁওতাল রমণী বক্ষবস্ত্র সামালিয়া বাঁকিয়া জল, স্বচ্ছ জল পান করিতেছিল! সে তির্য্যকে চাহিল। সরসীবাবু সম্ভবত মনিব মহাশয়কে উপদেশ দিলেন,···আজ্ঞে এংগস্টুরা বিটরস মিশ্র মহুয়া আপনি ট্রাই করিয়া দেখিতে পারেন···ভাবা যায় না! এই সেই সরসীবাবু, তখনি অতীব উদ্ভট!

আমার স্ত্রী, মহাশয় বলিয়াছি ত, একপ্রকার উন্মাদ, সেইবার শিমুলতলায় এক কাণ্ড ঘটে, আমাদের বাড়ীর পাশেই নাম বলিব না এক সংব্রাহ্মণবংশীয় ভদ্রলোক বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার এক কন্যা মাত্র পঞ্চদশবর্ষীয়া, সে পরমা-সুন্দরী রাজার ঘরে পড়িবার মতই, বিবাহের চার মাসের মধ্যে সে শাঁখা ভাঙে, এবং যে এই কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার মাতাও পান ও মৎস্য যাবতীয় বিলাসাদি ত্যাগ করেন। বেচারী সত্যই হতভাগিনী! পুত্রসম্ভবা ছিল। পুত্র জন্মিল, আশ্চর্য্য এগারো মাস সাত দিনের দিন, আমার তখনই বিশ্বাস ধ্রুব হইল, এ কোন মহাপুরুষ! আমার স্ত্রী খালাস করিবার পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিলেন, মুখে, কি দেখিলাম কি দেখিলাম, এই ছিল, তখন রাত্র অনেক, আমি কুয়ো হইতে জল তুলি, তিনি স্নান করেন, এই জলধারার মধ্য হইতে জাপন

করিলেন – মহাপুরুষ ! আমি দেখিয়াছি কপালজোড়া হীরা জলজল করিতেছে, আহা আমি মধু দিয়াছিলাম, হায় তিনজন যমদূত আসিল, আমারে ধাক্কায় দূরে সরাইল ! সময় পার-হওয়া সন্তান যতই শ্রীমণ্ডিত হউক, ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক ঘরে রাখিতে ভরসা পান নাই। আমি মহাশয় জানি, তিরশি এগারং তিনশো তেত্তিরিশ প্লাস সাত, তিনশো সাইত্রিশ, এইবার আসুন তিন তিন সাত হইল, এইবার যোগ দিন। কত ? তেরো ! তেরো দারুণ শাস্ত্রসম্মত পয়া শুভ সংখ্যা ! মহাপ্রভু নিজেই···আচ্ছা···ঐ যমদূতরা বনেতে যখন হাঁড়ী রাখিল, যমদূতগুলি বিস্ময়াবিষ্ট হওয়ত দেখিল, হাঁড়ীর সরা আপনি খুলিয়া গেল, দেখিল যে : মণিময় এক শিশু উঠিয়া দাঁড়াইল ; দেখিল যে, ঐ তাহাদের মানে যমদূতদের প্রতি মৃদু হাসিয়া অনেকানেক রকমের আলো বিকিরণ করত গভীর বনের মধ্যে।

সহচরীবৃন্দ তখন নৃত্য অঙ্গন প্রস্তুতি দেখিয়া পুনর্ব্বার বিলির দিকে ; যে এবং শ্রদ্ধায় গভীর হওয়ত এতাদৃশ্য অভিব্যক্তিতে একে অন্যে নয়ন মেলিয়াছে, যাহাতে বলিয়াছে, আমরা লাভ ম্যারেইজ শুনিয়াছি, আমরা বিলিকে শুনি নাই! আঃ বিলি আশ্চর্য্য বিলি আশ্চর্য্য বিলি আশ্চর্য্য ! উহার জন্য যে যে যুবক আত্মহত্যা করিয়াছে, আঃ বিলি ! আত্মহত্যার খবরে বিলি হুঙ্কার দিয়াছে, প্রেম-কাতর মার্জ্জারের ন্যায় তাহাতে স্বরভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে, পুলিশ ইন্‌সপেক্টার বলিয়াছে ডেপুটি কমিশনার এইচ. কিউ তোমাকে দেখিতে চাহেন, তুমি নিদারুণ ! ইংরাজ ডেপুটি কমিশনারের সিগারের ধোঁয়ায় বিলি অস্বস্তি বোধ করে নাই, কেননা সে হয় ক্যালচারড, তাহারে দেখিয়া ঐ ধোঁয়া নিপট হয়, তিনি বলিয়াছেন···পর পর আত্মহত্যা ! বিলি তুমি বাবিলন মানে অশোকের সময় ফিরিয়া যাও ! এ শতাব্দীতে তুমি অত্যধিক, বিলি বিলি বিজ্ঞান আমাদের বিস্ময় অপহরণ করিয়াছে ! জীবনধারায় এমন কোন কূট-আতঙ্কও নাই ! আমরা গোবেচারা। তোমার মর্য্যাদা আমরা দিতে অপারক !

আঃ লাভ ম্যারেজ আমরা শুনিয়াছি, আমরা কখনও বিলিকে শুনি নাই !! একাবলী ছন্দে ঈদৃশী বাক্য বলিতে সাবেক পরিবারের কুমারীগণ তাহারা এক উপত্যকায় গিয়াছে এবং হর্ষ পুলকিত।

ওগো পুণ্য নগরী কলিকাতা ! গঙ্গা বিধৌত শ্রীশ্রীকালিমাতা আশ্রিত, ভগবান রামকৃষ্ণ পদ-ছোঁওয়া তুমি, ধন্য নগরী কলিকাতা ! উচ্চবর্ণের অভিজাতবর্গের কলিকাতা ! বিলিকে ক্ষমা করিও, আর যে প্রকৃতিরে অনুনয় করিও সে যেন বিলির প্রতি দয়া রাখে !

এই সেই সরসীবাবু, যাঁহার মুখমণ্ডল ভাসা-ভাগবৎ পাঠকারীকে বিভ্রাবিত করিবে, অবশ্য যদি নিম্ন স্থানাৎ আলো আসে। ইনি মুরারীবাবুকে দেখিলেন। তখন, মুরারীবাবু তেমনভাবেই ঘুমাইতে আছেন, যদি ঘুম ইহা, যে, কোন মুহূর্ত্তেই অথচ উঠিয়া ইনি হাসিয়া কহিবেন, আমি জাপানের সূর্য্যাবৎ-শীঘ্র

রাজপ্রাসাদ অন্তর্গত পিড়কির বাগানে জাফরান পদ্ম ফুটিতে দেখিয়াছি, আহা হরিদ্রা! তোমার মননে আমার চক্ষু জলভরা হউক! অয়ি আমার মহত্ব! যে এবং আশপাশে দৃষ্টি সঞ্চারে ইহা তাহার অনুমান হইবে যে নাচ এখনও আরম্ভ হয় নাই! আর যে পর্যাবেক্ষণ করিবেন অলোকা তেমনই ভাবে দণ্ডায়মানা। এবং যে অন্ত ধারে, শালা রাজনৈতিক-কবন্ধ, শালা, যে ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় চরিত্র, যে রুমাল্লা বিন্যস্ত করিতেছিল, ইহারই এই ব্যক্তির কারণে এই ছোট ধরিত্রীতে অনেক রমণী অনাদৃতা হইয়াছেন! ইহার লালামিশ্রিত বলদ হাসি হাসি কীদৃশ নীচযান! সেই দুর্বৃত্তের শব্দাবলীতে নারী, জাতি, শোষণ শব্দ আছে, সে ভাবে অভিজাতরাই গোঁড়া অপ্রাকৃতিক এবং সে নিজে কৃত বিশ্বাস করিলেও, ভগবান নাই, ইহা জানে! এখনও নাচ আরম্ভ হয় নাই; রাজনৈতিক-কবন্ধ ক্রমশঃ বিকলাঙ্গ হইতেছে! সাঁওতালগণের চিঁড়া খাওয়া দর্শনে তাঁহার জিহ্বায় জল আসিল, অথচ এই ব্যক্তি প্রতি প্লেট হইতে কিছু না কিছু খাইয়াছে. বলিয়াছে অপচয় অন্যায়। সে সাঁওতাল রমণীদের সান্নিধ্য চায়।

ঐ সেই সরসীবাবু, যিনি স্যর পি'র বহু গল্প জানেন: দেওঘর ষ্টেশনে স্যর পি··· খাস বেয়ারা আবদুল হাতের ঘড়ি দেখিয়া কহিল, মেরী বাবা অলোকা টায়েম হইয়াছে, আমি কি হুজুরকে ঔষধ দিব। কেননা স্যর পি···স্নায়ু পীড়াগ্রস্ত: ইনি বুনো ফুল ফুটুস গাছের সমীপে বহুসময় যাপন করেন, কেহ তাঁহাকে বলিয়াছে উহার গন্ধ স্নায়ুকে সমতা দেয়। যে সেই দিবস দেওঘর ষ্টেশনের ফার্ষ্ট ক্লাশ বিশ্রামাগার আর এক রূপ ধারণ করিয়াছিল, খস্‌খসের টাট্ পর্য্যন্ত টানান হয়; এখন অসময়; রেলওয়ের কর্ম্মচারীবৃন্দ হন্তদন্ত। ইতিমধ্যে মাষ্টার মহাশয়, অপরাধী যেমন, আসিয়া কাহিল স্বরে জানাইলেন···স্যর গাড়ী এখনও মধুপুরে পৌছায় নাই! বুঝিতে পারিতেছি না···এবং ইনি টেলিগ্রাম-যন্ত্র শব্দের জন্য এই স্থান হইতে উৎকর্ণ থাকেন। অলোকা তাহার পিকিংগীজ লইয়া না-জ্বালা টেবিল আলোর গোলাকার কাঁচে আপন প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করিতে আছে, এখন তাহার আতঙ্ক নাই, সর্পভীতি নাই, এখানেও তাহারা আকৃতির কোন বিচ্যুতি নাই! ইহার দরুণ প্রতিচ্ছবি মজা-উদ্দীপক হইল না, সে মাষ্টার মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাঁহারই দিকে অসহায়ভাবে চাহিল, পিতামহকে দেখিতে তাহার জোর ছিল না, কেন না তিনি বেচারী যারপরনাই অধৈর্য্য; গোলাপের কলম তাঁহার বিদেশ হইতে আসিয়া কলিকাতা বন্দরে আসিয়াছে, কয়েক রাত্র তাঁহার ঘুম ছিল না; গোলাপের কলম হাওড়া ছাড়িয়াছে তাঁহার ঘুম হয় নাই; এখন এই ষ্টেশনে পৌছিবে, তিনি গোলাপের কলম লইতে আসিয়াছেন। সরসীবাবু অভিজাতকে অপেক্ষমান দেখিয়াছেন। ঐ স্যর পি···মহানুভব, ঐ স্যর পি···শান্ত প্রকৃতির! ইহাও সরসীবাবু বলিতে পারেন একদা মনে পড়ে আমাদের বাড়ীতে আমার বাবা, অনন্যোপায় বেড়া নিমিত্ত অনেক লেডি হ্যামিলটন ও মার্শল নীলের কাটিং

রোপণ করেন, কালে সেগুলি ঝামরাইয়া উঠে। সেবার রিখিয়ায় আসিয়া এই সংবাদে স্যর পি···ম্রিয়মাণ ; তিনি বেড়ার অন্তধারে থাকিয়া জানাইলেন, ইহা অন্যায় !

আমার বাবা উত্তর করিলেন, মহাশয়, মুঘোল বাগিচায় এরূপ ব্যবহার আছে !

তিনি সলজ্জভাবে বলিলেন, তাহারা যাযাবর জাতি ছিল, খুনী ছিল ! আমার বাবা তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, শুনিলেন স্যর পি···কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল, ইহার কাঁটা আছে ইহাই জানিয়াছেন, আমি ভাবি আপনি শুধু হায় জানিলেন গোলাপের কাঁটা আছে···ইহা লিখিত থাকিবে ! স্যর পি···অন্তীব দীপ্তিশীল, আবার নিষ্প্রভ, কেননা মানুষের দুঃখ হইতে দুঃখতর দুঃখ তাঁহাতে !

মনিব পত্নী উতলা হওয়ত স্বামীকে বলিলেন,···হতভাগা এখনও এল না, তুমি ত তাকে···তোমার মাথায় যে কি চাপে···পাখী আনতে বললে ! এই অন্ধকার রাস্তা !

মনিব মহাশয় আপন পত্নীর বাক্যে কিছু আশ্চর্য্যে থাকিয়া কহিলেন,···তোমার মনে পড়ে আনা পাভ্‌লুভা কে···ওঃ তাহার প্রবেশ মনে পড়ে সব থেকে আমাদের বিরক্ত করিতেছিল সেই আলোর ছটা যাহা সারা প্রেক্ষাগৃহ পার হইয়া আসিতেছিল,···(ওল্ড) এম্পায়ার ত···প্রজেক্‌শন রুম হইতে আলো আসিতে-ছিল না ? কিন্তু ষ্টারে ব্যবস্থা নরেশবাবুর হাতে মানে শকুনির হাতে সেই অব্যর্থ পাশায়···কাহার হাড় যেন। কি আলো ? আজও মনে আছে···হ্যাঁ তুমি কি পাগল হইলে ; অন্ধকারেই উহারা ভাল দেখিতে পায়···সে কি চেহার ! নিশ্চয় হারামজাদা খাঁচাটি সাজাইতেছে···নাচ আরম্ভ হইবার আগেই সে আসিবে।···আমি আনা পাভ্‌লুভার নাচ কলিকাতাতে দেখি···সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ ঐভাবে, সেই হাঁসের ন্যায়, মরিতে চাহে···

সদ্যোজাত শিশু না কাঁদিলে সকলেরই, ধাত্রী হইতে গৃহস্থের মহা দুশ্চিন্তা উদ্বেগ হয় ত, সে-বার আমার স্ত্রী এক নবজাতক কাঁদে না দেখিয়া, কান্দিল না দেখিয়া, সন্নিহিত ধাত্রীকে কহিলেন, এই জাতক না কাঁদিলে বাঁচিবে কেমনে ; না কান্দিলে···রহ, আমি চপেটাঘাত করি। সে কান্দিল ! সে বাঁচিবে।

শ্রোতারা সকলেই সেই প্রহেলিকাময়ী ধাত্রীবিদ্যা পারদর্শিনীকে, যিনি অদূরে আছেন, দেখিল।

মনিব পত্নী মহা উৎসাহে প্রকাশ করিলেন, দেখ ঠিক এমনিতারা আমরা কলকাতায় এ্যাট হোম দেব (!) কি বল ? এমনি চেয়ার তক্তাপোষ টুল ইজিচেয়ার মোড়া বেঞ্চ এই রকমই পাথর থেকে চায়না কাঁসা, জার্মান সিলভার, রূপার ডিস, মাটিরও কিছু, গেলাসও···এ্যাট হোম দেব···পেলমেল···কি বল ? খুব মজা হবে না !

উদয়শঙ্কর দারুণ না ? নিরাশা নামে এক নাচ, কি লিরিসিজম, নবসময়ে আমার মনে হইয়াছে মিউজিক হ্যাণ্ড একটু বেশী হইলে বড় ভাল হইত···!

মনিব মহাশয় তদুত্তরে বিস্ময় প্রকাশে সমর্থন করিলেন, যথার্থ, সত্যিই উদয়-শঙ্কর একটি আনন্দ, পারকাশুনকে লীলায়িত মানে অন্য যন্ত্রে···নৃত্যের রেখা আর বাদ্যধ্বনি রেখা কোথাও এক মানে···আরে আসুন···অবশ্য আমি যদিও গৃহস্বামী নহি···

মনিব মহাশয় যাঁহারে অভ্যর্থনা করিলেন তিনি দাশ মহাশয়, প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর স্বামী, ইঁহার হস্তে ছড়ি, মাথায় ছাতা, গলদেশে কম্পাটার, অথচ কেহ খুব কিছু মজা পায় নাই, এমনও যে অল্পবয়সীরাও নহে, যে মেয়েটি পুরুষের পোষাকে তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ হইবে, তাহার পায়ে ডারবি জুতা, তাহার পরনে ধুতি, ইহা মালকোঁচা দেওয়া, তাহার সিল্কটুইলের সার্টের উপর ওপনব্রেষ্ট কোট, তাহার কানে মাকড়ী, তাহার নাসার বেসরে পাতল-রিঙ, যে এবং তাহার দুই দিকের বেণীশেষে চমৎকার গোলাপী ফিতা··· ! ইহার ভাই নাই তাই ঐ বেশ, এই প্রকার পুরুষবেশী কিশোরী শুধু অবাক হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অতীব গ্রাম্য চাহনিতে দাশ মহাশয়ের নিরীক্ষণে ছিল। যে অথচ এই পুরুষবেশী কিশোরী নাক কুঞ্চিত খ্যাদা করিয়া হাসিতে পারে, কপোলে টোলের উদ্ভব হয়; এক ঘটা ! সে হাসে নাই, যে ইহাতে দাশ মহাশয়ের কোন হেলদোল আসে না, তিনি খোলা-ছাতার কারণে অনুমতি লইলেন না, কেন না তাঁহার ইত্যাকার অভ্যাস চোখ-সওয়া।

মনিব মহাশয় পুনরায় খেই ধরিলেন···আঃ নাচ কিভাবে যে মায়া ধরে !··· ভাবিতে থাকিলে আমরা বিন্দুবৎ···ষ্টেজ কি সৃষ্টি, ষ্টেজ কি দারুণ সৃষ্টি !··· আপনি নাচ ভাল নিশ্চয়ই বাসেন··· ! ঐ যে উহারা···ঐ দল দারুণ নাচে··· নানাবিধ পশুপক্ষীর ডাক শুধু সঙ্গে করিয়া আনে নাই···মানে পারে নাই, যাহা মাদল, তিন ফুটো বাঁশীকে টান যোগাইত···তবে আনা পাভলুভা উদয়শঙ্কর ছাড়াই আমাদের ইহা ভাল লাগিবে।

দাশ মহাশয় অত্যধিক গাম্ভীর্য্য ধারণে সম্মতি জানাইয়া, এখন নৃত্যের জমি চৌরস দেখিলেন, কেহ জল ছিটাইতেছে, কেহ মাটি পেটাইতেছে দুরমুস দ্বারা, ছাদ-পেটাই দিয়া। আর যে ইহারই পশ্চাতে অনেক সাঁওতালী মেয়ে, তাহাদের হাস্তে যেমন বা আলো যেমন কম, আরও পশ্চাতে তখন হাড়িয়ার ভাত ছাকিতেছে, পুরুষেরা লাল গামছাতে মেঠো-ইন্দুর চকিতে চলিয়া যায় ! ইন্দুর-গুলি উহাদের ডরায় না। এই অপ্রত্যাশিত সংস্থানের সহিত কখনও তাঁহার, দাশ মহাশয়ের পরিচয় নাই, বিদেশীর ন্যায় তিনি চাহিয়াছিলেন, একবার বিদ্যুতে খেলিয়া গেল, ইহারা নাচিবে ! ততঃ দূরাগত শিয়ালের ডাক তিনি শুনিয়াছেন, এবং ছাতার নির্জ্জনতায় তিনি স্বতন্ত্রই এযাবৎ ; এখনও তাই ; এইবার স্বেচ্ছায় আপনাকে সঙ্কেত-আজ্ঞা দিলেন,···নাচ হইবে ! তন্মুহূর্ত্তেই বোঙা উপাসক হইতে তাঁহার নিজের অদ্ভুত পার্থক্য যে তাহাই পরিষ্কার হইতেছিল।

পরক্ষণেই অল্প বাকিতেই দাশ মহাশয় সরসী বাবুকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। "এই সেই সরসীবাবু, যে যিনি উদ্ভট, যে যিনি ত্রাসদায়ী। চেঞ্জারস্‌দের সহিত, স্বভাবতই আলাপ ইহার হইয়া থাকে, আর যে যখন চেঞ্জারস্‌রা চলিয়া যায়, তাহাদের বিষয়ে তাঁহার দিব্য দর্শন সকল ইনি পোষ্ট কার্ডে জানাইয়া থাকেন : কোথাও লিখিয়াছেন, আপনাদের উনুনটি ভালভাবে ভাঙা উচিত ছিল, বলিয়াছিলাম বাড়ীটি ভাল নয়, এই সেই দিন দেখিলাম আপনার স্ত্রী আঁচল কে যেন কাটিতেছে কোথাও, হঠাৎ সন্ধ্যা স্পষ্ট দেখিলাম আপনি কাহাকে যেন দরজা খুলিয়া দিলেন, ঐ লোকটি, আশ্চর্য্য দেখিতে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাণ্ডেজ ; কোথাও, অনুরূপ দর্শন ১৯২৮ হয়, আবার দেখিলাম, যে তুমি আমায় বলিলে, আমায় সি-অফ করিতে যাইবেন নিশ্চয়ই !

সুতরাং ঐ সরসীবাবুকে অবলোকনেই স্বতঃই ইহা তাঁহার মনে হয় যে, উহাকে কোন পর্য্যায়ে ফেলিবেন, এ কারণ যে তাঁহাদের জীবনধারা এক সূক্ষ্ম সমালোচনা হইতে উদ্ভূত, সমালোচনা তাহার অবলম্বন, যে কুসংস্কার তাঁহার নাই ; সুতরাং পত্রের বিষয় তাঁহার আলোচ্য নহে, শুধু স্বল্পপরিচিতকে পত্র দেওয়া তাঁহাদের শিষ্টাচার-বহির্ভূত ; যে উহা সহবত-রহিত ; আবার তৎক্ষণাৎ তিনি নিজেকে সংশোধন করিলেন, যে বিশেষ প্রয়োজন না হইলে উচিত নহে এমত পত্র দান করা। অথচ তিনি যে সরসীবাবুকে এই প্রথম দেখিতেছেন এমন নহে, যে তিনি তির্য্যক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন সরসীবাবু অতীব স্বাচ্ছন্দ্যে এক প্রলম্বিত হাই তুলিলেন। যে এবং দাস মহাশয় স্বগত বলিলেন—উহারাই নাচিবে।

সদ্যপ্রসূত শিশু, ইহা বালক, কাঁদে নাই, অত্যাশ্চর্য্য হুঙ্কার দিয়াছিল, সে ঘোর গোলাপী বর্ণ হইতে পুরীতে সমুদ্রে প্রথম উদিত দিবাকরের প্রায় লাল হইল, সহসা লণ্ঠন নির্ব্বাপিত আপনি, শিশুর দেহ হইতে ধূম বাহির হইল, সে নীল হইল, সেই শিশু শুধুমাত্র এক চক্ষুতে রূপান্তরিত পরক্ষণেই এক ত্রিকোণ বস্তু, আবার সে একটি হাত কখনও বা একটি পা মাত্র, কখনও এক কলম, ধাত্রী চীৎকার করিল···আরও লণ্ঠন, কি বিভীষিকা দেখ প্রসূতির স্তন কি বিরাট হইতেছে কি বিকট হইতেছে—দুগ্ধস্রোত বহিতেছে, শঙ্খ বাজাইতে নিষেধ কর : শিশু আপন বক্ষদেশ ফাড়িয়া দেখাইল হৃদয় নাই ; কহিল, যাহা দেখিলে তাহা সত্য, মানুষ ইহাই, তাই আমি মাতৃগর্ভ হইতে তাহাই। গৃহস্থরা আসিল, দেখিল সেই রূপান্তরের পুনরাবৃত্তি ঘটিল, এবং কহিল,···ইহা সর্ব্বনাশা, দাও ইহারে, ইহারে আমরা মাটি চাপা দিব : সেই দিবস ঝাপান ছিল, মাঠে অনেক সন্ন্যাসী—ইহা কুড়মুনে ঘটে, জিলা বর্দ্ধমান···তাহারা অন্ধকারে মৃত শিশু খুঁজিতেছিল, ঐ শিশু দর্শনে নানাবিধ রব তাহারা করিয়া উঠে, শিশুটিরে ছিনাইয়া শূল শীর্ষে বিদ্ধ করিয়া নাচিল, প্রনত্ত হওয়ত নাচিল—যে তাহারা সিদ্ধ হইবে···মেমারী আগত

পুত্রহীনা বেশ্যা সনাতনী ঐ শিশুটি চাহিয়াছিল, ইহাতে দুই দল হয়, তাহারা মারপিট করে—আর সকলে অন্যেরা নাচিতেছিল।

মনিব মহাশয় ধীর কণ্ঠে উত্তর দিয়াছিলেন,···এত উতলা হইবার কারণ নাই, সে হারামজাদা হয়ত পাখীটিরে সাজাইতেছে···বেচারী বড় দুঃখিত হইত···এই নৃত্য একমাত্র সে আর সেই পক্ষীরই দেখার উপযুক্ত, তাহাদের ভুল হইবে না—আমরা অনেক কিছু ভাবিব তবে দেখিব···এই নৃত্য যে কোন ধ্বংসাবশেষকে দুর্লভতা দিবে···সে যদি একা দেখে বড় ক্লেশ পাইবে!···এ নাচ দারুণ, এ নৃত্য দারুণ হইবে।

মনিব পত্নী কহিলেন, মেরীকে তুমি ডেকো···কি যে এরা ছাই স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে চেঁচায়, মরণ।

কাছেই একদল নানা বয়সী পুরুষ ঘোর তর্ক করিতেছিল, নিয়ত বাঙালী, বাঙলা দেশ, রিট্রেঞ্চমেণ্ট চারকা, একটা হোক্‌স, শব্দ উৎসারিত হইতেছিল যে সকলেই তর্ক জয় ইচ্ছুক, ইহাদের জাতীয়বাদী দৈনিক পত্র-এর প্রচারসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান, যে ইহারা দেশ-প্রেমে ক্লান্ত হওয়ত এখন হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছে। এই দেশাত্ম-বোধের মধ্যে রাজনৈতিক-কবন্ধ ছিল না! কেন না এনারকিষ্ট দীননাথ এখানে, সে বড় বালাই। এহেন ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধে মুন্নারী বাবু চোখ খুলেন নাই, তিনি স্বাধীনতায়, যে এবং তাঁহার হৃদয় কুঞ্চিত নয়, নিশ্চয় বিরাট কেন্দ্র সিদ্ধির জন্য আরও গভীরে তিনি আছেন। এক সময় তিনি ঘোষণা করিবেন, আমার আমিত্ব কি দুস্তর, কি বিচিত্র! আমি স্বাতি নক্ষত্রে যে জল তাহাতে গৌরবান্বিত হইলাম, তোমরা আমারে আরও খানিক মগ্ন থাকিতে দাও, আমি তোমাদিগকে অনেকবিধ আশ্চর্য্য কথা বলিব।

ডেপুটি কমিশনার এইচ. কিউ তাঁহার মোম চর্চ্চিত গোঁফ, তিনি দারুণ জবর ষ্টিকার একজন, তাহার নেত্র বীরতুল্য, তাঁহার বুটের আওয়াজ অধস্তনদের স্মরণে, তিনি সিগার-এর ধূম ত্যাগ করিতে ধূম-বৃত্ত উদ্ভূত হইল, কহিলেন, বিলি তুমি বিস্ময়কর, তোমার উচিত ছিল—কি ক্রেজি আমি—যেহেতু বালুকার বৈভব দিয়া তুমি নির্ম্মিত, তোমাতে অন্ধকারের অ নাই। সূর্য্য উপাসনা হইতে পৌত্তলিকতা এবং বিমূর্ত্ত মানসিকতার যখন সবেমাত্র সঞ্চার, বাস্তবতা যখন প্রহেলিকা, তাহার ইতঃমধ্যে লহমার কোনখানে ডাগর দাম্ভিকতায় তুমি খেলা করিতে পার; হায় এ শতাব্দীতে মারাত্মক যুদ্ধ ঘটিয়াছে, এ শতাব্দীতে বলিতে রমণীর কোন প্রয়োজন নাই, তুমি নিরর্থক, তোমার বাম বক্ষস্থিত কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির স্বেদবিন্দুতে অপুত্রকের পুত্র হয়, তোমার দক্ষিণেরটিতে শুক্লপক্ষীয় স্বেদবিন্দুতে নদীসমূহে বন্যা দেখা দেয়, দেশান্তর হইতে আজব পক্ষীতে তোমার উন্মাদনা, হায় আমাদের কাহারও নিকট সেই মুক্তামালা নাই যে তোমারে প্রীতিভক্তি/প্রণামী দিব, যে এ পর্য্যন্ত যাহারা তোমার শুভ নামে আত্মহত্যা

করিয়াছে সেই তাহারাই তোমারে সর্ব্বদা অদৃশ্য থাকিয়া রক্ষা করিতেছে. তাহারা তোমার নামে আত্মত্যাগ করিতে বহু তরুণকে প্ররোচিত করিতেছে – তাহাদের শেষ-পত্রসকল তোমাকে, যদ্যপি আইনবিরুদ্ধ, আমি তবু দিব ! – যে হয়ত উহা সকল উন্মাদনাকে খুসী করিবে – কি ক্রেজি আমি – বিলি তোমাকে আমরা দেখিলাম যে বিলি তুমি অপরিসীম টেররিফিক (বিলির উচ্চারণে) তুমি···তোমার কারণে পুলিশ রিপোর্ট বলে, তোমার কারণে ম্যাডাক্স স্কোয়ারে সেদিন সন্ধ্যায় রক্তাক্ত জঙ্গ হয়, তোমার জানলা হইতে তুমি দেখিয়াছ, দুইপক্ষ হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া খরতর লড়াই করে, কত হকিষ্টিক ভাঙ্গিল, কত ইলেক্‌ট্রিক তার চাবুক চালনার শব্দ সাঁইসাঁই হইল, পাঞ্চ ব্যবহৃতও হয়, কে একজন পার্কের ফরাশের (যে গ্যাস জ্বালে) মই লইয়া রণস্থলে আসিল !···ইহা কিছু নয়, একটি জাতিকে উচ্ছন্ন দিবার সম্ভাবনা তোমাতে···ইহা এতাদৃশ বাক্যে খাঁটি ইংরাজ ডি. সি-র আধা-নীল চক্ষুদ্বয় সুনীল হইল।···দেখ দেখ ঐ সাঁওতাল কি পর্য্যন্ত আনন্দের ! কি বাঘেরা !

শ্রোতৃবর্গের কণ্ঠ শুষ্ক হয়, তাহারা পুরাতন প্যাটার্নের অলঙ্কার, যথা, মটরমালা, মপচেন ইত্যাদির নিমিত্ত খানিক মৌন, তাহারা সাঁওতাল দেখিল। এ সাঁওতাল বহু জনপদ-বধূর রাত্র আত্মসাতে কালো।

একটি শিশু কি অদ্ভুতরস্ত তাহার চেহারা, যে কাজলকে নৈত্তর করিয়াছে, তবু কি মধুর শিশু হস্তীর প্রায় ছুটিয়া আসিয়া দাশ মহাশয়কে জানাইল···মেতমতাই নমচকাল···মেতমতাই নমচকাল।

সহচরীবৃন্দ কহিল, আমরা লাভ ন্যারেজ শুনিয়াছি কিন্তু বিলিকে কখনও শুনি নাই। অন্ত প্রাতে ভ্রমণরত বিলিকে আমরা দেখিয়াছি, তাহার পথের সম্মুখে কয়েক তরুণদের আগমন, বিলি শুধু মাত্র হুংকারে তাহাদের বিশৃঙ্খল করত কহিয়াছিল, যাও এক হুংকারে তোমাদের উড়াইয়া দিলাম – সত্যই তাহারা ছিন্নভিন্ন মেঘের ন্যায় হইল। যে এখন সহচরীদের বিস্ময়োক্তি ও শিশুকথিত পদবন্ধ অবাক মিশ্রিত – দুই পক্ষের এক এক শব্দ কখনও পাশাপাশি – সুতরাং এক অদ্ভুত কথার সৃষ্টি হয়।

এক কাশি শব্দ শ্রুত হইল, আর আর প্রসব-বৃত্তান্ত সূচিত হইয়াছিল, আর আর স্বরে, পুনরায় ধ্বনিত হইল,···আমার স্ত্রী জন্ম সম্পর্ক নেশার দরুণ এক এক কুহক ঘটনা আমি জানি, তিনি আমায় অনেক গুহ্যাতিগুহ্য অভিজ্ঞতা, তত্ত্ব, বলিয়াছেন, যে তাঁহার হস্তু নাড়ী কর্ত্তনের মুহূর্ত্তে ঝনাৎ করিয়া উঠে, তাঁহাতে দিব্য দৃষ্টি উপজাত হয়, যাহার বলে তিনি প্রত্যক্ষ করেন, ঝরণা, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ-দের ঈশ্বরী জাগ্রত, সৌরজগত বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনৈসর্গিক শব্দ উহা – ঐ ঝনাৎ, তাহার শরীর এক অদ্ভুতপূর্ব্ব দশা প্রাপ্ত হয়, মনে হয় তৎক্ষণাৎই তাহার বিবাহ হইল, ধ্রুব যে তদীয় দেহে অন্ত মনোরমত্ব উপচাইল ; তিনি বলেন, কোন

আসক্তি নাই আমাতে, পরে খেদ হয় হায় মায়া ! কোথায় আমি···ভাল আছেন স্যার, এই একটু এমনই গল্প হইতেছে···কত বড় ঘর ! উঁহাকে স্যার বলিলে আমি ছোট হই না, কোন অন্যায় হয় না···হ্যাঁ বলিতে ভুলিয়াছি, ঐ শা···এমন চেঁচাইতেছে···দেশ যে উদ্ধার হইল···তাহাতে আর ভুলিব না ! হ্যাঁ একবার আমার বড় সাধ হয় যে আমি ঐ অনুভব লাভ করি, তাহাকে আমার মনোবাসনা বলি, একদিন তিনি ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহার কেশভার রুক্ষ অকল মৃত্তিকায়ে, বসনে রক্তচিহ্ন, হস্তদ্বয় আঠা আঠা, তিনি সন্ন্যাসিনী, চক্ষুদ্বয় প্রজ্বলিত দিবা,—আমি ঘড়িতে দম দিতেছিলাম—তদ্দর্শনে ঘড়ি রাখিলাম, আঃ সেই হাত আমায় স্পর্শ করিল, সেই স্পর্শ ও গন্ধে এক মহাতৃপ্তিপাক, এক দণ্ডকারণ্য এক মানস-সরোবর, তাতাথৈ দিয়া উঠিল, এক হংস হত্যা হইল, এক হংস জীবিত হইল, আমি স্রোতাঘাতচকিত হুড়িবৎ, আমি পিপীলকাবৎ, আমি মেষবৎ, আমি ব্যাঘ্রবৎ, আমি বিদ্যুৎ, এই প্রথম আমি পুরুষ হইলাম ! তাঁহার হস্তগন্ধে আমার চেনা-চেতন সমাসীন হওয়ত অট্টহাস্য করিল ! বহির্জগৎ নির্ব্বাপিত হইল। ক্রমে শুনিলাম মদীয় স্ত্রী সন্ন্যাসিনীরূপে খেদোক্তি করিতেছেন, হায় আমি রমণী নই !

এই উক্তি ক্রমশ সকলের, যে যাহারা এখানে, যে যাহারা ইতস্তত, সকলের অগোচরেই আপন আপন ত্বকে, অন্তরে, কন্দরে সর্ব্বত্রেই অনুরণিত হইল, তৎপ্রভাবে, যুগপৎ সকলেই অলোকার প্রতি, যে দিব্য প্রভাময়ী, যে অভিজাত, সৌন্দর্য্যে ময়ূর, যে বিশুদ্ধ, যাহাকে একমাত্র শিশু কিশোররা কামনা করিতে দ্বিধা করে না, শিশুরা আধোস্বরে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশে, যে কিশোরদের সেই কামনা ঈদৃশ, যেন তাই হই ! অলোকা আপনারে বিকিরণ করিতে আছে, তাহার অত্যুৎকৃষ্ট লিঙ্ক সিল্কের রুক্ষ আলডিহাইড সবুজের ঘোর পার্পল ফুলকারি গ্রীবা-ছাড়া খানিক আবক্ষ জুনিয়ার-মিস ধরনের ফ্রকে, সেই অলোকা এক আশ্চর্য্য ! এখন সে আপনার কণ্ঠের মুক্তমালায় হাত দিল—তাহার বাহু কি অপরূপ ব্রণবির-হিত—টিকার দাগ নাই ! সে স্থাপত্যকে অভিনব করিয়াছে ! অলোকার অধরদ্বয় এমন যেমত সে ইহা কহিতে আছে যে, আ অবস্তুস্তাবিতা, আমার তোমার মতি নাই, অপার করুণানিধি ভগবান আমায় যে ভীতি দিয়াছেন, আমি অলৌকিক সৌভাগ্যবতী, হে নির্ঘাত অবস্তুস্তাবিতা তোমাতে আমার লোলুপতা নাই, হে হাসনুহানা, তোমাতে অনবস্থতা সুচির, তুমি কলমের আঁচড়ে প্রস্ফুটিত হইলেও আমি কণ্টকিত, হে কামিনী তোমাতে মোহিনী মায়া অমোঘ, যুবতীর কবরীতে থাকিলেও আমি ভীত ! ভীতিতেই আমি বৈদিক !

এবং তদীয় এবম্ভূত খেদে সেই জন্মরহস্য আমার চক্ষুদ্বয় ভাসিতে দেখিয়া আরক্তিম বুঝিলাম, কে যেমন আমার অভ্যন্তরে, আমার অভ্যন্তর গঙ্গাতীরে বসিয়া রামপ্রসাদ গাহিতেছে, আনন্দময়ী নিরানন্দ কর না, যে এবং গীত থামাইয়া

ঐ গায়ক কহিলেন, মন্ত্র লও মন্ত্র লও—তোমার স্ত্রী যখন এক রমণীগর্ভসম্ভূত মৃত সন্তানে চমৎকৃত হয়, ইহাতে যে, আশ্চর্য্য হয় যে রমণীগর্ভে মৃত্যু প্রবেশ করে, রমণী কি বিস্ময়রহস্য অহো সত্য ! তৎপ্রভাবে যখন তোমার সহধর্ম্মিণী ব্যামোহাবিষ্ট, তখন ইহা কহি নাই ; অহো সত্য ! এখন সময় আগত, শীঘ্রই মন্ত্র লও, অতএব···আমরা গুরুর সন্ধান করিতেছি !

পুলিশ রিপোর্ট বলে যে, তুমি জানলায় থাকিয়া, তোমার অজস্র কেশরাশিতে তোমার চিরুনী যায় আসে—যেমন তুমি সেই গাড়ী দুইটির মারাত্মক দুর্ঘটনা দেখ, যে দুইটি তোমার জানালার তলা দিয়া প্রায় ৮০ হইতে ১০০ স্পিডে যাইত। যেমন মোটর বাইকের দুর্ঘটনাও দেখিয়াছ, তেমনি তুমি সেই সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দেখিতেছিলে, অথচ তুমি ইতিহাস ভারাক্রান্ত কর নাই। বিলি তুমি সেখানে যাও যেখানে তোমার সম্মুখে পশ্চাতে অগণন খোজা, তাহারা কি অভাবনীয় গর্ব্বিত, কেন না তোমার স্নেহরক্ষী তাহারা !···হ্যাঁ এখন যে তরুণ সম্প্রতি তোমার কারণে আত্মহত্যা করিয়াছে তাহাকে কি দেখিবে ? আমি তচ্ছ্রবণে কহিলাম,···মন্দ কি ! তরুণ আনীত হইল। যাহারে আমি কখনও, কোন বিবাহ বাড়ীতে কোন জন্মতিথি কোনও নিমন্ত্রণে কোনও একজিবিশানে(!) বায়োস্কোপে পথে ঘটে বাসে ট্রামে কোথাও দেখি নাই—তবে পূর্ব্ব তরুণদ্বয় যাহারা আমার কারণে আত্মহত্যা করে তাহাদের আমি চোখের দেখা দেখিয়াছি, তবে যেহেতু এই তরুণ আমার নিমিত্ত আত্মহত্যা করিয়াছে তাই সে পরিচিত—যেন আমি মৃদু হাসিলাম, সেই তরুণ কিছু পরিশ্রান্ত ! সে আমার প্রতি গভীরভাবে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, সে সন্ত্রাসে কম্পিত, আশ্চর্য্য সেই তরুণ আমাকে কখনও দেখে নাই ! আমি কহিলাম,···এখন সে যাইতে পারে !

ইহাতে সহচরীবৃন্দ সকলেই আপন আপন অলঙ্কার হইতে অতীব পুরাতন হইয়াছিল, কহিল,···আমরা ল্যাভ ম্যারেজ শুনিয়াছি—দৈব দুর্ব্বিপাকে শুনিয়াছি, কিন্তু বিলিকে শুনি নাই : যে আর ঐ সহচরীবৃন্দের মধ্যে যাহারা অস্নাতা, ঋতুমতী, তাহারা ঐ বিলিকে সম্যক আঘ্রাণ করিল, যাহাতে অনুতাপ নাই, এই সেই রমণী যাহার অস্তিত্ব অনুষঙ্গ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই রমণী আমাদের অবাধ্য ! ভাগ্যশ আমরা রিপিয়ায় তাই এই রমণীরে সহজে বুঝিলাম !—ইহার পরক্ষণেই ইহারা সকলেই নৃত্যের জন্য উন্মুখ হইয়াছিল।

দেশের অবস্থা হইতে তার্কিকরা অনেক দূরে, কখনও আদিস আবাবা, কখনও স্পেনে। বিগত মহাযুদ্ধ যাহারা দেখে নাই তাহারা অচিরেই লড়াই প্রার্থনা করিতেছিল, লড়াইতে আমাদের মুক্তি ! একস্বর শ্রুত হইল ; এখন বলিতেছ বটে ! আমি পড়িয়াছি, লড়াই সাংঘাতিক, ঘরবার দুই যায়, গীতাতেও আছে বর্ণসঙ্কর জন্মায়, বিশৃঙ্খলা ! অন্য কণ্ঠ,···ঘরবার ত কিছুই নাই···যায় যাউক ! ভিন্ন কণ্ঠে,···পৃথিবী ত আপনার নয়···মানুষ কিভাবে ভুলিয়া যায় যে অন্যজনও

মানুষ! সরসে কেহ জানাইল,···মহাশয় মানুষ নিজেরেই ভুলিয়া যায়! নিজেকে না মারিতে পারিলে অন্তরে মারা যায় না···। সেই একই চির-বাক্য অথচ তাহারা কেহই ভুলে নাই। এই বচসার অদূরে জাতীয় চরিত্র অন্তর প্লেটের দিকে নালমাখা চোখে চাহিয়াছিল এবং সে অনেকের প্লেট হইতে ভাগ পায়—সে পাঁঠার ন্যায় হাসে।

অন্তরে নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে, এ নৃত্যে চড়াই উৎরাই, অসমতল, সমতল ভূমিতে চলনের ভঙ্গিমার বাস্তবতা আছে, ধিতাং ধিতাং নাদে মাদল বাজিতেছে, একজনা নাসারন্ধ্র দিয়া যুগ্মবাণী মাঝে মাঝে বাজাইতেছে যাহার আওয়াজ নাই বলিলেই হয়, সাঁওতাল নৃত্যরত রমণীদের বাহুমূলের রেখা, পেলব থরথর স্তর সমন্বিত উন্নত বক্ষগত অংশ যাহা পাঁজড়ায়ে সম্মোহ বিস্তার করিতেছে! দাশ মহাশয় তেমনই ছাতা খোলা! প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঐ নৃত্যের দুয়েক সঞ্চারী দর্শনে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন, স্বামীর ঐ স্বাতন্ত্র্য অন্তের চোখে হাস্যকররূপে প্রতীয়মান হইল! তিনি কন্যাদের প্রতি তির্যকে নেত্রপাত করিলেন, তিনি অলোকাকে নেহারিলেন, অলোকাতে জড়বাদী রমণীত্ব নাই!

যে নাসারন্ধ্র দ্বারা এবম্প্রকার প্রায় নিঃশব্দ বংশী বাদনে, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী অশেষ বিকারগ্রস্ত, যে তিনি নয়ছয়, যে তিনি কোণ-ঠেসা, যেমন যে লম্পট কিছুর সমীপে তিনি, যে এবং তিনি ধূপ ভালবাসেন, ধোপ দোরস্ত বস্ত্র যে তাঁহার তৃপ্তি বর্দ্ধন করে, ঐ দুস্তে ইহা সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন; অনন্তর তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়াছেন। যে, উক্ত কায়দায়ে ঐ বাঁশীগুলি বাজান হইয়া থাকে এই জ্ঞান আগে-ভাগে থাকিলে, যে বংশীগুলিতে খাসা নকাসীকৃত শ্রবণে তাহা দর্শন মানসে উদ্‌গ্রীব হইতেনই না, অবশ্য মূলত মনিব পত্নীর অসংযত মন্তব্য এড়াইতেই তদীয় শিল্প প্রবণতা, অন্যথা বাঁশীর শিল্পকর্ম্মের প্রতি তাঁহার আন্তরিক টান ছিল না, হায় কি বিড়ম্বনা! ভাগ্যশ তিনি সাঁওতালটির হাত হইতে ঐ নিদর্শন লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই! যদি ঘটিত তাহা হইলে অনেক ইউক্যালিপটস, কারবলিক সাবানেও তিনি বহুদিন অশুচি! যে এখন নিকট হইতে তাহা দেখিয়াছেন স্মরণেই নেহমন কাহিল, কর্দ্দমাক্ত; তিনি পান করিবার ছলে, জল চাহিয়াছিলেন, যে জল আনিল তাহার সাহায্যে হাতমুখ প্রক্ষালন খানিক আড়ালে যাইয়া করিলেন। এবং নির্ম্মল এবং আরাম হইল। কিন্তু তিলেক পরেই পুনরপি বাঁশীর চেহারা, উহা বাদন কতটুকু, সর্ব্বদাই তাহার সমক্ষে, যে, এমনও যে উহাদের উৎকীর্ণ মৎস্যলতা কুসম কেয়ারি অবধি যাহাতে তিনি অত্রাহি, যাহাতে উৎখাত। স্বপন লহরী, খোদাই বৃথা হইয়াছে। তৎপ্রভাবে এতেক বিপর্য্যস্ত বটে যে স্খলিত, রিখিয়ার হাওয়ার শব্দ সহিত অপস্রিয়মান খর্ব্ব প্রায়-ক্ষুদ্র-তরঙ্গ ব্যঞ্জনা সমান ঐ নৃত্য, মাদল বাদকের চুলের ঝাপ্‌টা—যেহেতু সে নাচে, সমস্তই কদর্য্য এরূপ সংস্কার জন্মাইল।

তিনি আরবার চশমা মুছিলেন।

পার্শ্ববর্তিনী যাহারা গ্র্যাণ্ড বলিতে ব্যস্ত, যাহারা নর্ত্তকীদের গীতের অর্থ একে অন্যকে জ্ঞাত করিতেছে, যথা 'শালফুল, আমার দেহতে পড়িতেছে আমার চালাতে পড়িতেছে, আমার ভাতে পড়িতেছে, আমি তাই গীত গাহিতে আছি।' যে দর্শকরা গীতের অর্থ কি পর্য্যন্ত মধুর মধুর বলিতেছিল, তাহাদের সকলের দিকে, উপরন্তু কন্যাদ্বয়কে, নেত্রপাতে তিনি স্বাভাবিক হইতে পারেন না, তিনি ক্রমান্বয় যেন পাপপঙ্কে যেন নরকে (!), এ নৃত্য সদ্য অঙ্কুরিত আম্রবীজ নহে যে স্বহস্তে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিবেন।

যাহা এইরূপ—তিনি তাঁহার অফিস কামরা হইতে প্রায়শঃই লক্ষ্য করিতেন, কিণ্ডারগার্ডেনের শিশুরা—যাহাদের তিনি দেশের ভবিষ্যৎ বলিয়া অভিহিত করিতেন, শিশু নহে!—ইহাদের পুরাতন মরিচা-ধরা টিনের নিকট পরিবৃত হওয়ত এক জটলা, টিফিন খাইতে থাকিয়া ইহাদের অদ্ভুত কথা কাটাকাটি চলিত! প্রধানা শিক্ষয়িত্রী রুটিন ও নানান খাতা হইতে যাহা প্রত্যক্ষ করেন, এমনও যে ক্লাস চলিবার কালে অনেক শিশুই বাহিরে আসিয়া সেই পথে গমনাগমনের সময় ঐখানে কিছু সেকেণ্ড নিশ্চল, শুধু ফিতা স্পন্দিত, কখনও স্কার্ট নড়ে, কিন্তু কোন-দিনই ব্যাপার যে কি তাহা জানিতে অবসর ঘটিয়া উঠে না, অথচ বালখিল্যরা মালীকে হটাইয়াছে, ইহা তাঁহার চোখে পড়ে, মালীকে তাহারা মারিবে ইহা শুনিলেন, হয়ত অনেক ছোট ছোট হাত উদ্যত তাহা কল্পনা করিলেন। ইহারা বৃষ্টি মানে না, উহাদের চোখ বড় হইয়াছে, কেহ মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়াছে, কেহ টিফিনের কিছু দিয়াছে। এক দিবস, সেই খালি রোদ, ঐ টিনের সন্নিকটে ভারী সোরগোল, তুমুল উদ্দীপনা, আমি আগে,···আমি দেখিয়াছি···না মনু ফাষ্ট তারপর আমি···! তর্জ্জনী নির্দ্দেশ নিন্দিত, কেহ যদি ভুলক্রমে, তৎক্ষণাৎ নির্দ্দেশকর্ত্তার তর্জ্জনী কেহ দংশন করিয়া দিয়াছে! একে অন্যরে মুষ্টিবদ্ধ করত দর্শাইয়াছে। আঃ স্বরে তাহাদের অবাক মনোহর! তাহাদের হাঁ অনেকটা, ফোকলা যাহারা তাহাদের হাঁ তাৎপর্য্যপূর্ণ। সেই দিবস তিনি সেই স্থানে যাহা নেহারিলেন, তাহাতে তিনি হাসিতে গিয়া কালো, যে এবং বজ্রাহত, একটি আম্রবীজ আপনারে উন্মেষিত করিতে আছে—সূর্য্য ফাড়িয়া বর্ণসকল ফাড়িয়া কি এক দাম্ভিকতা। কি এক মমত্ব! উহার আঁশ সকল রোমশ, পসলা বারিপাত হেতু এক-আধ জল-বশা নিটোল তাহাতে এ পর্য্যন্ত, কীদৃশী জঘন্য! কি লাম্পট্য! কোথাওকার এক গোপন রাত্র, শিকল-তোলার শব্দ যেখানে অহেতুক, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী যুগপৎ অসম্মানিত বিভীষিত হইলেন, বয়সী বালিকারা ইহা কি দেখিয়াছে! দেশের ভবিষ্যৎরা অপ্রার্থিত কহিল, উহাতে বাঁশী হইবে! ফোকলা যে সে কহিল···হুঁ আমরা বাজাইব···আমি ফাষ্ট! অতীব বুদ্ধিমতী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঝটিতি চশমা খুলিলেন, বাস্তবতা ঝাপসা হয়। চোরা-অপস্মার তাহাতে উদ্ঘাটিত হইল। মহা রোষে তিনি আজ্ঞা করিলেন···যাও ক্লাসে। তাহারা সকলে স্তম্ভিত, ধীরে

পিছু হটে ! কোন অবোধ কহিল, টিফিন ত ! তিনি কর্কশ স্বরে কহিলেন, গো ! তাহারা পিছু খানিক হটিল যেন নাচে, হঠাৎ ঘুরিল, ছুটিল, তাহারা হাসিতে ছত্রাকার ! ঘণ্টা বাজিল। আম্রবীজে তাহার রন্ধন আউলাইল, উহা স্পর্শ করিবার কথায় তাঁহার জ্বর দেখা দেয়, তিনি বালি চাপা দিবেন ? অবশেষে ঐ টিন সমেত উহা কোথাও—প্রাচীরের অন্যধারে নিক্ষেপ করাই মনস্থ করিলেন। কয়েক দিবস পরে তিনি টর্চ হাতে, স্কুল যাইলেন। নিঃসঙ্গ স্কুল ! দরওয়ান গেটে। মালীকে তিনি চিঠি ছাড়িতে পাঠাইলেন, হায় ! তাঁহারে মিথ্যার শরণাপন্ন হইতে হইল। এখন টর্চের রশ্মিতে রামধনু বিচ্ছুরণে সেই বেলেল্লা, নোংরা, ব্যভিচার, শৃঙ্গার লালসা (!) উহাতে যেন বেপথু ! প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ভাবে যেমন বা ঈর্ষান্বিত তাহা নিরীক্ষণে কিন্তু ইহা নহে। ঐ আদিরসাত্মক বৈভব হইতে এক নিরীহ কমনীয় হরিৎ কাণ্ড উদ্ভূত যাহার দীর্ঘ যুগ্ম পিঙ্গল-বেগুনী পত্রমণ্ডিত, ইহা কুলটার ভান এমত !—মৃদু শ্রাবণ বাতাসে দুলিতে আছে···মনুষ্য জাতি হিসাবে তিনি উহা অবলোকন করিলেন, মনুষ্য হিসাবে তাহার স্মৃতি নাই ! তিনি ইংরাজি বলিতে বাঙলা, বাঙলা বলিতে হিন্দি, পুনর্ব্বার ইংরেজিতে আপনাকে দাস আপনাকে প্ররোচিত আপনাকে হুকুম করিলেন ; কিন্তু টিন চাগান অসম্ভব ; যে তদনন্তর তদীয় মুখমণ্ডল অশ্বখুর দষ্ট হইল। তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এক পৈশাচিক ধ্বংসউন্মাদনায় তিনি কম্পিত, ঐ মৌনতাকে বিনষ্ট করিলেন। তাঁহার ডিগ্রী অম্লান রহিল—হয়ত তাঁহার সৌখীন এক লহমার অনুতাপ স্বীকারোক্তির নিমিত্ত এই নৃশংস দুষমনী সংগঠিত হইল !

ভারতের জাতীয় চরিত্র তাঁহার কন্যাদ্বয়ের প্রতি চাহিয়াছে, ইহা তাঁহার নজরে এতক্ষণ পরে আসিল, সেই ব্যক্তি যে দাবার ঘুটির ন্যায় সকলের অজানিতে সান্নিধ্যে আসিবার কারণে বহু আসন বদলাইয়া, ইহা তিনি বুঝিলেন, বুঝিলেন কন্যাদ্বয় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। তিনি উঠিয়া সেখানে যেখানে সুষমাই তাহার খাঁচাটি কিছু তুলিয়া ধরিয়াছে ! আর দাশ মহাশয় নৃত্য হইতে চোখ ফিরাইয়া উহাতে মনোনিবেশ করিলেন।

এবং মনিব মহাশয় উল্লাসে আপন সহধর্ম্মিণীরে জ্ঞাত করিতেছিলেন··· তোমারে পূর্ব্বেই বলিয়াছি···দেখ···আমার কথা সত্য ত···বলি নাই হারামজাদা খাঁচা সাজাইতেছে ?···দারুণ সাজাইয়াছে যেন রেড ইণ্ডিয়ান হেড পাখীটি কি গর্ব্বিত দেখ···

স্নেহশীলা মনিব পত্নী তদুত্তরে বলিলেন···মরণ, ছোঁড়া তোকে কত বারই বারণ না করেছি···রেতে গাছে হাত দিতে নেই ও তখন দেবতারা আসেন··· সত্যিই ডেলিগুলো আঃ ঐ সান ফ্লাওয়ারটা···মনে হচ্ছে এখানেই ফুটেছে··· পাখীটা সাক্ষাৎ···সাক্ষাৎ···চমৎকার না !

দাশ মহাশয় এতক্ষণ নাচ উপভোগ করিতেছিলেন, ঘুমুরের আওয়াজ—অবশ্য

মাত্র পুরুষ নর্ত্তকদের পায়ে—গানের সঞ্চার এবং উল্লম্ফন ও দৈহিক দোলাতে তদীয় কাশির শব্দ অবধি বদলাইতে আছিল, যে তিনি তাহা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই দেহ স্থাপত্য-ধ্বনি সঞ্জাত, এখন কিন্তু আর সেই সত্তোর রেশ নাই। একদা ছাতা বন্ধ করিতে চাহিলেন, যে তিনি নৃত্যের পশ্চাতে বৃক্ষসকল, ক্রমে দূরে রিখিয়ার নিগূঢ় আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন! যেন সদ্য বিধবার ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিলেন, (যেমন তদীয় স্ত্রীর অশৌচ বস্ত্র পরিহিত বালককে দর্শনে স্বস্তি হয়) তদনন্তর পুনর্ব্বার নর্ত্তকীদের প্রতি একাগ্র, কিন্তু ইউক্যালিপটসের পত্রমর্ম্মরে স্বামী-হারা বিলাপ নিশ্চিহ্ন হইল। তাঁহাকে অধৈর্য্য করিল, তিনি নাচ দেখিবেন, ভূমিতে পদাঘাতে উড়ন্ত ধূলায় নৃত্য সাধারণ পদক্ষেপে হইতে আছে। এমত কালে মনিব মহাশয়ের খুসী তাঁহারে আকৃষ্ট করিল, তিনি এক খাঁচা দেখিলেন। অথচ ইতিমধ্যে সেই পুরুষবেশীকে বেণী দুলাইয়া বলিতে শুনিলেন···আমি যদি নিজেরে হত্যা করি মানে বিষ খাই তাহা হইলে জেল হইবে।

তদুত্তরে বালিকা কহিল···কি করিয়া!

পুরুষবেশী বলিল, তাই ত শুনিলাম···

কেহ কহিল···আমি যদি আমাকে মারি তাহাতে কাহার কি?

এই কলহ পার হইয়া দাশ মহাশয় খাঁচাটি বিশেষ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মতায় নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কেহ টর্চ ফেলিয়াছে, পাখীটি সুস্পষ্ট যাহাতে, এখানে ফুল ছিল, সুতরাং নির্ম্মল আনন্দ প্রকাশের দিক ছিল। অতএব ছাতার কারণে আর তাঁহার খুঁৎ থাকে না, তিনি আত্মনাসিক স্বরে স্বভাব-ভীত ভাবে প্রশংসা করিলেন,···সত্যই এবম্প্রকার দৃশ্য অমৃতবর্ষী···দেখুন কুসুম সকল, তখনই মনে হয় কোথাও এক স্বচ্ছতোয়া নদী আছে···কুসুমের বর্ত্তমানতা···

এমত সময় অহঙ্কার মদমত্ত সুঘরাই, যাহার মুখের নিকটে খাঁচা থাকার দরুণ, যে দেখিতে পাইল পক্ষী ঐ তুলুল আলোতে দুই একটি পোকা খাইতে চঞ্চু পৃথক করে, গোলাপী অভ্যন্তর ক্ষণেক, খুট শব্দ হয়, গলদেশ উঠে-নামে, যে তন্নিবন্ধন বালক সুঘরাই যথার্থ অপদস্থ, কেন না পক্ষীর তাদৃশ তৎপরতায়ে তাহার কল্পনা ম্লান হইতেছে, সে আশা করে যে তাহার পত্নী লক্ষ্মী হইয়া থাকিবে, ভদ্র থাকিবে, যে রুক্ষদৃষ্টিতে তাহাকে শাসন করে, তোমাকে এত খেলা শিখাইলাম, কসরৎ শিখাইলাম, কত কি শিখাইলাম, সবই পণ্ডশ্রম হইল, যে এবং তাহাতে কোপ আসিতেছিল; সে অস্ফুট স্বরে পক্ষীটির সাবধান করিয়াই জনসমাবেশের দিকে বড় করুণভাবে তাকাইল···। তৎকালেই খাঁচাটি বিশেষ সশব্দে নড়িয়া উঠিয়াছে যে যাহাতে সে দৃষ্টি ফিরাইতেই নিরীক্ষণ করিল, সান গ্লাওয়ার পড়িতেছে, ইহাতে সে ঝটিতি রুষ্ট এবং অন্য কাহারও বিবেচনার সময় না দিয়া খাঁচার উপর এক চাপড় মারিল, পক্ষী ত্রাহি স্বরে ডাকিল।

মনিব পত্নী তৎক্ষণাৎ বলিলেন···এই তুই···কি করছিস···পাগল নাকি···!

মনিব মহাশয় বলিলেন···হারামজাদা তাই বলিয়া অত জোরে চাপড় দিতে কখন আছে···খাঁচা ভাঙ্গিয়া যাইত···পক্ষী ভয়ে পালাইত···আর বলিবেন না, সেদিন বৃথা আমার প্রায় একডজন গুলি নষ্ট হইল···ঠিক এইভাবে···দেখ বেচারী এখনও ভয়ে অস্থির···আ হাহা, তিতি বল···নিগার কোথাকার !

দাশ মহাশয়ের কাশি স্বাভাবিক হইয়াছে, এমত সংঘটনে, মনোজ্ঞ আনুনাসিক স্বরে, অগীন বাদ্যযন্ত্রের কিয়ৎ রেশ আছে যাহাতে, বিস্তার করিলেন,···যথার্থ এতদ্দর্শনে বারম্বারই এই সত্য মনে আসে, পরম কল্যাণময় ঈশ্বর···যিনি সবার প্রভু,···মঙ্গলময় তিনি···চাহেন কেহ কাহারেও দুঃখ দিও না,···এখন এই পক্ষীর সূত্রে বলা যায়···ইহাদের আমি সৃষ্টি করিয়াছি, ইহারা আমার ইহারাই প্রকৃতির প্রকৃতিই আমি ইহারাই প্রকৃতি !

এই পর্য্যন্তেতে যেন অতীব গূঢ় কিছু মীমাংসা ব্যক্ত করিতে দাশ মহাশয় সমর্থ হইলেন ; রহস্য-সই করাই তাঁহাদের সাধনরীতি, যে এবং অধুনা তাহার গম্ভীর্য্য অনুধাবনে ইহাই অনুমিত হইবে যে জীবন হইতে জীবনীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা আছে ; কিন্তু যেমন জীবনীর চাপে কবে যেন মৃত – হয়ত কালো ছাতার পশ্চাদ্-পট ক্রমে ইহাই বুঝায় – যেন ছোট স্টেশনে তাঁহার লাশ পড়িয়া আছে। এখন দাশ মহাশয় শুধু আনুনাসিক স্বর মাত্র। যে পার্শ্ববর্ত্তী নীরবতা, যাহা যেমন ধমক-খাওয়া, যদিও তির্য্যক দৃষ্টিতে নাচে দেখে, তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিল, যে আবার তাৎপর্য্যপূর্ণ কাশির শব্দ ও অবিলম্বেই চোস্ত বাচনভঙ্গি শ্রুত হইল, – মঙ্গলময় সদাসর্ব্বদা বলিতেছেন, নদী গিরিমালা লতাগুল্মবৃক্ষ কীটপতঙ্গের ভাষায় – তারা সকলের ভাষায়···তোমরা আত্মসুখপরতন্ত্র ইহাদের খাঁচায় আবদ্ধ করিও··· প্রকৃতিকে ফিরাইয়া দাও···ইহাদের সুখদুঃখ আমি জানি···তোমরা আত্মসুখে নিমজ্জিত···ইহাদের সুখদুঃখ বেদনা তোমরা কিছুই বুঝ না···ইহাদের পুষিও না···উহাতে পাপ হয়··· !

সমবেত জনমণ্ডলী – নাচ দেখার ফাঁকে ফাঁকে একাগ্র – দাশ মহাশয়ের তত্ত্বাদর্শে যারপরনাই পরিতুষ্ট হইলেন, সকলেই একবাক্যে এবং যে সাধুবাদ জ্ঞাপনকরত বলিলেন, মহাশয় আপনি সঠিক চিন্তা করিয়াছেন : ইহার পর তাহারা, সুঘরাই যে অপ্রতিভ যে থতমত আছে, তাহারেই অবলোকনে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিল। সুঘরাইএর এতক্ষণ পরিবৃত উচ্চবর্ণের মধ্যে এতটুকু আঁট বোধ হয় না, কিন্তু ইদানীং সকলের এহেন মনোভাব অনুভবে সে খুব অস্বস্তিতে আপন প্রভুর প্রতি অসহায়ভাবে তাকাইয়াছে।

মনিব মহাশয় যিনি এবম্ভূত বচন পরম্পরায় মৃদু হাসিতেছিলেন। তাঁহার কোন্ কথাই মানে লাগিবার নয়, কেন না দাশ মহাশয় শুধু বলিবার জন্যই বলিলেন, উনি কিছু আদিষ্ট পুরুষ নহেন, শুধু নিবেদন করিলেন,···মহাশয় আপনি যা বলিলেন তাহা সত্য···তবে আমরা জড়···জড়বাদীর মানে···অবশ্য

এক হয়, তিনি আছেন, তিনি যদি আসিয়া বলেন···তাহা হইলে··· । আদতে ইনি বলিতে চাহিয়াছিলেন জড়বাদীর উপলব্ধ ভগবৎ প্রসঙ্গ বৃথা, কিন্তু আপনাকে, উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ইনি যেহেতু, সংযত রাখেন। এবং আপন প্রিয় ভৃত্যের ধীরতার সহিত আজ্ঞা করিলেন,···আর পাপে প্রয়োজন নাই, ইনি যাহা কহিলেন তাহা অর্থপূর্ণ সত্যই, সুঘরাই তুই ঐ পক্ষীটিরে কল্যই জঙ্গলে ছাড়িয়া আসিবি···

মমতাময়ী ধর্মশীলা মনিব পত্নী তদুত্তরে স্বামীরে একান্তে লইয়া বাধা দিয়াছিলেন,···কি যে অলুক্ষণে কথা বল···ওর সঙ্গে মানে সবে সঙ্গে উত্তরোল, কেন মৎতে ও পাখী ছাড়িবে ছি ছি···তুমি কি যে বল···মনে নাই ব্রজবাসী কি বলিয়াছিল···পাখী পোষা কি ঘাতা···সে কথা তুমি ওনাকে বলছ না কেন ?··· অথচ মনে হল তুমি ওনাকে ঠাট্টা করিলে···

মনিব মহাশয় বিনীত স্বরে প্রকাশিলেন, তুমি বৃথাই আমার দোষারোপ কর, আমি তামাসা করি নাই, যদি করিতাম উনিও তাহা বুঝিতেন, দেখ উহার মুখমণ্ডল···আর জঙ্গলে ছাড়িবার কথা উহাতে সত্য নাই···যাহারা ভগবানকে একরূপ জ্যানে তাহাদের কথা বলা নিরর্থক··· !

মনিব পত্নীর আজও সেই ব্রজবাসীর (এই বৈষ্ণব যিনি বৃন্দাবনে থাকেন, ইহা নাম নহে) কথা মনে হয়, তাদৃশ সদানন্দময় মানুষ কমই চোখে পড়ে, ইনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় তাহাদের বাড়ীতে আসিতেন, পূজার দালানে থামের নিম্নে বসিয়া যাহাকে তিলক সেবা করিতে তিনি দেখিয়াছেন, মুখে অহরহ কৃষ্ণ নাম, ইনি বলিয়াছিলেন, ওগো তাহা নয়, খাঁচার পাখীতে মন আরোপ কর, মন আরোপের জন্যই পাখী পোষা—এই মরদেহ খাঁচা ঐ পাখী আত্মা···এ জানাই ঠিক জানা··· ! এই ভাব লও আর তর্কে যাইও না··· ।

যে উপস্থিত হিরণার টিলায় প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সাঁওতাল নৃত্যের দিনকার তত্ত্বালোচনার উল্লেখে, মনিব মহাশয় শান্ত কণ্ঠে জানাইলেন,···দাশ মহাশয়ের কথায় তত্ত্বাভিজ্ঞতা আছে, উহা সূক্ষ্ম, সামান্য মানুষে উহা কেমনে ধারণা করিবে··· সাধকরা উদ্দীপনার জন্য অনেক সময় পাখী পুষিয়া থাকেন···সে কথা ধরি না, তবে আপনি জানেন, হয়ত বেদনা দুঃখ বুঝে না সাধারণে···মানুষের ক্ষমতা কতটুকু, সে ডাক্তারী করিতে পারে···কোন কিছুর বেদনা স্বয়ং অন্তর্যামী নারায়ণ পারেন বা তাহার অবতার যেমন ঠাকুর পারেন···মানুষ ছার !···তবে তিনি আমাদের ভালবাসা কথাটা জানাইয়াছেন···আমাকে একজনের বা শতজনের মৃত্যু সংঘটনের ক্ষমতা যখন দিয়াছেন তখন নিশ্চয় তিনি ভালবাসার ঐশ্বর্য্যও দিয়াছেন, তবে হয়ত তাঁহাকে জানাইতেই সেই ভালবাসা আসে···তবু সুঘরাইকে যখন দেখি···উনি তিতি করিয়া ডাকিলে সাড়া দেয়, অবিকল তিতিরের মতই আসে, তেমনই অদ্ভুত পদবিক্ষেপে ঘুরে—ইহা সেদিন আমার নজরে পড়িল,

ভাবিয়াছিলাম যে উহা সাঁওতাল নাচ দর্শনে শিখিয়াছে—কেন না একই ভঙ্গিমা, একই ফের, অভিন্ন···কিন্তু উনি আমার সন্দেহ ঘুচাইলেন··· ।

মনিব পত্নী ইহার সপক্ষে কহিলেন,···হ্যাঁ ছোঁড়া বরাবরই তিতিরের মত ভাব-ভঙ্গী করে জানেন···আবার ছোঁড়া তিতিরটাকে নানা কিছু শেখায়, কত খেলা··· ওগো সেইটে বল না, ও ছোঁড়া খাঁচার কাঠি ভঙ্গ জায়গায় নিজের আঙুল বেঁধে জোড়া দিয়েছিল—আমি ত দেখে হেসে বাঁচি না···অন্য হাতে খাঁচাটা চাগিয়ে আমায় এনে দেখালে! আমার মনে হয় ও ছোঁড়া আজন্মে পাখীটার কেউ ছিল···আমি ভাবছি ওর মুরগী কাটা ছাড়িয়ে দেব···ওতেই মনে হয় বুঝলে··· এখন আমার মনে হচ্ছে···তাছাড়া যখন পুষছে তখন ভাল নিশ্চয় বাসেই···

মনিব মহাশয়···সুঘরাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস উহারে খুব ভালবাসে, ভয়ঙ্কর ভালবাসে··· ।

সুঘরাই ও তাহার খাঁচা এখন আবছায়া কিছু কিছু, সুতরাং শুধুই ভালবাসা শব্দ আপনার বিশেষত্ব লইয়া প্রকট হওয়ত মায়া ধরিতেছিল। রিখিয়ার এই বিরাট চৌদিকে সর্ব্বত্রে—প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর আর নেত্রপাত যো ছিল না, ভাল-বাসা শব্দে তৎ অধীনারাও নিজেও যেন কুঁকুঁ শব্দ করত ভীত! এই স্থল বড় বুনো, লাট্টা খাম্বার শব্দ এতটুকু স্বাভাবিক করে না, কেহই সুতরাং নিজেকে জানে না। গা কেমন যেন ছম্ ছম করিতে আছিল। একমাত্র সুঘরাই ভাবিতে ছিল নূতন কোন অভিনব ধারায় খাঁচাটি সাজাইবে।

সুঘরাই অবসাদে নৈরাশ্যে যারপরনাই ক্লীব, তাহার কান্দিবার মত আর ক্ষমতা ছিল না, ইহা যে শহরের অংশ তাহাও জ্ঞান ত নাই, এখন তাহার ভাবনাতে একমাত্র যে বাস্তবতা ছিল তাহা হয় ঘুম, নিজের ঘুমকে, যাহার চেহারা যেমন বা সে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করে, সে বড় ভয় পাইতেছিল, ইতিমধ্যে দুয়েকবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়াতে আতঙ্কিত হইয়াছে,—পশ্চিমের আকাশ তাহাকে পিষিতেছিল, কেন না সন্ধ্যা সমাগত—নিজেকে যেন তাহার প্রহার করিতে ইচ্ছা করে, সে টলিতে টলিতে যেদিকে আরও কোলাহলপূর্ণ, যেদিকে সে ঘুম ভুলিতে পারে, সেই অভিমুখে শ্লথ পদক্ষেপে চলিতে আছিল। কুয়ায় হইতে জল তুলিবার শব্দে, তাহার পাথর, যে স্থলে অপেক্ষাকৃত বেশী আরামদায়ক ঠাণ্ডা, সেখানেই সে থ, যেন জাগিতেছে বলিয়া তাহার মনে হইল। এবং যে দ্রুত কয়েক পদ অগ্রসরেই সুঘরাই এক কুয়ার সম্মুখে; যে লোকটি জল তুলে, সে জল দান করিতেছিল—কেহ জল পান করে, জলকণা সকল সুঘরাইএর দেহের এখানে সেখানে ছুটিয়া আসিতেই আপনা হইতেই তাহার চেতনা হইল, যে সে অনেকক্ষণ এখানে ও ঝটিতি কি এক শব্দরোলে তাহার দেহ পূর্ণ হইল, যাহা সঠিক বুঝিতে না পারিলেও যাহার উদ্দেশে ঐ ধ্বনি উঠে সেই ছবি তাহাতে ক্রমে আবছায়া,

ক্রমে ভাস্বর হইল! অলৌকিক বিবাহ-যাত্রা! আশ্চর্য্য যে এহেন সঙ্কটেও সে ঐ শব্দ অনুকরণে উহার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ে উথলিতও হইয়াছে, এবং ইহাতে আপন কণ্ঠস্বরের পশ্চাতে মনিব মহাশয়কে সে অনুভব করিল। আশ্চর্য্য জল সম্বন্ধে সে যে তৃষ্ণার্ত্ত, নিশ্চিত ক্ষুধার্ত্ত, সে যে ঘুম ভয়ে ভীত তথা পরোক্ষভাবে সে যে হারাইয়াছে, তাহা ক্ষণেকের জন্য খেলিয়া উঠে নাই, জলধারায় শেষ সূর্য্য-ছটায় সেই মহিমা উদ্ভাসিত হইতে আছিল।

যে এখন যে-ব্যক্তি জলপানরত সে ঈষৎ মুখ তুলিতেই সুঘরাই যেমন বা স্তম্ভিত, তথাপি কোনমতে সে ছায়া হইতে মানুষটিকে হদিশ করণের প্রয়াস পায়, যখনই সেই ব্যক্তি আপন দেহ বাঁকাইয়া এক সিরাট ঢাক কাঁধে তুলিয়া অতীব স্নেহে এক গণ্ডুষ জল লইয়া ছাউনিতে ছিটাইল, যেমন ইহা তাহারাই ন্যায় তৃষ্ণার্ত্ত! সন্নিহিত সুঘরাই এক চিরপরিচিত নাম ডাকার অপ্রত্যাশিত স্বর আনিতে বিকল, অনতিকাল পরেই সে অদ্ভুতভাবে চীৎকার ইহাতে সেই 'অহো মহেশ্বরী!' শব্দের অক্ষরহীন ধ্বনি হইতে তদীয় তিতিক্ষের উল্লাস অবোধ ছিল; সুঘরাই যেমন এতটুকু কাহিল না, ঘুম তাহার জলে ভিজিয়া গিয়াছে, যে এবং কয়েক মুহূর্ত পরে সে নিখোঁচ গলায় ডাকিতে পারে···বিসরিয়ার বাপ! এবম্বিধ ক্ষমতায় এতাবৎকার সমস্ত নিষ্ফলতার ক্ষোভ খেদ চমকপ্রদ কাহিনীতে সুবিন্যস্ত হইল। সুঘরাই যারপরনাই উচ্ছ্বসিত, যে সে চোখের পলক ফেলিতে চাহে না, বিসরিয়ার বাপের অনেক দিনকার না-কামানো দাড়িতে চিঁড়ার কুচি, আর মুখময় জল, যে সে তাহার স্বজাতিকে দেখিয়াছে, সে উহাকে স্পর্শ করিতে চাহিল, আহা কতকাল যে সে মানুষ স্পর্শ করে নাই, নিশ্চয়ই বহুকাল, বহুকালই সে বিচ্ছিন্ন!

সুঘরাইএর ডাকে বিসরিয়ার বাপের পদস্থিত ঘুমুরের আওয়াজ হইল, ঢাকেও মৃদু শব্দ ঘটিয়াছিল, যে এবং সে আড়নয়নে সুঘরাইকে লক্ষ্যের সঙ্গে শুধু মাত্র 'আরে আরে' জ্ঞাপনের পরই আর এক গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিল, এবার মুখখানি তুলিয়াছে, নিবিষ্টচিত্তে সেই জল আপন বক্ষে বিশেষত সিকনে ক্রমে এখন লেপিতেছিল। এত নিকট হইতে সুঘরাই কখনও ইতিপূর্ব্বে এই বৃদ্ধকে নিরীক্ষণ করে নাই! বৃদ্ধ বিসিরিয়ার বাপ কেমন যেন অন্যমনস্ক আছে। ইহাতে সুঘরাই সত্যই আতান্তরে পড়িল, সে ত্বরিতে আশ-পাশ জলধারা সমস্ত কিছু দেখিল, সে কি সুঘরাই নয়! তৎক্ষণাৎ আপনার গেঞ্জী খুলিতে চাহিল, অধুনা জলে আর্দ্র বদনে করজোড়ে বড় বিষাদে এই প্রার্থনা জানাইতেছিল, বাবা বৈদ্যনাথ তুমি দুঃখের দুখী, হায় কত দুঃখ আছে আমার, কবে ঘুম দিবে, আর কত দুঃখ আছে গো!—এই সরলতায় সুঘরাই নিশ্চিহ্ন মনে হইল, এখনও কি আমার হদিশ হয় নাই···মনিবরা? এখনও আমি কি হারাইয়া আছি···এই বিসরিয়ার বাপ কি সত্য!

ইদানীং তাহারা বিলাসীর টিলায়, বিসরিয়ার বাপ আর একবার মন্দিরের দিকে ফিরিয়া ভগবান বৈদ্যনাথকে নমস্কার করিল, এরূপ মনোহর উহার কৃতাঞ্জলি যেমন চৈত্রের শালবন প্রতিবিম্বিত হইতে পারে—অতএব মুহূর্তেই সুঘরাইএর আর উদ্বেগ নাই,—হয়ত যেহেতু বিসরিয়ার বাপ এ সময়ে তাহার ঢাকে তিনবার কাঠি দেয়, এ কারণ যে ঢাকের আওয়াজ বড় সাহস—উত্তর দিকে উৎরাই পথে অজস্র জোনাকি-ভয়াল চক্ষুতে পরিণত হইবার নহে। এইবার তাহাদের রিখিয়া যাত্রা শুরু হইবে। বৈদ্যনাথের ধূলি মস্তকে লওয়া হইয়াছে। বিসরিয়ার বাপ হাঁকিল—হেরে মকরোয়া রে!—মকরোয়া নামে ব্যক্তি নিশ্চয় কোথাও আছে···

সুঘরাই বিসরিয়া-বাপের এই হাঁকে, তাহার চক্ষু সজল হইল এবং যে এতক্ষণে ক্ষুধা অনুভব করিল, কুয়া হইতে এতটা পথ বৃদ্ধ অনবরত তাহার রোজগার গণনা করিয়াছে, এক এক হিসাব স্মরণে ঢোলে কাঠি দিয়াছে, খেয়াল রাখিতে, যথা ভোরের গাড়ী, মোটা যাত্রীরা তাহাকে লয় নাই, কিন্তু বিধবা বুড়ী হ্যাঁ হ্যাঁ যে মন্দিরের দিকে···কাঁদিতেছিল, সে ঢোল বাজাইয়াছে, সেই বুড়ী দুপয়সা, হ্যাঁ হ্যাঁ···তারপর এক পয়সা···তাহার পর এক পয়সা···এই ভাবে কতবার সে হিসাব ভুলিল, এইভাবে সে নিজেরে গালি পাড়িল, কিন্তু যে তদীয় পায়ের ঘুমুর নিয়তই বাজিয়াছে, এক সময় আচমকা আপনার গালে বুকে চাপড় মারিয়া তার-স্বরে দিক বিদীর্ণ করিল,···হাহা আমি দেড় পয়সার চিঁড়া খাইতে গেলাম কেন··· রাতে ভাত খাইব কেমনে···ও হো ও হো!···আমি শালা···

তখন তাহারা বিলাসীর অভিমুখে, এখন শিবগঙ্গা প্রায় অতিক্রম করিবে, সারা পথ সুঘরাই বারম্বার পিছনে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, উপস্থিত বিসরিয়ার বাপের খেদোক্তিতে মহা ভীরুভাবে কহিল···বিসরিয়ার বাপ, তুমি যদি আমার মনিবদের একবার পাওাপাড়ায়···আমার মনিব তোমাকে নিশ্চয় টাকা···

বিসরিয়ার বাপ সবেগে উত্তর দিল,···তুমি কি পাগল, তাহাদের ঠিক সময় ক্ষুধা পায়···তাহারা বড়লোক···

ইহাতে সুঘরাই, যদিও ডোম তবু, মুখ ঘুরাইল, অনেক যুক্তির সে উল্লেখে ইচ্ছা থাকিলে সে অবতারণা করে না, এবং যে সে নিজেরেই অদ্যকার দুর্দৈবের জন্য দোষী করিয়াছিল। যে তখনই এবং এক মহিমান্বিত ধ্বনিতে সে চমকিত! কেন না এই পুণ্য নগরের বিবিধ সোরগোল ইদানীং এখানে এক বিচিত্র শব্দ রণনে রূপান্তরিত হইয়াছে। এবং যে আশ্চর্য যে বালকের মনপ্রাণ তাহা উচ্চারণে দেদীপ্যমান!

ইতিমধ্যে বৃদ্ধের 'এ গে মাকারোয়া' ডাক ও মুহুর্মুহু ঢোলের শব্দে, এক পাণ্টা সাড় আসিল, আর যে ক্রমে দেখা গেল এক বৃদ্ধ কেমন একভাবে পশ্চিমের আকাশে চোখ রাখিয়া আসিতে আছে, সে যেমন থাড়া পশ্চিমে যাইবে, তদীয়

পদশব্দ কাঁকরে ঘর্ষণেতে, তাজ্জব, যে যখন এই ব্যক্তি বেশ কাছে তখন বিসরিয়ার বাপ জানাইল,···হেরে মকরোয়া, অন্য এই বুতরু তোমার হাত ধরিবে···আমি সারা রাস্তা নিজেকে শালা মারিব···আমি অতটা চিঁড়া খাইলাম···আমি কি···! ···এই সেই মকোরোয়া···শিব ইহার রাতকানা করিয়াছে···শালা পাপী···

ডোমপুত্র সুঘরাই অবলোকন করে মকরোয়া বিষাদের হাসিতে তদীয় হাত প্রলম্বিত করিল। আর সে, শান্ত নেত্রপাতে ঐ রাতকানা বেচারীকে পর্যবেক্ষণ করে, এতাবৎ তাহার মনে এহেন সঙ্কল্প থাকে, যে সে বিসরিয়ার বাপের কাছ ঘেঁসিয়া থাকিবে, এই বৃদ্ধের সেই প্রথমকার মর্মান্তিক প্রার্থনা তাহাতে কোন এক দুর্লভ স্মৃতি দিয়াছিল, যে প্রার্থনার পরে ঐ বৃদ্ধ শতচ্ছিন্ন বস্ত্রপ্রান্ত দ্বারা একাধারে জল মুছিয়া ক্লান্তি অপনোদন করিয়া তাহার দিকে সরলভাবে হাসে, তৎপ্রবর্তিত সুঘরাই ঘোরে—যেমন যে এই দুঃখময় বার্দ্ধক্যে হাসি থাকে কেন! এখন সুঘরাই ঐ প্রলম্বিত হাতখানিতে প্রলুব্ধ—যে এবং যেইমাত্র সে ঐ হস্ত ধরিতে স্পর্শ করে যুগপৎ মকেরোয়া অন্যপক্ষে সুঘরাইএর হাত ধরিল, ইহাতে ক্ষণেকেই দিক সকল প্রকৃতিস্থ হইল, এই পৃথিবীতে কখনও ঝড় হয় নাই, কিন্তু তিলেকের মধ্যেই দীর্ঘশ্বাস অবশ্য সে ফেলিয়াছে—হায় ডোমেদের দীর্ঘশ্বাস আছে! কিন্তু দীর্ঘশ্বাসের কারণ জানিতে সে প্রস্তুত নহে! (আশ্চর্য্য যে সে নিজেকে চালিত করে) তৎপরিবর্ত্তে, সে বেদম উল্লাসে নাচিয়া উঠিল, অবাক দায়িত্ববোধে সে উষ্ণ, তদীয় গেঞ্জী যেমত শুভ্রতর হইল; লক্কড় ভূত প্রেতকে সে বিদ্রাবিত করিতে পারে—সে হুঙ্কার দিয়া নির্ভীকতায় সামনের পথ নজর করিয়াছিল। অপার্থিব গর্ব্বে তদীয় গ্রীবা উন্নত দৃঢ়, ইহা আপনা হইতেই ঘটিল, ক্বচিৎ এরূপ ইহাতে বুঝায় যে ভিতিরস্বভাব তাহাতে অনেকদূর প্রবেশ করিয়াছে, যে তাহাতে অধুনা এই অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ধীরে বোধ আসিল এবং সে আপনকার গ্রীবায় মহা ভাবুকতায় হাত বুলাইয়াছে; সেদিনও ঠিক আর এক যশোগরিমা আশায়ে এমনই ঘটে, স্নেহবৎসলা মনিব পত্নী যখন, কাগজের ফুল সকল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন—সেই ফুলরাজি মনোলোভা, ইহাতে পোকা নাই, ইহা শুকাইবে না, বর্ণ নিষ্প্রভ হইবার নহে এবং উহাতে পক্ষীটি তাহার বিরাগভাজন হইবে না। সে আহ্লাদিত যে কাহারও খাঁচা—যাহা রিখিয়ার হাটে আনীত হয়, যাহা মোহনপুরে আসে—এমত ফুলে শোভা বর্দ্ধন করে না।

সুঘরাই সচকিত পদক্ষেপে চলিতে আছে, মকরোয়ার ধৃত হাতে বার্দ্ধক্যের কম্পন; মধ্যে মধ্যে তাহাকে অন্যত্রে লইতেছিল। এতাদৃশই আর এক কম্পন—তাহা কিছু আজব প্রকারের উমের পিছন হইতে আগত—শীতের কুয়ার জলে যে উষ্ম নাই!—সুঘরাইএর কোমরের ঘুনসী ডাঁটার চাবিটির পাশেই যেন বাঁধা রহিয়াছে, ফলে যাহা কখনই খোয়া যাইবার নহে, ফলে যাহা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। এ কম্পন অভিনব, প্রথম যখন বনে তখনকার। সে বনসম্পদের

একটি হইয়াই ছাতি সংগ্রহে ঘুরিতেছিল, তাহার স্কন্ধ যখন বৃষের তুল্য, যখন সে ভয়ঙ্কর ! তখন এই কম্পন স্পর্শ করে – সবে চোখ-ফুটা এক পক্ষী শাবকেতে। শুধু তখন হয়ত তাহার মনে হইল বহুদিন তিতিরের সেই কম্পন ছোঁয়া হয় নাই, কিম্বা মনে হইবার আগেই তাহার গাত্রে ঝুমুরের কয়েক মাত্রা দুলিয়া উঠিল – কেননা বিসরিয়ার বাপ ঢাকে কাঠি দিয়া তখন এক ঝুমুর গাহিতেছে, 'মুখে হাসি, সব্বনাশী, বাঙালি কা বিটিয়া। ক'লকৎতা তে বেচতরে তামাকুল টিকিয়া।' – এই ঝুমুর আন্দোলনে সে অচিরাৎ শিশু হস্তী, কিন্তু তখনই সে আপন দায়িত্ব ভুলিতেই বেচারী মকরোয়া ত্রাসে মৃদু হাহা করিয়া উঠিয়া ব্যক্ত করিল কিছু। কিন্তু পরক্ষণেই বিসরিয়ার বাপ পথিপার্শ্বস্থিত আধা ঘুমন্ত গ্রামবাসীদের সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠে···শুন শুন আমার কপাড় হে, আমার এককুড়ি দুইটি ছেলে··· অনেকেই মৃত, আমায় খাইতে দিবার ভয় অনেক শালারা মৃত, যাহারা আছে তাহারা আমায় কেন পর্য্যন্ত দেয় না গো··· ।– আবার কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ঢেঁড়া দিয়া চীৎকার করিল,···তোমরা শুন, ঘরে ফিরিবার আনন্দ আমার নাই, তোমরা শুন রেলের জনম আমার জনম এক (সময়)···আমার জনম বড় দুঃখের হে, দুঃখই আমার বয়স···শুন··· ।– এবং ঢাকে কাঠি দিয়াছিল। তাহার কথার উত্তরে নিথর নিঝুম হইতে উৎসারিত হয় – শালা তুমি মর, তুমি মর তুমি মর লককড়ে তোমারে খাক্ ! বিসরিয়ার বাপ ইহাতে গাহিয়া উঠিল – পাগলা মনা পাগলা মনা পাগলা মনা রে, আনন্দে হরি গুণ গাও !

সম্প্রতি সুঘরাইএর দেহে অনেক কথাই আঁচড়ায়, সারাদিনের নানান ফেরে সে আর একে যেন পরিবর্ত্তিত, অনুকম্পা, করুণা আদি বহুবিধ সদ্গুণ তাহাতে যেন এখন, সে পারিপার্শ্বিক আঁধারে চোখ রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করিতে প্রস্তুত – বিসরিয়ার বাপ ঢাক বাজাইয়া খানিক কাল যেহেতু, এই উদাত্ত স্বরে বলিতে পারার জন্য সে খুশী,···বিসরিয়ার বাপ তুমি খেদ কর কেন, তুমি ইচ্ছা করিলে একটা কাটাহর, একটা পাঠা, এক পালি চাল খাইতে পার, তোমার ত দুঃখের কথা নহে !

বিসরিয়ার বাপ এহেন প্রশংসায় উজ্জ্বল, হইয়াছে, রাতকানা মকরোয়া বেশ বুঝা গেল ঈর্ষায় হাসিয়া কহিল, কে দিবে হে··· ?

যে সুঘরাই এতশত বিচার করিয়া বলে নাই, অথবা কি যে সে ব্যক্ত করিতে মনস্থ করে তাহা তাহার খেয়াল নাই ; সে অপ্রতিভ ; সে ত্বরিত নিজেই সংবৃত হইল অথবা সমক্ষের কোন অন্ধকার দেখাতে আদতে এই বিসরিয়ার বাপই যে তাহাকে কুয়াতলায় সবিস্ময়ে বলে,···হারে বুতরু তোমার তিতির কোথায় ? তিতির বিনা তুমি, আশ্চর্য ! তোমাকে আমি চিনিয়া লইতে পারি নাই,···আমি ভাবি একটা গেঁজীওয়ালা কেহ··· । যে এখন মকরোয়ার কম্পনেই ঐ বাক্য স্মরণেই উপস্থিত যে হদিশ পাইল যে ঐ কথারই জন্য সৌজন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতে

এযাবৎ সে যেন সুযোগ সন্ধান করিতেছিল, কি সে অযথা সূত্র ধরিয়াছে।

এমত সময় বিসরিয়ার বাপ যে উথলিত আছে, বলিল,···হা রে মকরোয়া রাতকানা, যে বুতুর তোমারে অন্য পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে, সে খুব ভাগ্যমান···আরে বাবা! বেজায় ধনী লোকের বাড়ী কাজ করে,···বেজায় ধনী হে··· তাহারা ইহারে খুব যত্ন করে, রোজ এ গোয়া চালের ভাত দেয়, না কি বল?··· এই সুঘরাই খুব চতুর হে, এ ডালিম বেদানা দেখিয়াছে···যাহা গ্রামের আর কেহ দেখে নাই···আমি, আমার কথা ছাড়···সে ডালিম বেদানা খাইতে দেখিয়াছে, আসছে জন্মে···সে বড় ঘরে জন্মাইবে···হা রে দুঃখ!···হা হা এই বুতুরুর চমৎকার এক তিতির আছে···আহা ঘরকে ফিরবার টান বটে···সুখ দুঃখের সাথী···সুঘরাই তাহাকে একদিন লইয়া আসিও, দুটা ভাত দিব, ঝুমুর শুনাইব···'ত্রিকূট পর্ব্বতই চড়ি ডুমা ছাঁটে বাঁশরে কুণ্ড বনে সজনোয়া'···দারুণ তিতির, অনেক টাকায় বিকাইবে গো···বড় বড় ঘাটওয়াল জোড়া (কাপড়) দিবে হে, টাকাও দিবে···হা হা যখন তাহার (তিতিরের) বিয়ের ফুল ফুটিবে, তখন আমাকে বরাৎ দিও হে, হাটে হাটে ঢেঁড়া দিব···। এবং তৎক্ষণাৎ বিসরিয়ার বাপ নৃত্যসহ ঢেঁড়া বাজানর ছন্দে, ঢাকে কাঠি দিল, হে এই মত সে বাজাইতে থাকে, একের পর অন্য পদবিন্যাসের বিরতিতে, যথা···চোখ উহার কাঁটি কাঁটি, রাগিয়া গেল লাল, মেঘ ডাকিলে বেগুন বেগুন, আবার তারার মত বটে, নদীর মত হে, আকাশ বাতাসের ছায়া, তাঁহার মাথায় বাবুদের মতন টেরী কাটা, তাহার পাখায় ঝাপট্ পোকা পালায়, তাহার ডাক যেমন বা গাডের (রেল-গার্ডএর) হুইসিল,···রেল ছাড়ল হে···। এবার তাহার ঘুমুর বাজিল, পুনরায় ব্যাখ্যা করিল,···তাহার চাহনিতে মকরোয়ার রাত কানা ঘুচিবে, তাহার ডাকে মাদি তিতির পাছা তুলিয়া বসে,···সে বড় যোয়ান গাছের পাতা, তাহার সামনে উড়িলে সে রুচিয়া উঠে,···জাত রাজ রাজপুত···বিড়াল হুলাড় ঐ তিতিরকে ডরায়, যখন দেখিবে ছেঁড়া ন্যাকড়া, ছেঁড়া দড়িকে ঠোঁট দিয়া কল্পা করিয়া ধর্ষণ করে,···তখনই আমায় খবর দিবে···তাহার বিয়ের ফুল ফুটিয়াছে বুঝিবে···যে জোড় খাইবে।···সে যখন লড়িবে শ'য়ে শ'য়ে পয়সা পড়িবে···কত লোক হারিয়া ধুলা চাপড়াইবে।

ইহাতে সুঘরাই আপন তিতিরের গুণকীর্ত্তনে নয়ছয়, যে সে মকরোয়ার কম্পনে অত্যধিক প্ররোচিত, উদ্বুদ্ধ, যে সে ইতঃমধ্যে কখন যে মকরোয়ার হাত নিজে ধরিবার মনস্থ করে—ইহা তাহার অজ্ঞাতই; এবং সে বুঝিল যে ঝটিতি আপন হস্ত মুক্ত করিয়া পাল্টা উহার হাত ধরিল; মকরোয়ার হাত শিরাবহুল, ও অতীব রোমযুক্ত এবং যাহা অনুভবেই সুঘরাই চমকিত হইয়াছে, যে সে হোঁচট প্রায় খাইয়াছে—কীদৃশী অলৌকিক ঘটনা উহা স্পর্শে, স্থি এক বিহান! ও যে তখনই সে সঠিক আর মহেশ্বরী ধ্বনি শব্দত দিয়া উঠিল। ইহাতে সে·

বিস্ময়ে ছেলেমানুষ। অথচ সে নিজে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না যে উহা তাহার কণ্ঠস্বর, উহা যেমত অন্য আর কেহ!

অন্যপক্ষে রাতকানা মকরোয়া উঃ বলিয়া সবিনয়ে জানাইল,···হে বৃতরু, আমি তোমার উপর নির্ভর করি···বেসামাল হইলে আমিও হইব···আমাকে বুঝিয়া চল···আমাকে বুঝিয়া চল হে···

আশ্চর্য্য যে এহেন কাতরোক্তিতে সে বিচলিত নহে, যে সে তখন আপন কর্ণে সেই মহা ধ্বনির অনুরণনই মাত্র শুনিতেছিল, সেই ধ্বনিকে পূর্ণভাবে নিখুঁত শব্দে জানিবার কারণে সে কেমন যেমন নিষ্ঠুর, যে এবং ক্ষণিকেই বুদ্ধি করিল যে সে ভীত ভাণে পুনর্ব্বার সেই আস্বাদ লইবে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া আছে। তাহারা সকলেই পথ চলিতেছিল। বালসরাইয়ের অন্যধারে চড়াইয়ের দক্ষিণ দিকে রাঙা পড়ি-র শালবন সেখান হইতে মাদলের আওয়াজ আসে, ইতিমধ্যে আঁকাবাঁকা রাস্তার বালি সাদা দেখা যায়—সুঘরাইএর চোখ ছোট হইয়াছিল, আড়ষ্ট গলায় অনুরোধ করিল,···হে বিসরিয়ার বাপ একটু ঢাকে কাঠি দাও···কেন না লক্কড়টা যদি···এবং অথচ এখন ধীর পদক্ষেপে বাজনার অপেক্ষায় না থাকিয়া সে অগ্রসর হয়, এই উৎরাইএর কোথাও বিশেষত কালভার্টের কাছে সে নিশ্চয়ই সুযোগ পাইবে, সুতরাং তাহার রক্তে অধীনতা আছে—তথাপি সে অতীব শান্ত কণ্ঠে প্রকাশিল,···দেখ হে মকরোয়া আমি ইচ্ছাসুখে তোমার হাত চাপি নাই, ইহা আমি জানি তুমি বুদ্ধ, তুমি রাতকানা···আমার কথা তুমি জান না, আমি খাওয়া দেখিয়াছি কিন্তু খাই নাই সারাদিন···আমি উপবাসী···তাহাতে আমার দুঃখ নাই···আমার মনিষদের হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হই—আমি এখন যেহেতু ছেলে-মানুষ লক্কড় ভীতি···। রাতকানা মকরোয়া এই সুদীর্ঘ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাক্যবিন্যাসে যেমন বা ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করে, অন্তত সুঘরাই ইহা অনুমান করিয়াছিল, তন্নিবন্ধন সে যথার্থই সঙ্কুচিত, যে সে আপনার কথার আওয়াজে পীড়িত, সে আপনকার বাম হস্ত এই অন্ধকারে দেখিতে উৎসুক হইল।

ভাগ্যশ বিসরিয়ার বাপ এখন ঢাকে কাঠি দিয়া ত্রিভুবনকে জ্ঞাত করিল,···হি সে শালা লক্কড় পেটে যে শালা বোবা, সেই শালার পেটে মদ ছিল, লক্কড় শালা মদের আস্বাদ পাইয়াছে···মাতাল ছাড়া আর কিছু সে খাইবে না···হাঃ আমি কি দুঃস্থ, বহুদিন আমি মদ খাই নাই···আমি তালের কেড়ে চুষি!—ইহার অন্তে সে গাহিয়া উঠিল 'ফুলন গুলাবরে ভোমরা চুষাল···'

যদিও এহেন স্থানে ঐ প্রকারের মস্করা বিসদৃশ, তথাপি সুঘরাই যেমত স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে এবং সে মকরোয়াকে বলিল—তোমাকে আমার তিতির দেখাইব··· তুমি দেখিলে, তাহাতে তোমার শীত গ্রীষ্ম বোধ থাকিবে না···। কিন্তু ইহা জ্ঞাত করিতে সে যেমন তটস্থ হইতেছিল, কেন না সম্মুখে বাঁশঝোপ, ঝটিতি সে মকরোয়ার হাত সজোরে চাপ দিল, তখন নিশ্চয়ই কম্পন উপলব্ধির আশে নহে,

মকরোয়া ইহার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল, ফলে সে দাঁড়াইয়া পড়িল। অন্তপক্ষে সুঘরাই সভয়ে সেই বাঁশঝোপ অবলোকন করিতেছিল, সে শুনিয়াছে এই বাঁশঝোপ বড় দুষমন, ভূত আছে ; যে ভূত দুইটি বাঁশ পাশাপাশি ভূমি করাইয়া মানুষকে মারার কল পাতে, সুঘরাই এই সংস্কারে – অবশ্যই চোর। এই সত্য যে তাহার হাতে নোনা আছে – ত্বরিতে মোহিলি হইতে প্রাপ্ত এক অমোঘ মন্ত্র মনে মনে আপনারেই প্রদক্ষিণ করিয়াছিল।

তিতির পাখীটি তখন কয়েকদিনের বাচ্চা মাত্র, সুঘরাই আপনার হাতের উপরে সেই পাখীটি লইয়া যায় মোহিলির কাছে, যে তখন কোদাল দিয়া জমি কোপাইতেছিল, সে তদ্দর্শনে তদীয় বক-সমান লম্বা ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া লাফাইয়া কহিল···ছি ছি তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই···তিতিরটি খড়ের উপর বা কাটোরাতে আনিতে হয় জান না, তোমারে বলি নাই···সবে ইহার চোখ ফুটিয়াছে···খুব অন্যায় করিয়াছ !···জান না তোমার হাতে নোনা আছে··· মানুষের হাতে নোনা আছে···মানুষের হাত তাহার মনের কথা শুনে না – হাত ভারী খচ্চড়, কেরেট সাপ হইতেও পাজি···হাত সদ্যোজাত শিশুর দক্ষিণ প্রত্যঙ্গে যে ভূতপাঁয় তাহা হইতেও নচ্ছার !

সুঘরাই ইহাতে মাটির দিকে চাহিয়াছিল, যে সে পাশুটে, অথচ মোহিলির বাড়ী পর্য্যন্ত সারাটা পথ এই হাত দ্বারা এতক্ষণ এক অভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় সে মথিত ছিল, ঐ ছোট শাবকের কম্পন তাহার হৃদ্‌পিণ্ডকে যেমন ছন্দিত করিতে আছিল এবং এক হাত হইতে অন্য হাতে শাবক রাখিয়া, শূন্য হাত গভীর কৌতূহলে আঘ্রাণ করিয়াছে···কম্পনের কি মধুর গন্ধ ! কি মধুর ! – সম্প্রতি মোহিলির ভর্ৎসনায়ে সে বিচাল্যমান নির্জীব।

মোহিলি কোদাল ফেলিয়া আসিয়া একটি স্থানে দাঁড়াইয়া মন্ত্র বিড় বিড় করিতে থাকিয়া বাম পদ দ্বারা যতদূর সম্ভব ইহা দূরে প্রসারিত করিয়া ভূমিতে এক গণ্ডিচক্র নির্ম্মাণ করিল, অদ্ভুতভাবে লাফ দিয়া গণ্ডির বাহিরে আসিল ও নানান ক্রিয়ার পর পক্ষীশাবককে গণ্ডির কেন্দ্রে বসাইয়া দিল। অতঃপর চারিভিতে অদ্ভুতভাবে হাঁক মোহিলি পাড়িল, এবার আকাশের দিকে তাকাইয়া স্বীয় বক্ষে চাপড় মারিয়া কি যেন গলাধঃকরণ করিতেই তন্মুহূর্ত্তে মাটিতে সে নিজেই আছাড় খাইয়া পড়িয়া গোঙাইতে আছিল, এবং কাটা-ছাগলের-ন্যায় সে কাঁপে ; আশ্চর্য্য যে এবম্বিধ ঘটনায় পাখীটি স্থান ত্যাগ করে না ; অন্তপক্ষে বালক থতমত হইয়া পলায়নে উদ্যত হইয়া তেমনই রহে, সে চিত্রার্পিত।

ক্রমে মোহিলির কর্ণদ্বয় নড়িল, এবং যে সে মাটিতে মুখ রাখিয়া অস্পষ্ট বিজড়িত কণ্ঠে কি যেমন বলিতে আরম্ভিল, এখন শোনা গেল, – আমি সেই ভূত, আমি সর্ব্বনাশ করিব, যে আমি···জল পান করি, ঐ বৃতরু কেন তিতিরকে শুধু হাতে বহন করিয়া আনিল, দুয়ার খুলিয়া দিল, পথ করিল ; তুমি কেন দেখ

নাই, এখন ফল ভোগ কর, তোমরা দুয়ার খুলিয়াছ, পথ করিয়াছ, সর্ব্বনাশ করিব! তদুত্তরে মোহিলি ঈষৎ তাহার নিজ স্বাভাবিক স্বরে, কি যেন কহিল, সম্ভব মার্জ্জনা ভিক্ষায়।

…আমি মরদ মিয়ার একটি ছাগল এখন বিনষ্ট করিয়াছি আমি এখনই তোমার ও ডোমপুত্রের সর্ব্বনাশ করিব, তুমি লোহা ছুঁইলে বেশ…তোমরা রক্ষা পাইলে; কিন্তু তিতিরের রক্ত পান করিবই…কেন না যে রহস্য সূর্য্যকে ত্রিকুটের পশ্চাতে উঠায় আবার ডিগরিয়ার বামে এবং ডাইনে সরাইয়া ডুবায়, সেই রহস্য যেক্ষণে সবে গোড়া লাগে তাই পক্ষীশাবক কম্পিত, সেইতে বালকের হাত লাগিয়াছে যে সে চোর ছ্যাঁচড়া হইবে, উহার হাতে তাই নোনা, (নোনা মানুষের হাত, উহার হাতও নোনা) সেই নোনা লাগিয়াছে, আমি পক্ষীশাবকের রক্ত পান করিব।

মোহিলি স্বাভাবিক স্বরে মিনতি করিল।

…আচ্ছা! যেদিন পিঙ্গল বর্ণের কিঁদিম কাঠকোম খাইবে সেইদিন গোড়া-লাগা উহাতে পুরা হইয়াছে জানিও…

মোহিলি কোদাল পদদ্বারা ছোঁয় এবং অতঃপর উঠিয়া সুঘরাইকে পক্ষীশাবক সম্পর্কে অনেক নিয়ম-মানার উপদেশ দেয়, আপাতত মৃৎপাত্রে ছোট কেঁড়েতে পাখীটিকে রাখার কথা বলে, তিন হাট তিন দিন পর খাঁচা! কব্জি কাটার মন্ত্র তাকে বলে। এবং ইহার পর আশ্চর্য্য যে বালকের ভগনীপতি, পাখী যে অপছন্দ করিত, সেও কিছু বলে নাই! সে সারাদিন এক বিশ্রীদর্শন খাঁচা লইয়া ঘুরিত! আর সূর্য্যের দিকে সভয়ে চাহিত। কেন না সে এতাবৎ শুনিয়াছে যে সূর্য্য নিজে উঠে! নিজেই নিজের জমিদার! এখন জানিল অন্য কথা, যাহা কাহারও সহিত আলোচনা করাতে দিব্বি আছে। শুধু খাঁচার বাঁশ-চৌরস সময়ে নিজ গাত্রের কম্পন ভীত হওয়ত মোহিলিকে বলে; মোহিলি উত্তর দেয়,…উহা হাওয়ার জন্য বা ঠাণ্ডায়!

সুঘরাই যখন ঐ বাঁশঝোপে তির্য্যক নিরীক্ষণ করিতে থাকিয়া, অদ্ভুতভাবে মকরোয়ার হাত সন্ধান করিতে আছে, তৎকালেই মকরোয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল,…হে বিসরিয়ার বাপ, এই বুতরু খারাপ, খচ্চড়…আমার হাতে বড় জোর আবার চাপ দিয়াছে…আমি হোঁচট খাইতাম…

বিসরিয়ার বাপ ঐ বক্তব্যের প্রতিধ্বনিতে মন রাখিয়া উত্তর দিল,…আহা সে বুতরুমাত্র…এখন রাত্রকাল, তাই সে ভীত…নিশ্চয় স্বেচ্ছায় নহে। আরেঃ বাব্‌বা! মনিব কত ধনী, সে কিরূপে খচ্চড় হইবে!

রাতকানা মকরোয়া কোন যুক্তিতে কর্ণপাত না করত প্রকাশিল,…শালা খচ্চড়!

যে সুঘরাই কায়িকভাবে যেমন এই ছোট তাহারা-র মধ্যে তেমনই সে অন্তরেও

নিমেষেই, কটূক্তি এখনও বিশালতায় প্রতিধ্বনিত, কিন্তু যেহেতু, ক্রমে খচ্চড় শব্দটি বড় হইতে ছোট, সর্ব্বশেষে দক্ষিণের ক্ষেতের আল হইতে আসিল! তাই সে ক্ষণেক বিভেদে; এবং যে তাহাতে ইহা আভাসিত হয় যে যেন মকরোয়াতে কোন রহস্যের গোড়া লাগে নাই; কিন্তু তৎপ্রবর্ত্তিত অনুতাপ নহে, ছোট ছিছিও নহে, একটু অপ্রতিভ হইবার পূর্ব্বেই পুনরপি, সেই মহাধ্বনি তুলিতে যেন মরিয়া।

যে ধ্বনিতে এক অলৌকিক বিবাহ-যাত্রার ছবি!

আর আর পরিচারকবর্গের কথায় স্নেহশীলা মনিব পত্নী ইদানীং যারপরনাই চিন্তিত; সভাই সুঘরাই ক্রমশ এক অদ্ভুত অন্ধকার হইয়া উঠিতেছিল, যেমন সে এক চরিত্র যে সে বৈদ্যনাথ যাওয়ার দিনের মত ব্যবধান বর্দ্ধিত হইতে আছে, ততই যেন হন্তে, খাঁচার কাগজের ফুলের গন্ধ আর অনুপ্রাণিত নহে, বাগানের ফুল তাহাতে সঠিক স্বর শব্দ জাগায় নাই, অভিনব উদ্ভাবনশক্তির জন্য সে মরিয়া। অতএব তিনি যখন শুনিয়াছিলেন যে সুঘরাই রাত্রে ঘুমের মধ্যে কি এক, কোন এক, ডাক ইদানীং তুলিয়া থাকে, তখন তিনি সুঘরাইকে শুধু বলিয়াছিলেন,…মুখপোড়া রাতে হাত পা বেশ ভাল করে ধুয়ে তবে শুবি! অবশেষে মোহিলিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুঘরাইএর সম্বন্ধে বিবিধ খবরের পর যখন বিশেষত কয়েক দিন বাদে শুনিলেন, যে, ঘুমের মধ্যেই সে দাঁড়াইয়াছে, হাতে তাহার লণ্ঠন, এবং সে ধ্বনি তুলিতেছে! এবং যে তাহাঁর মুখে মৃদু হাসি ছিল, যে সে পুনঃপুন নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছে! এবং সে মাদুরের পার্শ্বস্থিত খাঁচাটিতে কি যেন করে! সে যেন কি বলিতে থাকে পাখীটিরে—আদতে যাহা সুঘরাই তখন বলিয়াছে, তাহা এই যে, মা ঠাকরুণের নিকট যে কাগজের গুচ্ছ আছে তন্মধ্যে হরিৎ কাগজের পরেই যে কাগজ (যেহেতু সে ঐ রঙের নাম জানে না) সেই কাগজের ফুল করিতে মা ঠাকরুণকে বলিব, এবং সেই ফুল দিয়া সাজাইব, কেন না এখনই সেই ধ্বনি তুলিতেই আমি দেখিলাম বিবাহ-যাত্রার সেই সাজানতে। কল্যই আমি ঠাকুর ঘরের নর্দ্দমা পুনরায় শুঁকিব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার সমগ্র ঐশ্বর্য্য মনে পড়িবে, আজই নিশ্চয় হইত, হঠাৎ শনিচারোয়া আপদ যদি না আসিয়া উপস্থিত হইত।—

যে সুঘরাই, এখন দ্বিপ্রহর, প্রায় নিঝুম ঠাকুর ঘরের নর্দ্দমায় আঘ্রাণ করিতেছিল; সেখানে নানাবিধ গন্ধদ্রব্যের জল নিষ্কাশিত হয়, ধূম নির্গত হয়, সেখানে ফুলের পাপড়ী ছিন্ন, কখনও কখনও মৃদু পাখীরা জল পান করে! এখানেও যে চমৎকারিত্ব আছে, যে সুঘরাই তাহা জানিত। শুচ্যাচারিণী মনিব পত্নী যখনই উহা পরিষ্কার করিয়াছেন তখন সুঘরাই বাহিরে থাকিয়া সঠিক হইয়াছে কিনা তদারক করিয়াছে এবং পবিত্রতার কাছে থাকিতে সে যেমন শঙ্কিত হইয়াছে—এখন ঐ প্রণালীতে কিছু ভীতি ছিল—তবু এখন যখন সে আঘ্রাণে আঘ্রাণে ক্রমে

ক্রমে ভরপুর এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম, কুকারিতে চোষ্টান্বিত, ঠিক তেমন সময় শনিচারোয়া উপস্থিত, কহিল,···হে রে ঐখানে কি করিতেছ !

সুঘরাই থতমত, চকিতে আপন খাঁচাটি যাহা এখানে ছিল তাহা অন্তপাশে স্থাপিত করিল ও ফুল আর কিছু সুতা এবং ছুরিটি এবার হাতে লইয়া কহিল, নর্দ্দমায় ময়লা আছে কি না দেখিতেছি··· !

দেখিলাম, তুমি ফের সেইরূপ চীৎকার করিতেছিলে।···আমি দেখিলাম ! আমি দেখিলাম !···বল এবার যে লড়াইএর মন্ত্র শিখাইতেছ নর্দ্দমাকে, লড়াইএর মন্ত্র শিখাইতেছ··· !

যে সুঘরাই মাথা উন্নত করিতে চাহিলেও পারে নাই, কেন না নিকটের পিচ্ গাছ, কেন না পশ্চাতের ফলসা গাছ, ইহারা সাক্ষ্য দিতেছিল সত্যই ঐ শনি-চারোয়া উল্লেখিত তাহার যুক্তি নিরর্থক যাহা অবলীলাক্রমে তদীয় জিহ্বায় আসিয়াছিল ! সিরিয়া-র পিছনের মাঠে ইহা ঘটে, সে খাঁচা সাজানর সরঞ্জাম রাখিয়া খাঁচাটি একহাতে লইয়া, দাঁড়াইয়া—কেন না উপবিষ্ট ভঙ্গিতে সে জোর নাই ভাবিয়া, আপন সমগ্র আবেগ সৎসাহস সঙ্কল্প করত সেই ধ্বনি তুলিতে থাকে।

আজ তাহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে সে সেই শ্রুত শব্দটি পূর্ণ উচ্চারণ করিতে পারিবে, সে নিজেকে শাসাইয়াছে পর্য্যন্ত, যে, আজ যদি না ঠিক পার ত পাচ চড় ! যে এবং সে তারস্বরে, হাওয়ার বিপরীতে, সেই ধ্বনি অনুকরণে দিক বিদীর্ণ করিয়াছে ! তাহার নির্দ্ধারিত অনেক তিনবার পার হইয়াও সে সফলকাম নহে ! কাগজের ফুলসমূহে হাওয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, ঝটিতি মনে হইয়াছে সন্ন্যাসী সাধকদের কণ্ঠস্বর সেখানে ফুলেতে দিব্য হইতেছে, হইয়া আছে ; আর যে সে তিলমাত্র কালক্ষয় না করিয়া সেই সেই ফুলগুলি তুলিয়া কানের পাশেই ধরিয়াছে, এমত আশায় যে যদি সম্যক তুলিতে পারে, তবে তাহার সমক্ষে সেই বিবাহ-যাত্রা শোভা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উদ্ভাসিত হইবে।—আর যে সে তেমন-ভাবে পক্ষীর খাঁচাটি সাজাইবে ! কিন্তু যতবার সে মনঃসংযোগ করে, ততবারই বেচারী প্রতারিত, সে বিড়ম্বিত, যে এখন কাগজের পাপড়ীতে বাঁচার-জন্য হাস্তকর আওয়াজ সেখানে, টিকটিকি মৃত পতঙ্গ যেমন। যে সেই ফুলগুলির উপর আক্রোশ তাহার হয় নাই—যদিও সে বালকমাত্র—ইহারা তাহার তিতির নহে, এখন সে তাহা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আবার একাগ্র হইয়াছে···যে ক্রমাগত মুখখানি প্রতি-নিয়ত এক বিশেষ উচ্চারণে খেলাইতে চাহিয়াছে। ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত সঙ্কল্প তাহাতে থাকিয়া থাকিয়া উৎচকিত হইয়াছে যে সে ব্রাহ্মণ (পাণ্ডা) বাড়ীতে চুরি করিবে, বামাল বেচিবে ও পরক্ষণেই অদ্ভুত দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে সে বামাল বেচিয়া মহুয়া কেনে,···তাহার ভগনীপতি মহুয়া খাইয়া শুয়োর ছানা কোলে লইয়া খুব নাচিতেছে !

কিন্তু ঐ সঙ্কল্প, ঐ দৃশ্য তাহাকে অবাক কিম্বা থ পর্য্যন্ত করে না এবং ইহাও সম্ভবত যে—একারণ যে, এখন সে সম্মুখে দেখিয়াছিল কয়েকটি উলঙ্গ বালক প্রায়-উলঙ্গ বালিকা নিকটে আসে, যাহারা রাখাল তাহারা তাহার প্রতি চাহিয়া আছে যে বালক কাঁড়ার পিঠে, যে কাঁড়ার গলদেশে ঘন্টি বাজে, কহিল,···তোমার কি হইয়াছে, তুমি এরূপ চীৎকার কর কেন?—যে এবং এই সঙ্গে প্রায় নয়টা সকল হইতে একই প্রশ্ন হইল।

সুঘরাই একদা আপনকার হস্তধৃত খাঁচার দিকে চাহিল, দেখিল, ফুল আর টুঁটী, এবং দেখিল, আপন প্রিয় পক্ষী ঘাবড়াইয়া আছে; আর যে নিখোঁচ কণ্ঠে উত্তর দিল···আমি ইহাকে সাহসী করিতেছি, ইহাকে নির্ভীক···ইহাকে দুর্দ্দান্ত করিতেছি···লড়াই তাহার কাছে শুক্‌না ডাল ভাঙার মত যাহাতে সহজ হয়!··· যাহা শুনিয়াছ তাহা এক দারুণ মন্ত্র, ইহাতে তিতির দামাল হয়!

যে নয় অল্পবয়সীরা ইহা শ্রবণে নিজেদের মধ্যে তর্ক করিল, সিদ্ধান্ত করিল, আরেঃ বাব্‌বা! হাট ভত্তি জমিদারের বাবার বাবার বাবা, উহার মনিব, কত কত ধনী···এরূপ মন্ত্রর নিশ্চয় আছে···আমরা ভিগরিয়া জানি, ক্রিকুট জানি··· কত কি জানি না! ···আঃ খাঁচাটি কি সুন্দর! ···ঐ গোল, ফল যেন দেখিতে, উহাকে কি বলে? কি অপরূপ যাহার এরূপ খাঁচা আছে···সে খুব খুব!

এবং ঐ ধ্বনির কারণ রূপে সুঘরাই সকলকেই ঐ যুক্তি দিয়াছিল। এখন সে নিঃসম্বল দৃষ্টিতে নর্দ্দমাটি দেখিতে থাকে।

শনিচারোয়া যোগ দিল,···এখন···মালীর বৌ সবই দেখিয়াছে···যে-তুমি নিত্য মাঠে যাও···সেই তুমি বাহির-এ গিয়াছিলে···তোমার ছাড়া কাপড় সিঁড়ির পাশে আতা গাছে ছিল (এই বাড়ীর আচার অনুযায়ী) তোমার খাঁচা সিঁড়ির তলায়···তুমি উলঙ্গ অবস্থায় আসিয়া সাজান-তে ঠিক দাও···পাখীটিরে খোঁচাও··· সেখানে চীৎকার ঠিক নহে, চাপা স্বরে কর···তুমি বিড়ি খাও না···তাহাকে বলিয়াছ চন্দনী বিড়ি···সে যখন জিজ্ঞাসা করে এত ধূপের মত গন্ধ কেন···ইহার অর্থ কি?

সুঘরাই এবম্প্রকার প্রশ্নে আশ্চর্য্য যে একটুকু বিচাল্যমান নহে, সত্যই যে সে একটি ধূপ জ্বালাইয়া বারম্বার সেই ধ্বনি তুলিতে আপ্রাণ করিয়াছে, মাঠে ঘাটে ঈদৃশী চেষ্টা হাওয়ার নিমিত্ত বৃথা হইয়াছে তজ্জন্যই, মল্লিক লজের পশ্চাতে একমাত্র ছাদহীন বাড়ীতে সে যায় নাই; কারণ সেখানে স্ত্রী-লোকরা বহুসময় যায়! তাই ঐ স্থান, যেখানে সম্মুখের নোনা ধরা দেওয়ালে বিরাট মাকড়সা, ও পাশের দেওয়ালের গায়ে বিশ্রীদর্শন টিকটিকি···আর যে ইতিমধ্যে সে প্রজ্বলিত ধূপ হস্তে এ পবিত্র ধূমায়িত সে খানিক চোখ বুজাইতে শঙ্কিত, তথাপি সে নিজেকে সোজা দৃঢ় করিয়াছে···এবং সে সেই বিবাহ-যাত্রার অভিনন্দন ধ্বনি তুলিয়াছে, ফলে···তাহার শরীর কেমন যেমন বেসামাল, তন্ময়, যেন তাহার

অন্তরীক্ষে কোথাও মনিব মহাশয়ের বিছানার মত বিছানা—সে শঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছিল—কি ব্রণ-বিরহিত শুভ্রতা! এখন এবং সে দৃপ্তস্বরে কহিল,…সে বিড়ি খাইতেছিল।…

আবার মিথ্যা!…পাপ হইবে…অবশ্য তোমরা ডোম, পাপের কি জান…

আবার আমাকে ডোম বলিতেছে…দাঁড়াও…।

কোথায়? ও…ও…উহা আমার মুখ হইতে…আপনি…। এবং শনিচারোয়া অসহায়ভাবে থামিয়াই আরম্ভিল, কতবার বলিলাম মোহিলিকে ডাকিতে…এখনই সুরাহা হইত!…আমরা ভাবি তোমার কি হইল…!

সুঘরাই শনিচারোয়ার এই ডোম সম্বোধনে চোরা-হুষ্ট ছিল। কিন্তু মোহিলির উল্লেখে অল্প বিমর্ষ, অবশ্য মমতাময়ী মনিব পত্নী এখনও, পারচারিকাবর্গের অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই, এমনও যে স্বল্পভাষী মরদ মিয়া সে-ও এবং অনেকে তাহাকে মাঠে মহাধ্বনি তুলিতে দেখিয়া বলিয়াছিল, ইহা এরূপ কাণ্ড ভাবিবার কথা! কিন্তু তিনি মৃদু হাসিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন উহা সুঘরাইএর উল্লাস মাত্র, খাঁচাটি যেহেতু মনোরম দেখিতে হইয়াছে! কিন্তু ইদানীং সুঘরাই বেশ অনুভব করে যেন তাঁহার সেই-পরিচিত ভাব—যাহা প্রশান্ত প্রসন্নময়—ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে; বিশেষত গতকাল সে লক্ষ্য করে, যে তিনি পাখীটির ঘা বৃদ্ধি দেখিয়া ঔষধ দিতে থাকিয়া কহিয়াছেন,…ফের যদি দেখি খুঁচিয়েছ তাহা হইলে কিন্তু ভাল হবে না…আমি কিন্তু…।

সুঘরাই এক নূতন স্বর শুনিল…উহা ঐ পাখা নিজের ঠোঁটেই…বিশ্বাস করুন…খুঁচাইয়া মানে…ঔষধ পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে…তাই…

…ও সব কথা থাক্…খবরদার প্রাণী হত্যা হয় যদি তাহালে তোরই একদিন কি আমারই একদিন…আমি বুঝি না…ও অজ্ঞান…নড়বে চড়বে কোথায়…অত যদি তাহলে পায় দড়ি বেঁধে রাখ…সাজান-র চোটে বেচারীর জল খাবার বাটিটা পর্য্যন্ত সারিয়েছিস, ডোম না হলে এমন নির্ম্মম বুদ্ধি হয়।…চোখ নেই, বেচারী প্রায় 'খনই বসে থাকে…। যে এবং তিনি পাখীটারে সোহাগ জানাইতে কালেই পুনরায় বলিলেন, তো চন্নামেত্তর খাওয়া কেন? আমারই ভীমরতি!…তুই যে মুখপোড়া বলিস ওকে একবার মারলে আমি দশবার খাই…কৈ দেখি কোথায় তোর এমন ঘা…বজ্জাত…ঠাকুর, মাগো, এত লোককে তুমি সুমতি দাও, এই ডোম হারামজাদাকে একটু দিতে পার না…পাপ হয় জানিস না…ফের যদি খোঁচাবি!…

কিয়ৎ দূরেই সুঘরাই এই সতর্ক-আজ্ঞা মানিতে অবশ্যই প্রস্তুত হইলেও ইহাও সে জ্ঞাত করিতে উদ্‌গ্রীব, কেন না হস্তে-অঙ্কিত বিছা সে দেখে, যে শুধু তাহার দ্বারা কেন কিছুর দ্বারাই উহার ক্ষতিসাধন সম্ভব নহে, এ কারণ যে উহাতে এক রহস্যের গোড়া লাগিয়াছে; সুতরাং তাহার মুখে এক নির্ভাবনা অস্পষ্ট হইয়া

রহে, কিন্তু ইহা কতক্ষণ, অবিলম্বেই সে বুঝিয়াছিল যে তিনি তাহার দিকে অদ্ভুত-ভাবে তাকাইয়াছিলেন। যাহাতে তাহার অঃস্থল পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত, যেমন আর সে ত্রস্ত ছিল। যে ইহা সত্যই, তাহাকে তিনি অনেকবারই ঐ ধ্বনি সম্পর্কে মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছেন ; কিন্তু সুঘরাই কোন সময়ই মূল কারণ প্রকাশিতে সৎসাহস পায় নাই। মধ্যে মধ্যে অদ্ভুত কথা মনে আসিয়াছে, যে একদিন তুমুল বৃষ্টি হয় তখন বলিব একদিন সাগরি পাখী বাজের দ্বারা তাড়িত হইয়া কুয়োর ভিতরকার বট গাছে বসে তবে, তখন বলিব, একদিন আমার খুব জ্বর হইবে, তখন বলিব।

মোহিলি বলিয়াছে,···সব শুনিয়া যতদূর মনে হয় দেওঘরে যাওয়াটাই অঘটন হইয়াছে···ডোমের ছেলে···নিশ্চয়ই কোন ফুল বা প্রসাদী কিছু মাড়াইয়াছে··· কিম্বা কিছু ছুঁইয়াছে, কোন দেবস্থান বা···ভূত হইলে অনেকবিধ জ্বালাতন করিত, তবে সে হয়ত এইরূপে ধীরে ধীরে পাগল হইবে···তবে এখনই সব বুঝা যাইবে··· সুঘরাই কোথায় !

সত্বগুণশালিনী মনিব পত্নীর ডাকে সুঘরাই আসিল, ভৃত্যবৎসলা রমণী সুঘরাইকে আপন কক্ষে লইয়া বলিলেন,···বলবি ত বল, না হলে পাখী খোঁচান কি কথা মোহিলি তোকে আসা···। এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই যে সে মোহিলিকে একবার দেখিতেই তাহার আপনার দৃষ্টি যেন কোথাও বা নিবদ্ধ হইয়াছিল— সমক্ষে আয়না ছিল, সে ওষ্ঠদ্বয় জিহ্বার দ্বারা ঈষৎ বুলাইয়া কহিল,···আমি সেই চীৎকার যে কেন করি তাহা বলিতেছি···আমি পাগল নই···আমাতে কোন প্রেতাত্মা ভর করে না···আমি বহুজন্মের পুণ্য (!)—বলে এই বাড়ীর দাস··· এখানে আমি গেঞ্জী পরিয়াছি—বালিশ পাইয়াছি—এমন কি বর্ত্তনে খাই···বহু জন্মের পুণ্যবল আমার···তাই মাঠাকরুণ আমারে বৈদ্যনাথ লইয়া যান···আমি এক উৎকৃষ্ট রত্নসামগ্রী মণ্ডিত, শোভাযাত্রা দেখি ! যাহা ভগবান বৈদ্যনাথের কাছে যায়···

আর অলৌকিকত্ব ! ধর্ম্মশীলা মনিব পত্নী নিশ্চয় ইহা বলিয়া, করজোড় করিয়াছিলেন।

চৌকণা ছত্র-এর তলে অলোকসামান্ত বালিকা, হস্তে ধান্যমঞ্জরী···।

আ-ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী কাব্যবীজ। সম্পূর্ণ চিত্র মনিব পত্নীর সমক্ষে ভাস্বর হইল !

সেই নববধূ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার নাসাগ্রে চাহিলেন, তাহাতে সকলেই করজোড়ে কহিল, আমরা সুখী সুখী ! মুক্তি মুক্তি ! আ—সৌন্দর্য্য !

এবং সাধক সন্ন্যাসীবর্গ নববধূর ত্রিনয়ন দর্শনে নানারূপ ধ্বনি তুলিয়াছিল, এই বলিয়া সে বিচিত্র ধ্বনি সৃষ্টি করিতে থাকে।

আঃ আধ্যাত্মিকতা ! বলিতে সমস্ত শুদ্ধা ভক্তিমতী মনিব পত্নীর কেহ পুত রোমাঞ্চে ভরিয়া উঠিল। তাঁহার আয়ত বিশাল নয়নে অশ্রু সঞ্চারিত হইল।

ক্রমে যে তিনি নিষ্পলক শিখাবৎ – তিনি তাঁহাদের প্রিয় নীচকুলোদ্ভব ভৃত্যের প্রতি অতীব শ্রদ্ধায় চাহিয়া আছেন।

যে তখন সুঘরাই কহিতেছিল,…আমার খাঁচাটিরে তদ্রূপ আমি সাজাইতে অভিলাষী, আমার কেন কি জানি সমগ্র সজ্জা আমার এক কালে মনে পড়ে না… তাই আমি সেই সন্ন্যাসীবর্গের মত উদাত্ত স্বরে ধ্বনি তুলিয়া থাকি, কথা আমার যদিও মনে নাই, আমার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ ঘটে, আমি খাঁচাটিরে সাজাইতে চাই…সে ছত্র, সেই বিবিধ…সামগ্রী সমন্বিত…

পরম বিবেকী মনিব পত্নী আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ত তখনও আত্মস্থ, একদা মনে হইল, এই বালক অপরিমিত ! পরক্ষণেই খাঁচার দিকে নেত্রপাত করিলেন, বুঝিলেন যে কেন সুঘরাই খাঁচার অভ্যন্তর ইদানীং সাজাইয়া থাকে – সঠিক থামের মত প্রলম্বিত ফুল রেখা…পূর্ব্বে যেখানে সাজান, খাঁচার বাহির্দেশেই, প্রতিসম ছিল, উত্তর প্রতি-উত্তর ছিল এখন সেখানে ভেদ উপস্থিত, এক কেন্দ্র ধরিয়া নির্ম্মাণ সঙ্ঘটিত, এক বিস্ময় ! এবং তৎকালেই তিনি পক্ষীটিরে নিরীক্ষণ করিলেন, যাহা শ্রান্ত যাহা অপ্রাকৃতিক যাহা বেচারী ! যে এবং তিনি আমোঘ স্বরে বলিলেন ইহা পুরুষ !

সুঘরাই এবম্ভূত মনিব পত্নী উত্থাপিত সত্যের সমক্ষে তথাপি সমগ্র আবেগ দিয়া মহা ধ্বনি তুলিয়া সলজ্জ কণ্ঠে শুধু জানাইল, হয়ত সে কথা এইরূপ ! অবশ্য এই ধ্বনি এখন শেষের অক্ষর সুস্পষ্ট অভিধানে শ্রুত হইল !

ধর্ম্মপ্রাণা মনিব পত্নী কহিলেন, এতদিন কেন বলিসনি…আমি তেমন তেমন সাজিয়ে দেব, যাহোক এখন ডাক্তারকে আমি আসতে বলেছি, পাখীটা কেমন ধুঁকছে !…বুঝতে পারছি না হঠাৎ কেন এমন হল !…একে ত ভাজা করতে হবে…না হলে সব বৃথা… ।

সুঘরাই কহিল…আপনি ভাবিবেন না কাল শনিবার…আমি ড়াড়ুপোকা উহাকে খাওয়াইব আমাদের ঘরের পাশে ফণীমনসা হইতে পাতা চয়ন করিব… কেননা তদ্বারা ড়াড়ু ধরা বিধেয়…ড়াড়ু পোকা খাইলে উহার আরোগ্য হইবে… আপনি নিশ্চিন্ত হউন।

ডাক্তারবাবু পাখীর খাঁচাটি দেখিয়া অভিভূত, যে তিনি সন্তর্পণেই তাহা অবলোকন করিতে থাকিয়া প্রশংসায় কহিলেন,…অভিনব ! এরূপ কখনও দেখি নাই…সার্থক !

সুঘরাই আপনার নিন্দাকে কজা করিয়া টেবিলের একান্তে দণ্ডায়মান, যে সে এমন কি খাঁচাটির দিকে নজর করিতে সক্ষম নহে ! সে আপন পাখীটির গায়ে এখন হাত বুলাইতে থাকে।

ডাক্তারবাবু পুনরায় প্রকাশিলেন,…নিশ্চয়…ইহাতে আপনার লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত হাত নিশ্চয়ই হলপ করিয়া বলা যায় যে আছে…আহা ইহা যেন অলকাপুরীকে হার মানাইয়াছে !

এতাদৃশ গুণকীর্তনে ধীর সংস্বভাবা মনিব পত্নী কুণ্ঠায়ে বলিলেন,···আমি না, ছোঁড়াই অষ্টপ্রহর ঐ নিয়ে আছে···উনি বলেন ছোঁড়ার টেষ্ট আছে···থাচ্ছিল কাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে কিনে···ফুলগুনো বটে আমি করে দিয়েছি ···ছোড়ার কত সখ তাজা ফুলের মত গন্ধ হোক, তাই একটু পারফিউম দিয়েছি, তাজা ফুলে পোকা থাকে, পাখী ঠোকরায় দেখে, ও খোঁচায় ত···তাই বললুম···ও কি মানুষ !···সেই খুঁচিয়েই ত ঘা···এখন আবার আর এক জ্বালা মন্দিখানে না থাকলে···খোঁচাবে দেখুন দিকি···এই পর্যন্ত বাক্ত করিয়া মনিব পত্নী সুঘরাই-এর প্রেরণা, বাস্তবতা, অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে কহিয়া অনুরোধ জানাইলেন,··· এখন দেখুন ত ঘা-টা – নিম-ঘি এটা-সেটা সবই ত দিলুম···এ সবই জানেন ওঁর জন্যেই হয়েছে···উনি কিছুই বলেন না··· !

যে মনিব পত্নী বহুবারই তাঁহার স্বামীকে সুঘরাইএর কথা জ্ঞাত করেন, তদুত্তরে মনিব মহাশয় এই সব বলিয়াছিলেন,···দেখ···তুমি উহাকে কোন জ্ঞান দিবার আদেশ লইয়া আস নাই···উহারে কুড়াইয়া খাওয়া পাপ অস্বাস্থাকর বলিয়া অনেকে ক্ষান্ত হয়···আমরা তাঁহা নই··· । আর যে উহারা এত দুঃস্থ এত নিঃসহায়···পাপ কোথায়···বেচারীর নিষ্কৃতি পর্যন্ত নাই··· । সে দেহ সচেতন মাত্র নহে···দেখ না হাঁ করিয়া মুখ দিয়া মাছি ধরে··· ! আমাদের ভক্তির জোর থাকিলে উহার পাপও থাকিবে না··· । উহার পাপ আমরা লইব··· ! কেন না উহা তাহার নহে··· । ঠাকুর ভিন্ন গতি নাই··· । আমরা কেহ কিছু নই··· !

স্নেহময়ী মনিব পত্নী এবং সুঘরাইকে আজ্ঞা করিলেন,···মুখপোড়া ওকে উল্টে ধর না···আলতো করে ধর ! আমি টর্চ ফেলছি··· !

ডাক্তারবাবু পাখীর দিকে তাকাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করত মন্তব্য করিলেন···এখন থাক, এ কি পাখী এমন ঝিমাইয়া পড়ে কেন···যেন নিস্তেজ···উল্টাও ত···বুকটা চিতাইয়া ধর···একটা এসেন্সের গন্ধ যেন···

ঘা থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছিল, তাই আমি একটু পারফিউম দিলুম, অন্যায় হয়েছে··· ।

···তাহা নহে···তবে গন্ধক মানে···

···গন্ধক···গন্ধক !···এ বাড়ীতে ?···অবশ্য প্রথম আসার আগে গন্ধক ধোঁয়া দেওয়া হয়···ছোড়া গন্ধক কোথায় পেলি···ও বন্দুকের টোটা তৈরীর কলে বারুদে···তাই বা··· ।

···মানে মলম···হ্যাঁ নিশ্চয় কোন মলম এই দেখুন···নিশ্চয় এই মলম পাখী খাইয়াছে··· !

···কোথায় পেলি আমি ত দিই নি···তুই কি সেই ফেলে-দেওয়া টিউবটা থেকে···তাতে ত কিছু ছিল না···সেটা বিষ লেখা থাকলেও এত কি···নিশ্চয় তুই সেটা দিয়েছিলি···

…না…তাতে এমন কিছু হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না…তবে সাময়িক একটু কাজ করিয়াছে…তুমি ত বাপু বড় নিষ্ঠুর,…তুমি ত বড় তামসিক হে…দেখ কি করিয়াছ—শোৎ পুঁজ ছি ছি…খাঁচাটিরে এরূপ সাজাইতে যখন তোমার মন আছে…তখনই…ইহার জন্যই ত সাজান…ছিছি…যতবারই আমার খাঁচার প্রতি দৃষ্টি যাইতেছে ততবারই জানেন আমার মন হইতেছে যে এতেক মনোরমত্ব বুদ্ধি উহাতে আছে তাহা আমার কল্পনাতীত…যাহাদের ছটাক জমি পর্য্যন্ত নাই—যাহাদের তাল ও কাঁঠাল আর ছাতা খাইয়া জীবনধারণ…গরুর জন্য রক্ষিত ফেন বৈ অন্য কিছু যাহারা চুরি করিতে সাহসী নহে…পাড়া বাড়ীর গাছের শুকনা উড়ন্ত পাতা স্পর্শ করিতে যাহারা ত্রস্ত হয়, তাহাদেরই একজন এই বালক…তাহাতে এত সূক্ষ্মতা!…এই নিষ্ঠুর তোমায় পরিত্যাগ করিতে হইবে… পরিত্যাগ কর…তোমার কি মন চাহে না যে পাখীটিরে সকলে দেখিয়া সুখী হয়…! দেখ ত কি বিশ্রী গন্ধ বাহির হইতেছে…

যে সুঘরাই, ইহা বলার কথা নহে, ঐ উৎকট গন্ধ কখনও কখনও শুঁকিতে থাকিয়া, লোকচরাচরের চারিদিকে অপটু দৃষ্টিতে চোখ ফিরাইয়াছে বটে, কিন্তু সে ভীত নহে, যে ঐ গন্ধ কুৎসিত ইহা তাহার দ্বারা বিচারিত হয় না, এবং ইহাও নির্ঘাত যে তাহাতে অভাসিতও হয় নাই যে চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্যের নিমিত্ত উথত্তা তাহার অন্তরে আছে।

…ঠাকুর করুন তোমাতে মায়ামমতা দেখা দিক্!—ডাক্তার বাবু যেন প্রার্থনা করিলেন।

ডাড়ুপোকা ফণীমনসার পাতা দিয়া ধরিয়া তিতিরকে খাওয়াইবার বিধিমতে সে লুড়িয়া গ্রামের ঝাঁকাল মণীমনসা হইতে পত্রসংগ্রহে যায় এবং সেখান হইতে খাঁচাটি হাতে সুঘরাই যখন তাহার ভগনীপতির ঘরের সামনে তখন হাওয়াতে বৃক্ষের ডালসকল হইয়া অদ্ভুত রূপ ধারণ করিল, অদূরে কাতার দিয়া লুড়িয়া গ্রামের অনেক উলঙ্গ শিশু—ইহারা পড়িমরি করিয়া সুঘরাইকে অনুসরণে এখানে, ইহারা খাঁচাটি অবলোকনে সম্মোহিত। সুঘরাই হৃষ্টমনে চারিদিকে নেত্রপাত করে; সে সেই চির-অভ্যস্থ ঘেমো গন্ধ পাইল, কিন্তু খাঁচাটি টলে নাই, যে হয়ত ঐ গন্ধে সে নাসিকা কুঞ্চিত করিবার মুহূর্ত্ত পায় না, যে অথবা অবশ্যই এখনও কোথাও তাহার স্বভাবে সেই গন্ধ সহজ হইয়া থাকে। কোথাও কিম্ভূত হাড়ী কোথাও ছেঁড়া ছেঁড়া চটের থলি এতদিন ভরাসে যাহা লক্ষ্য হয় না, অদ্য তাহা স্পষ্ট; ভগনীপতি তাহাকে দেখিয়া, তাহার খাঁচা অবলোকনে এক কোদাল-হা হইয়াছে, সে কখনও কহিল, খুব…খুব…খুব বহুদিবস পরে আত্মীয় দেখিলে…এক পাতা চিঁড়া দধি দেখিলে, যে আমোদ সেই আমোদ হইল…। আপন রক্ষিত ও পোষ্য শুয়োরটিকে বারম্বার আজ্ঞা করিল,…দেখ দেখ। এইরূপে এতই সন্তোষ প্রকাশ করে যে তাহা অবর্ণনীয়, যে সে আপন উরুদেশে, আপন

বাহুতে, কখনওবা বৃক্ষের কাণ্ডে চাপড় মারিল, তাহার শুশ্রূষারটি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া পলাইয়াছিল, ক্রমে সে এতেক গর্ব্বিত যেমন যে তাহার বসিয়া খাইবার পুঁজি আছে। সুঘরাই ইহাতে ক্ষীত অসম্ভব, এতদিন পর ভগনীপতিকে আর মন্দ প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয় নাই।

ভগনীপতি আরও প্রকাশিল যে,···লোকমুখে শুনিয়াছি তোমার পাখী ও খাঁচার প্রশংসা···কতবার উহা দেখিতে সাধ হইয়াছে···তুমি ভয়ে আন নাই··· আমি কথা দিতেছি কখনই ইহা আমি কাটিয়া খাইবার কথা মুখে আনিব না··· আহা খাঁচাটি যেন বিবিধ অলঙ্কার-ভূষিতা রমণীসদৃশ,···না না উহাকে তাড়া দিও না···ঐ বিশ্রীদর্শন কুকুর দেখিয়া, এখানে নূতন লোক দেখিয়া ভড়কাইয়াছে··· বাহির করিও না উড়িয়া যাইবে···উহাকে লড়াই শিখাতেছ ত ? হ্যাঁ উহা মস্ত জব্বী হইবে···লড়াই লড়াই···এবং সকলেই তোমার পাখী দর্শনে চক্ষু সার্থক করুক, সকলেই গ্রামগ্রামান্তরে এই সংবাদ লইয়া যাক্ যে রিখিয়ার অন্তঃপাতি লুড়িয়া গ্রামের···হাড়িয়াল ডোমের শালার এক রূপবান পাখী আছে···একি তুমি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আছ কেন···আহা উহারে শাসাইও না···ছি ছি !

ইতিমধ্যে পাখীর ব্যবহারে সুঘরাই আরও অপদস্থ, এবং যে তাহাতে এবম্প্রকার বৈচিত্র্য আসিতেছিল যে তন্মুহূর্ত্তেই পাখীটিরে আক্রমণ করে, যে সে তীব্র কুপিত, মনে মনে সে আপন প্রিয়স্পদের উদ্দেশে মুখ খারাপ করে এবং অনেক গঞ্জনা অনেক আপশোষ তাহাতে বিস্ফারিত; যে যেমন···শালা তোমারে এত শিখাইয়া পড়িয়া আনিলাম···ডাক্তারবাবুর ঔষধই তোমার কাল হইল··· বেশ ত ছিলে···সারা দ্বিপ্রহরের আমার সাজানকে বানচাল করিলে···আমার মাথায় তেল দেওয়া গেঞ্জী পরা বৃথা হইল···আমি বাড়ি গিয়াই (মনিব বাড়ী) খাঁচা হইতে বহিষ্কৃত করিব···হলাড়ে রাত্রযোগে তোমার টুঁটি ধরিবে··· !

এখনও মায়ামমতাহীন রোষে সে যখন গর্জ্জাইতে আছে, তৎকালে ঝটিতি যে মনিব মহাশয়ের স্বর তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, যে এবং মনিব পত্নীকে সাক্ষাৎ দেখিল, ফলে সমস্ত মানসিকতা পরিবর্ত্তিত, এখন সে কাপুরুষ ! আপন সপক্ষে এইটুকু যুক্তি পাখীটিরে দিয়াছে, যে···আমি কি সাধ করিয়া রাগিতেছি···তোমার জন্যই ত সাজানরে মূঢ়, তুমি যদি তাহাতে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন কর তাহা হইলে কোন মানুষ না বিরক্ত হয়···তুমি জংলী, সাজান আমার প্রাণ···আমার সঙ্গ করিয়াও তুমি এখনও ভূত···আমারে দেখিয়া শিখিতে পার না···জান না সাজানর মধ্যে আমি কি দেখি, আমিও চাই সকলেই তাহা দেখুক !···আর নড়া চড়া করিও না, যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে।

সত্যই খাঁচাটি সাজানতে তদীয় বিশ্বয় নির্ভাজ নিখুঁত পূর্ণ মাত্রায় ঝমরিয়া উঠিয়াছে ; এমনও যে গাছে টানান লাল পোষ্ট-বক্স না-ছুঁইতে-পারার – হাট তলার পোষ্ট বক্স প্রত্যক্ষে সে ঝটিতি তাহারা···যে তাহারা সাক্ষাৎ পাপ ! —

খাঁট ব্যতীত পৃথিবীর পরেও যে আর এক সত্তা আছে যে তাহা সুঘরাইতে উদ্বিগ্ন, সে খাঁচাটি লইয়া মন্থরগতিতে চলিতে আছে, এখন তাহাতে ইতস্তত, মাত্রা আর নাই ! খানিক পথ অতিক্রম করিতেই এখন এমন হইল যে,—তাহাদের গ্রাম ও রিপিয়ার রাস্তার মধ্যে নলিনীবাবুর বাড়ীর পিছনে যে বিরাট প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ আছে, সেখানে অনেক জনসমাবেশ, অনেক খাটিয়া অনেক হুঁকা অনেক ধোঁয়া অনেক কাশির শব্দ অনেক কথাবার্ত্তা ; এক বৃহৎ চক্র দিয়া বহু লোক উপবিষ্ট—ইহা '…' জাতির সম্মেলন, মনুষ্যচক্রের কেন্দ্র, মধ্যখানে এক অগ্নি প্রজ্বলিত ; তন্নিকটে এক যুবতী আসীনা—সে কাঁদে, এবং হুঁকা খাইতে আছে—এই সেই যুবতী, একদা মধ্যরাত্রে তদীয় স্বামীকে হত্যা করে—শ্বশুরালয়েই এবং যে, সেই রাত্রেই সেইখান হইতে একটি মস্ত কাঁঠাল লইয়া প্রায় চার ক্রোশ পথ ভাঙ্গিয়া রিপিয়ায় পিত্রালয়ে পালাইয়া আইসে। এই যুবতীকে লইয়া মারাত্মক তর্ক, অন্যান্য জাতির লোকও এখানে উপস্থিত, মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই এখানে আছে—যাহারা অনাহূত তবু তাহারাও মাঝে মধ্যে যুক্তি সরবরাহ করিতেছিল ! এবং যেইমাত্র সুঘরাই সমবেতদের দৃষ্টিগোচর হয়—সেই ক্ষণেই এই বিজ্ঞ সম্মেলন প্রায় দৃশ্যাকার,শেষে, ঈদৃশ রোল উঠে যে—বালক যাহার সুন্দর তিতির আছে, ঐ সেই বালক যাহার খাঁচাটি দেখিতে মহারানী সমান, ঐ সেই বালক যে এখন খাঁচা লইয়া যায় !—যে এবং অজস্র হাতছানি ওতপ্রোত হইল।

ইহাতে সুঘরাই গর্ব্বমিশ্র অস্বস্তিতে আপনার স্বল্পস্থিত গামছায় ক্বচিৎ-ঘষ্ট দিল, তাহার এক পার্শ্বে রৌদ্র, পাখীর খাঁচা সমেত ছায়া তাহারই পদপ্রান্তে, ও যে তাহার পিছনে অনেক গ্রামের শিশু সকল ! এবং সমগ্র সভার অনুরোধেতে সে সকলের প্রীতি সম্পাদন পরতন্ত্র খাঁচা হাতে হস্তীগমনে অগ্রসর হয়।

প্রাচীন যাহারা তাহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী যাহারা ঘেরিয়া বসিয়াছে তাহাদের সকলকে—ইহারা প্রায়ই দূরাগত ভিন্নগ্রামের লোক-যখন সে দেখাইতে পরিক্রমণ করে, বিবিধ বিস্ময়সূচক আ আ শব্দের মধ্যেই সে শুনিল,—তুমি তোমার রুগ্ন পুরুষের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছ এবং অবশেষে তাহারে, প্রমাণ না থাকিলেও, সকলেই বুঝে, হত্যা করিয়াছে, এখন ঐ অগ্নির দিকে চাহিয়া বল, সেই সকালে··· এই দোষারোপ এক প্রাচীন কর্ত্তৃক সেই যুবতী উদ্দেশে ব্যক্ত, ইহাতে সুঘরাই সেই যুবতীকে তির্য্যক দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করে—তাহার মন ঘৃণায় বিষাইয়া উঠিল।

ক্রমে সে খাটিয়া আসীন প্রাচীনদিগের সমক্ষে আসিল, যাহাদের চক্ষু যেমন, কেমন কঠোর, তাহারা এখনও তন্ময় হইতে পারে, ভাবে আবিষ্ট হওয়ত এই অদৃষ্টপূর্ব্ব খাঁচা দেখিতে নিয়ত মস্তক ঘুরাইতে থাকিয়াও, খাঁচার অন্তর্বর্ত্তী পাখীর লক্ষণ সকল ইহারা উচিতরূপে ঠাওর অসমর্থ, সুতরাং কেহ খাঁচাটিতে

অঙ্গুলি দ্বারা টোকা দিতে যত্নবান,—যাহাতে পাখী সজাগ হয়, যে এবং কেহ ফোড়ন কাটিল,···পাখীটি নির্ঘাত মাদি···যদি তাহা নহে তবে এতেক ভীতু কেন? কেহ কহিল,···কেমন যেন করিতেছে?

বালক সুঘরাই ইহাতে অত্যধিক অবমানিত,—ঐ পরিহাস অসহ্য, যে এবং তৎকালেই সে দেখিল, তাহার সকল সংস্থান বিধ্বস্ত করত চঞ্চল, যে এহেন স্বেচ্ছাচারিতার কোন ক্ষমা সুঘরাইএর কোমলতার বাহিরে,—সে মানিতে প্রস্তুত না, যে তাহার রোগগ্রস্ত কাহিল তিতির আতঙ্কিত হইয়াই স্খলিত পদেই কিয়ৎ কাম্পিত মাত্র, আর যে সে স্থানকাল ভুলিয়া পাখীটিরে আক্রমণে উদ্যত, তৎক্ষণাৎ প্রাচীনমণ্ডলী হইতে তীব্র প্রতিবাদসূচক, সাবধান-করা-সূচক, গঞ্জনা-সূচক নিন্দাবাচক রকমারি শব্দ ছুটিয়া আসিল।

অতএব সুঘরাই নিবৃত্ত বটেই, তবু যে সে মর্মাহত থাকিয়া ক্রোধে ফুলিতে আছিল, প্রধানত এই কারণে যে সে কখনও ভাবে নাই, অর্থাৎ এ যাবৎ তাহার অজ্ঞাতই ছিল যাহা যে,—তদীয় তিতিরকে কেহ তাচ্ছিল্য করিবে; এখনই এই সূত্র হঠাৎ অভাসিত যে, গত হাটের দিন, কোন পথচারীরা—তাহারা কাঁধের বাঁক লইয়া থামে—একে অন্যকে, তাহারই তিতির বিষয়ে, অনেক সাধুবাদের পর মধুর স্বরে কহিল, ইহা দারুণ মরদ, অন্যও ইহারই স্মৃতি জাগরণ নিমিত্ত মেঘ হয়, বৃষ্টি আইসে; ইহা দারুণ মরদ, যদি এখন বনাঞ্চলে যায় ইহাই চলন্‌ভঙ্গীতে বন-স্থলীর মাদি কুক্কুট সকল অত্যাশ্চর্য্য সংকেত ভাষায় কণ্ঠ উন্নত করিয়া আমন্ত্রণ জানাইয়া পশ্চাদ্ধেশ স্ফীত করত উঁচাইয়া মাটিতে বসিবে, ইহা দারুণ মরদ, ইহার প্রখর সকাম চাহনিতে মনুষ্যসমাজের যুবতীজনের জঙ্ঘা ভারাক্রান্ত হয়!

এখন এই বিজাতীয় সভাতে বিমূঢ় বালক খানিক স্তব্ধভাবে অপ্রতিভ হইয়া যাপনের পরেই, যে আপনকার এক স্কন্ধ হইতে অন্যতে গামছা স্থাপনের পরেই, সদম্ভে ঘোষণা করিল, ইহা দারুণ মরদানা, ইহার কাঁটি সাক্ষাৎ যম, ইহা রমণী-তিতিরগণের আশ্রয়স্থল, ইহা নব-তিতির সকলের কালসদৃশ, ইহার সংহার-মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর···পক্ষাঘাত রোগ পর্য্যন্ত পলায়ন করে।—যে এবং ইহা ব্যাখানে সে এতই আবেগে এতই উত্তেজনাতে যে আরও যোগ দিল,···ইহা বহুরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, ভূখারির বানর হইতেও যথেষ্ট ইহা দক্ষ···গ্রামের অনেক বালক ইহার কসরৎ দেখিয়াছে, ইহার ক্রীড়নৈপুণ্যে মদীয় প্রভুরা চমৎকৃত হইয়া থাকেন···ইহা এক হাত হইতে অন্যটিতে ও মস্তকেও ইঙ্গিতমাত্র যায়, বিশুষ্ক পেয়ারা কাঠে ইহার কাঁটি বসে···লড়াইএ ইহা মজবুত! ইহা দারুণ মরদ!—এই আস্ফালনের পরক্ষণেই সুঘরাইএর গাত্রে ঘাম দেখা দেয়, সে স্থবির!

তখনই সভার চারিদিক হইতে, যাহাদের তিতির আছে—তাহাদের নিকট হইতে চ্যালেঞ্জ আসিল, তাহারা পরস্পর আপন আপন গ্রামের নাম কহিল, যথা সালোয়া, ধরমসী, রতনপুর, বড়কোয়া, শিমবারি ইত্যাদি···এবং তাহারা উঠিয়া

দাঁড়াইয়া আপনকার উরুদেশ উন্মোচন করিল – চর্মরোগ বিক্ষুব্ধ ক্লিষ্ট যাহা, সদর্পে তথায় চাপড় মারিল একের পর এক ! আর যে ঐ একের পর এক-কে অবিলম্বেই নির্ভীক সুঘরাই আপন ছোট উরু মেলিয়া রাবণিক ঔদ্ধত্যে চাপড়ে জবাব করিল ! কিন্তু অন্যেরা যাহাদের তিতির নাই তাহারা কসরৎ দেখিতে আগ্রহী ; নির্বোধ উপায়রহিত সুঘরাই তিতিরটিকে বাহির করিয়া আপন হস্তে বসাইতেই সে মাটিতে পড়িয়া দুএকবার পক্ষ আন্দোলনের পর বসিয়া চুপ।

যুগপৎ তুমুল হাস্যধ্বনি ও আলোড়ন উৎক্ষিপ্ত হইল ইহা কি লড়িবে, ইহাকে ঘৃতমিশ্রিত মাংসের ছাঁট খাওয়াও, ইহা মাদি নিশ্চিত – ইত্যাকার রব উঠিল। অন্যপক্ষে সুঘরাই যদিও তিতিরটিকে পদাঘাত করিতে পারিবে, কিন্তু যে তাহাতে সাড় ছিল না। একদা নির্ঘাতিত আহতদৃষ্টিতে তিতিরের প্রতি অবলোকন করত কহিল, বেশ বেশ, কল্যই কাহার গ্রামে যাইব বল – যাহা নিকটে তাহা বল ! – তাহার কানে দুএকটি নাম বিদ্রূপাত্মক হাস্যভেদে ভাসিয়া আসিল, অতঃপর সে কোনক্রমে মস্তক সটান রাখিয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিয়াছে !

সুঘরাইএর গাত্র অসম্ভব উষ্ণ, সে মতিচ্ছন্ন প্রায় যে সমগ্র খাঁচার সাজ হওয়াতে এবং চলা-র জন্য নিজ বস্ত্রের শব্দ, বড় হাস্যকর, সভার উপহাস তাহারে দগ্ধ করিতে আছে, আপশোষ পরম্পরাতে তাহার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত। সে এক আধবার শুধুমাত্র গামছাখানি এক কাঁধ হইতে অন্যত্রে লইয়াছে, কিন্তু বুঝায় যে সে তখনও এলাইয়া পড়ে নাই, যে সে হাটের পথে, টিলার দিকে, ডাড়ু পোকার সংগ্রহে, যেহেতু যায়। এমত সময় একদল চেঙ্গাররা তাহার পথ রোধ করিয়াছিল ; খাঁচা দর্শনে তাহারা মহা উচ্ছ্বাসে, গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড বলিয়া সুঘরাইএর প্রশংসাতে (এখনকার ধারা বশম্বদ কাহাকেও কালচারড রূপে সনাক্ত করে না) প্রকাশিল,... সত্যিই ছেলেটি আনকালচারড নহে !... মোটেই আনকালচারড নহে !...একেবারে আমাদের মতন মডার্ন, না ?

ইহাতে সুঘরাই যথাযথ ভদ্র-অভিব্যক্তিতে কিছু বিনয়ী হইতে কঠিন হইয়া রহে, যে সে অন্যত্রে দৃষ্টি সঞ্চার করিল, দেখিল, লাল পোষ্ট বক্সটি যাহা গাছের কাণ্ডসংলগ্ন, তদ্দণ্ডে সে যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে ! চেঙ্গাররা তাহারে অতিক্রম করিয়া এখন চলিয়া গিয়াছিল। সুঘরাই আপনকার বস্ত্রের শব্দ শুনিতে থাকে, যে সে এতই উৎক্ষিপ্ত যে মনে হইল পোষ্ট বক্স বিনষ্ট করে ! – যদি বিচার তাহার দ্বারা সম্ভব হইত সে মীমাংসা করিতে পারিত না এ ক্রোধ কেন, যেহেতু এতাবৎ পোষ্টবক্স ছুঁইত না, দুই এক হাট পূর্বে এই সংস্কারের বিরুদ্ধে ঢেঁড়া দেওয়া হইয়াছে ! – এখন সেই প্রথা কেন নির্মূল করা হইল, ইহাই তাহার রোষ – যেন একটি অধিকার, যেন একটি বিদ্বেষ তাহার খোয়া গিয়াছে – এই স্বাধীনতায়ে পুঞ্জীভূত অভিমান তাহাতে চক্র দিয়া উঠিল – অথচ সুঘাইএর জীবনে কোথাও ব্যর্থতা নাই !

এখন সে হিরণার টিলায় উপস্থিত, খাঁচাটি রাখিতে গিয়া আশ্চর্য্য যে সে যেমত ছুঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত, যে সে অবাক, এমন ক্ষেত্রে সহসা আপনকার হাতের উষ্ণীয় প্রতি নজর গিয়াছিল, যে সে যেমন বা কিম্ভূত ঘোরে, আপনার অঙ্গুলির তথা হাতের স্বাদ গ্রহণ করিতে চাহিল। যে কিন্তু তখনই তাহা এড়াইতে, এই বিশাল সুপ্রসারিত এলোমেলো স্থানসমূহের দিকে সে অবলোকন করিল। দিকে দিকে তাহার ঘর্মসিক্ত গেঞ্জী যেন রোদ, যেন সুস্থ হাওয়া খুঁজিতে আছে। যে সুঘরাই একটি অতীব জটিল শ্বাস ত্যাগ করিল! এ শ্বাস তাহার বর্ত্তনে খাওয়া হইতে গঠিত!

সে আপনকার ট্যাঁক হইতে ফণীমনসার পাতাগুলি বাহির করিতেছে সময়েই সে শুনিল কে যেমন বা 'আ তিতি' উচ্চারণ করিতেছে—যাহা দুজনকার আর তিতিরের একমাত্র ভাষা, আরও যে যুগপৎ সে প্রত্যক্ষ করিল যে তাহার আপনকার অঙ্গুলি দিয়া সে জমিতে ঘর্ষণ করিতে আছে। ইহাতে সে বিস্মিত হইয়াছিল। এবার সে পক্ষীর দিকে তাকাইল, দেখিল তাহা কোনমতে দণ্ডায়মান থাকিতে চেষ্টা করিয়াই বসিয়া পড়িল, দেখিল টুঙীগুলি দুলিতেছে, কাগজের ফুল সকল শঙ্কিত! তৎক্ষণাৎ সুঘরাইএর চক্ষু আরক্তিম হইল। সে খাঁচার দরজা সন্তর্পণে খুলিয়া পাখীটিরে অনুপ্রবিষ্ট করাইবার প্রয়াস পাইল, এবং যে সে কপট আদরে তিতি শব্দ করিতেই নিজেই উৎকর্ণ হয়, এ যেন মনিব পত্নীর অভিজাত স্বর, এ কারণে তাহার আপনার গ্রীবা কিছু উন্নত যে সে নিজেই তিতির, কিন্তু সম্মুখে রাজসিক সজ্জার অবস্থিত পাখীটিতে সে তখনই সচেতন, বুঝিল তাহার প্রিয় পক্ষীটি খানিক গ্রীবা তুলিয়া নামাইয়া লইল।

সুঘরাই আপনাকে সংযত করিয়া কয়েকটি ডাড়ু পোকা ফণীমনসার পাতায় রাখিয়া উহার সামনে ধরিয়াছে, এবং পুনরায় তাহাকে আহ্বান করিয়াছে, পাখীটি কোনমতে একটি পোকা খাইয়াই যেন ঢলিয়া পড়িতে চাহিল। সুঘরাই উহার রকমে ক্রমশ ক্রুদ্ধ, অমানুষিকতা তাহার হাতে ভারী হইয়া উঠে, তথাপি সে আপনাকে রুখিয়াছে! এই টিলার উপরে তিতিরটি যেন তাহার অপরিচিত, যেন তাহার কেহ নহে, কেমন স্যাংটা, সে সত্বর পক্ষীটিকে তুলিয়া খাঁচায় স্থাপিত করিয়া আপনার অভিপ্রেত সংস্থানে ভিড়াইয়া তাহারে চিনিতে ভালবাসিতে ব্যগ্র,—আশ্চর্য্য যে এখন বেচারী তিতিরটি খাড়া দাঁড়াইল, আশপাশে সবুজ নীল টুঙী চারিদিকে ফুলশোভা, মধ্যে মধ্যে আকাশ উল্লেখিত! ইহা দর্শনে সুঘরাই যেন লাফাইয়া উঠিল, কিছুদূর হইতে এই বৈচিত্র্য উপভোগ উদ্দেশে সে ঝটিতি দূরে টিলার উৎরাইতে খানিক নামিয়া চক্ষু ফিরাইতেই স্পষ্টই দেখিল তাহার তিতিরটি বিকটভাবে চক্ষু পৃথক করত কেমন এক ভাব করিতেছে—ধীরে উহার দেহভার এক পায়ের উপর ন্যস্ত হইল এখন তাহার দক্ষিণের ডানা ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইতেই সুঘরাইএর সাজান নষ্টপ্রায়।

ক্রুরমতি সুঘরাই সবেগে ছুটিয়া আসিল। পাখী যেন তৃষ্ণায় অথবা অন্য কিছুর জন্য তেমনই চঞ্চু ব্যাদানে আছে, ইহা তাহার চোখে পড়িলেও সে গ্রাহ্য করে নাই—সে মহা উন্মায় খাঁচীটি বাহির করিতেই যে রহস্য গোড়া বাঁধিয়াছিল তাহাই তাহার হাতে সাপের মত উঠিতে ক্রিয়াশীল!—সে যেন বিভীষিত; পূর্ব্ব হইতে বিদ্বেষে তাহার চক্ষুতে অগ্নি ক্ষরিতেছিল—এখন সে তৎপ্রবর্ত্তিত আপনার প্রিয় পাখীটিকে যারপরনাই জোরে আছাড় মারিল। পাখীটি গড়াইয়া উৎরাই বহিয়া খানিক তফাতে, ক্ষণেক নিশ্চলতার পরই মনসা পাতাতে ডাড়ু পোকা লইয়া সে ধাবমান—তিতিরের নিকট পৌছে, অহা এক কুৎসিত, তাহা এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য হইয়া আছে!

সে উহা তুলিতেই উহার লম্বমান সুশ্রী গ্রীবা শিথিল নেতাইয়া ঝুলিতেছে, সুঘরাই দমিল না, পক্ষী গাত্র হইতে আগত ম্লান বিদেশী পারফিউমের গন্ধে কোন মানসিকতা নাই, বরং তাহার চক্ষুদ্বয় কেমন যেমন বিকারগ্রস্ত, হঠাৎ তাহার হাতে পক্ষীর ক্ষতের রস যাহা আঠাল তাহা লাগিতেই সে এক পা সরিয়াছে মাত্র—যেখানে সরিয়াছে তাহা তাহার পলায়নের জগত—নিশ্চয়ই—এবং যুগপৎ সে সেই আঠা প্রথমে সচকিতে ও পরক্ষণেই গভীরভাবে শুঁকিয়াছে; ঐ গন্ধ বড় পরিচিত তাহাদের এবং হঠাৎ ইহাতে তিনবার বলিয়াছে যে আমরা ডোম—যে সে জানে নাই যে সে বলে এবং যে তদীয় হস্ত অস্থির ও সে ভূতচালিতের প্রায় পাখীর বক্ষদেশ হইতে অজস্র পালক পৌরাণিক দুর্ম্মতিতে উৎপাটিত করিতে কালে অচিরাৎ তাহার দেহের অভ্যন্তরে এক প্রলয়ঙ্কর হুঙ্কার ঘনিয়া উঠিল, অন্তপক্ষে পালক উৎপাটনে বেচারী পক্ষীটির অনেক ক্ষতই ওতপ্রোত—যেন সুঘরাইএর 'আমরা' বলাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিল—সত্রাসে ঐ সুঘরাই পক্ষী দূরে নিক্ষেপ করত—ঝটতি যে সে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে থাকিল, যাহা আতঙ্ক, যাহা বেদনা, যাহা আনন্দ, যাহা আহ্বান, যাহা জোড় প্রত্যাশার ডাক, এমনও যে ইহা তাহা নহে। মনোরম খাঁচাটি সে অতীব ক্ষিপ্রতায় হাতে লইতেই চীৎকার যেন আরও দুর্ম্মদ আরও খ্যাপাটে! উড়ন্ত পালকে সে আরও কুটিল।

ইহা চমৎকার যে সে সুঘরাই এইরূপে মিথ্যারে স্মরণ করিতে চাহিয়াছিল··· আ-আধুনিকতা! যে এবং শনৈঃ সে দৃঢ়তায়ে, স্থিরপায় টিলায় যেখানে ডাড়ু পোকার নিবাস, দাঁড়াইয়া খাঁচাটির প্রতি লুব্ধ নয়নে চাহিয়া আপনার চীৎকারকে আপনা হইতেই ছন্দিত করিল, যেমন সে ছন্দবিধি জানিয়াছে।

যে এবং এখন কে যেমন বাঙ্গীত গাহিতে আছে।

সমাপ্ত।

কবিতা

ভূমধ্যসাগর

শঙ্খ ঘোষ

আমাদের দেখা হলো আচম্বিতে
অধিকন্তু শীতে
পশ্চিমপ্রেরিত আমি, তুমি এলে পূর্বের প্রহরী
দুই প্রান্ত থেকে ফিরে আমাদের দেখা হলো ভূমধ্যসাগরে।

হাতে হাত তুলে নিই, তুমি স্রোতে কেঁপে ওঠো, বলো
'একী
কী সাজে সেজেছ নেশাতুর
তোমারও দুহাতে কেন কলঙ্করেখার উচ্ছলতা
দেখো কতো দীন হয়ে গেছ
সমস্ত শরীর জুড়ে বিসর্পিণী অত্যাচার অপব্যয় ছন্নছাড়া ভয়
এ তো নয় যাকে আমি রচনা করেছি স্তব্ধ রাতে
কেন তুমি এলে
আমাদের দেখা হলো এ-কোন্ শীতার্ত পাংশু পটে
পশ্চিমবিলাসী তুমি, আমি পূর্ব দুঃখের প্রহরী!'

ঠিক, সব জানি
আমরা অনেকদিন মুখোমুখি বসি নি সহজে।
তোমার শ্যামল মুখে আজো আছে সজীব সংসার

পটভূমিকায় ওড়ে সমুদ্রের আন্তরিক হাওয়া
আমি ভ্রষ্ট উপদ্রব নিয়ে ফিরি মেরুদণ্ড ঘিরে
এমন-কী সমুদ্রে ফেলি ছিপ
কিন্তু তবু
ছেড়ে দাও হাত, শুধু দেখো এই নীলাভ তর্জনী
ভূমধ্যসাগর
পুব বা পশ্চিম নয়, দেখো ওই দক্ষিণ জগৎ
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জন্মে ওঠে দূর বন্য অন্তরাল ভেঙে।
তাই এইখানে নেমে আমাকে প্রণত হতে হয়
আমারও চোখের জলে ভরে যায় অরুণা ধরণী
দুহাতে কলঙ্ক বটে, তবু
আমারই শরীর ভেঙে জেগে ওঠে ভবিতব্য দেশ
মৃত্যুর ঝমকে আর ঝোপে ঝোপে দিব্য প্রহরণে।
কলঙ্কে রেখো না কোনো ভয়
এমন কলঙ্ক নেই যা এই দাহের চেয়ে বড়ো
এমন আগুন নেই যা আরো দেহের শুদ্ধি জানে
তুমি আমি কেউ নই, শুধু মুহূর্তের নির্বাপণ
আমাদের ফিরে যেতে হয় বারে বারে
দেশে দেশে ফিরে ফিরে ঘুরে যেতে হয়
পরস্পর অঞ্জলিতে রাখি যতো উন্মত প্রণয়
সে তো শুধু জলাঞ্জলি নয়, তারই বীজে
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জেগে ওঠে আমাদের ভেঙে
তাই এইখানে নেমে আমাদের দেখা হলো সমুদ্রের পর্যটক তটে ॥

ধূপের মতন দীর্ঘ উড়ে যায় মেঘাচ্ছন্ন দিন
তোমারও শরীর আজ মিলে যায় সমুদ্রের রঙে
আমাদের দেখা হয় আচম্বিতে ভূমধ্যসাগরে।
কখনো মসৃণ নয় দেখো আমাদের ভালোবাসা
তোমাকে কতোটা জানি তুমি-বা আমাকে কতো জানো
তাই আমাদের ভালোবাসা
প্রতিহত হতে হতে বেঁচে থাকে দিনানুদিনের দগ্ধ পাপে
আমি যদি নষ্ট হই তুমি ব্যাপ্ত করো আর্দ্র হাত
তোমার ক্ষমার সজীবতা
আমার সত্তার আরো দীপ্য করে দেশদেশান্তরে

আর মধ্যজলে
চোখে চোখে জ্বলে ওঠে ঘোর কৃষ্ণ বিস্ফারিত সসাগরা তৃতীয় ভুবন।

•

ফেরার সময় হলো, এসো সব সাজ খুলে ফেলি
দুই হাতে আপন সংসার
নিয়ে চলো ঘরে

দিন হয়ে এলো ক্ষীণ ভূমধ্যসাগরে।

ফুল···ছুঁড়ে দিই ফুল

শান্তিকুমার ঘোষ

•

ফুল···ছুঁড়ে দিই ফুল মকরবীণার তারে বেজে ওঠে যদি
দিব্য ঝরণায় জাগে আনন্দলহরী
শুদ্ধ অনাহত স্বর
তুমি কুয়াশা-লণ্ঠন আনো, জ্বালো ঘৃত-দীপ
যদি তুষার মুকুট জাগে নিষেধ বিদারি
দেখবো রুদ্রের মুখ কল্যাণ সুন্দর
ওই ঈগল-চূড়ায় যেন পেতে আছে ডানা
উঠি ঊর্ধ্বে মই বেয়ে অপ্সরীর চেলাঞ্চল ছুঁয়ে
প্রতিফলনের স্তম্ভে সূক্ষ্ম
ঢেউ ধরাধরি

বিনয় ঘোষ

বিপ্লব মহানগর
মধ্যবিত্ত মার্কসীয় চিন্তাধারা

'The city is a cemetery of revolutionaries and resources. — Fidel Castro

'In the revolt of the backward peoples, the rich societies meet, in an elemental and brutal form, not only a social revolt in the traditional sense, but also an instinctual revolt — biological hatred. The spread of guerilla warfare at the height of the technological century is a symbolic event : the energy of the human body rebels against intolerable repression and throws itself against the engines of repression.' — Herbert Marcuse *Eros and Civilisation*, Political Preface 1966.

জলের উপর আগুন জলছে / জলন্ত আগুন জলে নিভছে না / কলিকালে হচ্ছে কি / উপাচার্য অপমানিত শিক্ষক লাঞ্ছিত / অশোভন উদ্ধত ভঙ্গি বিদ্রোহী তরুণ ছাত্রদের / তরুণীরা বেণী দুলিয়ে স্কুটারের পেছনসীটে দুরন্তবেগে উধাও / লোকসভা বিধানসভায় কেবল হাও-হাও-হল্লা / কর্পোরেশন থেকে পরিষদ বা শ্মশান কোথাও স্যাংকটিটি নেই শুধু ধস্তাধস্তি ঘুষোঘুসি ছুরিভোজালি / চাঁদে হাটছে নভোচর বাহাদুর আর্মস্ট্রঙ ভূচর দ্বিপদ চতুষ্পদ বেবাক অবাক / কোটি কোটি ডলারের বন্যায় যদি চন্দ্রগ্রহে ঘাঁটি গেড়ে কোন মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করে এই দুষ্টগ্রহ পৃথিবীটাকে আবার চাঁদের মতো জীবনশূন্য জীবশূন্য করা যায় / ঢাল নেই তলোয়ার নেই হতভাগ্য নিধিরামরা গেরিলাফোকো থেকে বল্লম আর হাতবোমা নিয়ে নিউক্লিয়ার বোমার মালিকদের শাসায় / দুর্গাপুর দমদম কানিং কেরল রুশচীনসীমান্ত সর্বত্র / কমরেডি কাটাকাটি কে সাচ্চা কে ঝুটা বিপ্লবী লেনিনশাস্ত্রমতে / এদিকে মন্দির মসজিদ মোল্লা পুরোহিত রক্ষা করা দায় / তার উপর মাছের পেটে বোমা কিশোর ছেলের হাতে বোমা সিনেমার সীটে বোমা

পোস্টব্যাগে বোমা হাসপাতালে বোমা বিবাহবাসরে বোমা শবযাত্রায় বোমা পরীক্ষাহলে বোমা / কালে কালে হল কি ঘোর কলি এল কি বুড়োবুড়িদের কান্না বানপ্রস্থীদের উষ্মা চেয়ারম্যানদের দেড়বেগতী হাঁই দুর্ভাবনায় পুঁজিপতিদের পেট ফুলে ঢাই / মহানগরের পথে পথে দেহবেচা দুটো টাকায় ফুচ্‌কা চৌরঙ্গির স্ট্র্যাণ্ডে স্ট্র্যাণ্ডে ময়দানে ঘুরপাক খাওয়া হোটেলে-বারে খানাপিনার হল্লা বাজার মন্দা মদ্যপানাধিক্যে সরকারী আয়বৃদ্ধি খাদ্যাভাবে বেসরকারী আয়ক্ষয় / বাবা তারকনাথের জয়ধ্বনিতে আকাশ কম্পমান পার্টিনেতার বক্তৃতায় করতালিতে মেদিনী কম্পমান / মহানগরের অলিগলিতে শত শত আশ্রমে ঐশী গুরুদের আত্মপ্রকাশ / হরিসভায় ভিড় ব্রাহ্মসভার শূন্যগৃহে চামচিকের উপদ্রব / উত্তর-অকটরলোনি শহীদ মিনারের পাদপীঠে বেকার সমকামুকদের নিবানিদ্রা / মুক্ত মেলায় কবিতাপাঠ বাউলগান হিপি তরুণ তরুণীদের বিচরণ / বোম্বে ডাইঙের সুইটহার্টশাড়ি স্কুটারশাড়ির বিজ্ঞাপন / মুক্ত অঙ্গনে অ্যাবসার্ড ড্রামার অভিনয় / বিবসনা চিত্রতারকার পোস্টার দেয়ালে / চীনে হোটেলে গ্লাটনদের কিউ / পার্কস্ট্রীটের ম্যাডহাউসে মত্ততার কলরব / লেনিনশরণির অলিগলিতে বোতল আর ছিপি আর পিপে আর পাপের বন্যাস্রোত শিককাবাব আর গোস্ত / পলি-মাটির স্যাতসেঁতে মহানগরের অন্ধকার কানাচে গেরিলাকোকো / শেক্সপীয়র-শরণির চারিদিকে রূপচাঁদ পক্ষীর গান 'ক্ষুদ্র লোক হয় রুদ্র ধন অহঙ্কারে / ধনহীনে ত্রিভুবনে মান্য কে করে'। চায়ের পেয়ালার ধোঁয়ায় সশস্ত্র বিপ্লবের আগুন আর চে গুয়েভারার কথা 'I believe in the armed struggle as the only solution for those peoples who fight to free themselves' / রাইটার্স বিল্‌ডিঙে খাঁটি বিপ্লবীদের পদধ্বনি এবং উত্তম চিত্রতারকাদের পদ-ধূলিতে অভূতপূর্ব শিহরন চিত্তচাঞ্চল্য / হরিনাম সত্য না ভিয়েৎনাম সত্য কামানজয়ী ক্ষমতা সত্য না ভোটজয়ী ক্ষমতা সত্য তা ঈশ্বর জানেন অথবা লেনিন / মনে হয় প্রতিদিন মৃতের মর্মরমূর্তিতে আর শরণির নামকরণে যেন মহানগরটা একটা প্রাগৈতিহাসিক মেগালিথিক মহাশ্মশান তার মধ্যে আবার অতিবৃদ্ধ ফকিরের কণ্ঠে গান 'জগতে মানুষ কেহ নাই, মনের মানুষ কোথা পাই', তান্ত্রিক বীজমন্ত্র হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ ফট্‌-এর মতো দুর্বোধ্য

সমাজ-জীবনের এই বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্র দিয়ে কোন 'মস্তাজ' রচনা করা সহজ-সাধ্য নয়। পরিবার থেকে বৃহত্তর সমাজ পর্যন্ত মনে হয় যেন জীবনের সুরতাল ছন্দ মাত্রা সব ভেঙেচুরে গেছে, কোথাও আর পরিচিত রাগরাগিণীর আলাপ শোনা যায় না। এত বিচিত্র বেসুর দিয়ে সিম্‌ফনি রচনা করা অসম্ভব। কিন্তু গড়নের যেমন ছন্দ আছে ভাঙনেরও তেমন ছন্দ আছে, সৃষ্টির তাল আছে, স্থিতির তাল আছে, লয়েরও তাল আছে। আজকের বেসুর বেতাল জীবন যত

আপাতবিসদৃশ উৎকট হোক না কেন, তারও একটা অন্তর্মিল আছে এবং সেটা খুঁজে বার করার দায়িত্ব আছে বুদ্ধিমান মানুষের।

মাত্র একপুরুষকালের মধ্যে মানুষের ধ্যানধারণা রীতিনীতি আশাভরসা স্বপ্ন-বাসনা আদর্শ আস্থা সমস্ত কিছুর মূল পর্যন্ত উপড়ে গেছে হঠাৎ একটা বেয়াড়া ঝড়ে। বহুকালের বাহুসুস্থিতি এবং এই অকস্মাৎ নির্মথনের মধ্যে কালিক দূরত্ব এত কম বলেই বুদ্ধিমানদের বিভ্রান্তি এত বেশি। অথচ পুরনো ঘোলাটে চশমা খুলে একটু তাকালেই দেখা যায়, যুগযুগান্তের বহুবিঘোষিত হৃষ্টপুষ্ট আদর্শের বিস্তীর্ণ ভাগাড় থেকে এই ঝড়ের উৎপত্তি। বেশি নয় একটা দৃষ্টান্তই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। 'ফ্রীডাম' (স্বাধানতা) বা মুক্তির আদর্শের কথা অনেককাল ধরে আমরা শুনে আসছি। আর্থিক স্বাধীনতা, বাণিজ্যিক স্বাধীনতা, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, কতরকমের স্বাধীনতার কথা। কিন্তু আজ শোনা যায় এই সমস্ত স্বাধীনতার গোরস্থান থেকে কেবল পাগলের আকাশফাটা অট্টহাসি। বিগত তিনচারশ বছরের ইতিহাসের ময়লা পাতাগুলোর উপর একবার চোখ বুলোলেই দেখা যায় সভ্যতার অগ্রগতির পথে সাধারণ মানুষের উপর যত অত্যাচার-বর্বরতার নির্বিকার অনুষ্ঠান হয়েছে তার অধিকাংশই এই 'স্বাধীনতা'র নামে। প্রচার করা হয়েছে 'স্বাধীনতা' যেন 'দেবতা', কিন্তু মিথ্যাপ্রচার, আসলে 'স্বাধীনতা' ধনতান্ত্রিক যুগের অভ্যুদয়কালের জারজ সন্তান। যেমন আর্থিক-বাণিজ্যিক স্বাধীনতার নামে সমাজে দারিদ্র্যের প্রসার এবং শোষণযন্ত্রের বিস্তার হয়েছে, যার ফলে সমাজে ও মানুষের জীবনের স্তরে স্তরে পরাধীনতার নাগবন্ধন দৃঢ় হয়েছে। ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার মুখোস পরে ব্যক্তি-দাসত্বের অভিনব নৃত্য চলেছে। এক একটা বিপ্লবের বিলোড়ন থেকে এক একটি 'স্বাধীনতা'র প্রত্যয় উদ্ভূত হয়েছে, তারপর সেই বিপ্লবের নায়কদের প্রভুত্ব বজায়ের স্বার্থে রচিত বিধিবিধানের বেদীমূলে সেই স্বাধীনতা বিসর্জিত হয়েছে। আজও ইতিহাসের এই আবৃত্তি শেষ হয় নি। ধনতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক কোন সমাজেই হয় নি। চণ্ডসিদ্ধদের চতুরালিতে বহুকালের ভূত যে তাদের স্কন্ধ থেকে নামে নি এবং কোন পরাধীনতার ছাঁদন ছেঁড়ে নি সে বিষয়ে আজ সাধারণ মানুষের চৈতন্যের উদয় হয়েছে। অবিমিশ্র ঘৃণা, অনির্বাণ প্রতিহিংসা, জ্বালানী জিঘাংসা দিয়ে এই সমুত্থিত চৈতন্যের প্রতিটি পরত গঠিত। এবং কেবল শাসকশোষক, চতুর চণ্ডসিদ্ধ, বুলিসর্বস্ব বিপ্লবী বা স্বেচ্ছাচারীদের দিকে এই চৈতন্য ধাবিত নয়, তাদের প্রতিমূর্তি এই সমাজের সংস্থাপ্রতিষ্ঠানসহ সমগ্র বিন্যাস বিলোপের দিকে চালিত। প্রাজ্ঞরা বলবেন এ হল হাস্যকর নৈরাজ্যবাদ, বালখিল্যের বিদ্রোহবিলাস। তা নয়, একেবারেই তা নয়। স্যাপলামের সঙ্গে হাতবোমা, হাইড্রোজেন বোমার পাশে বল্লম তীরধনুক, বাসি বুদ্ধির বিচারে হাস্যকর মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একেবারেই তা নয়। আমাদের মতো

ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী অথবা ধনতান্ত্রিক সমাজের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে পূর্বসংস্কার পরিহার করে অথবা বদ্ধধারণার মোহমুক্ত হয়ে বর্তমান সামাজিক রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন। পারতপক্ষে বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে বর্তমান নৈরাজ্যের আন্তর তাৎপর্য বোঝাই সম্ভব নয়, কারণ 'the intellectual will try to grasp the present through preconceived ideological constructs and live it through books' (Debray, পৃ ২১), এবং শ্রেণী হিসেবে শাসনশোষণের নির্ঘাতনযন্ত্রণা বুদ্ধিজীবীদের কোনদিন তেমন ভোগ করতে হয় নি। ইতিহাসে চিরদিন তাঁরা প্রধানত শাসকশ্রেণীর পারিষদের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, কাজেই তাঁদের মজুতবুদ্ধিতে বর্তমান সামগ্রিক নৈরাজ্য-বিক্ষোভ-বিদ্রোহের ব্যাখ্যা করা যাবে না। এমন কি যাঁরা বিপ্লবী তাঁরাও যদি তাঁদের গতানুগতিক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা নতুন করে revolutionize না করেন, তাহলে বর্তমানের 'Revolution in the Revolution'এর প্রকৃত মর্মোদ্‌ঘাটন করা তাঁদের পক্ষেও অসম্ভব।

নৈরাজ্যের অথবা বিদ্রোহের পূর্বধারণা বর্তমান সমাজে অচল। কারণ এর জাত আলাদা। যন্ত্রবিজ্ঞানের চূড়ান্ত উন্নতির যুগে, সমগ্র মানবসমাজ নিশ্চিহ্ন করতে পারে এরকম নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নির্যাতিত মানুষ প্রায়-নিরস্ত্র অবস্থায় গেরিলাবাহিনী গঠন করে যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সংকল্প করে যে পদে পদে সশস্ত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়েই তারা মুক্তির পথে, প্রকৃত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হবে, তখন মনে হয় না কি যে এ বিদ্রোহের জাত আলাদা! বহুকালের নির্যাতন পীড়ন শোষণ ও বৈপ্লবিক শঠতার বিরুদ্ধে এ হল সমগ্র মানবসত্তার বিদ্রোহ। এ হল 'instinctual revolt', 'biological hatred'এর বিস্ফোরণ (Marcuse ১, Political Preface 1966)। নিউ-ক্লিয়ার মারণাস্ত্রের সামনে নিরস্ত্র মানুষের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের অঙ্গীকার হল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্নায়ুপেশী শিরাউপশিরা দিয়ে প্রতিরোধসংগ্রামের অঙ্গীকার। দেহের প্রতিটি অঙ্গ তার অস্ত্র এবং দেহের ভিতরে স্নায়ুপেশী শিরায় শিরায় যখন ঘৃণা ও প্রতিহিংসাজনিত জিঘাংসার আলোড়ন হয় তখন প্রতিটি অঙ্গ বুলেট-দুর্ভেদ্য হয়ে উঠে, বজ্রমুষ্টিও অ্যাটমবোমাকে রুখে দাঁড়ায়। যেমন কিউবায় ভিয়েৎনামে বলিভিয়ায়, যেমন তরুণবিদ্রোহে ছাত্রবিদ্রোহে। যেমন চন্দ্রগ্রহজয়ী আমেরিকান দৈত্যদের স্নাপলামী নৃশংসতার বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামীদের বজ্রমুষ্টির প্রতিরোধ, যেমন চেকোস্লোভাকিয়ায় ব্রেজনেভী স্বাধীনতা উপঢৌকনের বিরুদ্ধে চেকজনসাধারণের নিজস্ব স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই 'স্বাধীনতা'! চারজন তরুণী ও একজন তরুণ বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের কার্যালয়ের সামনে চেকোস্লোভাকিয়ার সমাজ-তান্ত্রিক সতীত্ব রক্ষার্থে সোভিয়েটের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন উলঙ্গনৃত্য করে এবং সমবেত দর্শকদের সামনে সোভিয়েট পতাকা

অগ্নিদগ্ধ করার পরে পোশাক পরিধান করে ঘরে ফিরে যায়[১]। উলঙ্গনৃত্য বজ্রমুষ্টি সবই আদিম ব্যাপার। 'biological hatred'এর প্রকাশ বলেই আজকের গণবিদ্রোহে আদিমতার উপাদান এত বেশি। অস্থির অশান্ত অবাধ্য তরুণ ছাত্রদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় নামক 'বিধান'-উৎপাদনের কারখানার উপাচার্য-অধ্যাপকদের নাজেহাল বা অপমানিত হওয়া নিশ্চয় তরুণীদের উলঙ্গ প্রতিবাদনৃত্যের মতো আদিম বা অশোভন নয়, অতি নগণ্য ব্যাপার মাত্র।

প্রশ্ন হল, এবং খুব বড় প্রশ্ন, আজকের মানুষের প্রতিবাদ বিক্ষোভ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কেবল মাত্রিক নয়, এরকম চারিত্রিক পরিবর্তনের কারণ কি? যে ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এগুলি ঘটছে তার প্রকৃতি অনুধাবন করতে না পারলে জনসংগ্রামের এই পর্যায়ান্তর দুর্বোধ্য মনে হবে। প্রথম ও প্রধান কারণ হল, গত একশ বছরের মধ্যে নিপীড়িত মানুষের একমাত্র অবলম্বন ও অনুপ্রাণনার উৎস বৈপ্লবিক মার্কসীয় চিন্তাধারায় পরিপার্শ্বের পঁয়োনালী থেকে রাশি রাশি আবর্জনা এসে ঢুকেছে এবং তার ফলে মানবেতিহাসের সবচেয়ে বেগবতী বলিষ্ঠ চিন্তা-প্রবাহের পথে অনেক পঙ্কিল আবর্ত, অনেক বদ্ধসংস্কারের ডোবা, অনেক বিকার বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। মর্মান্তিক হল যেদেশে অর্ধশতাব্দীর উপর মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত যে দেশ ছিল সারা পৃথিবীর শাসিতশ্লেষিতের শ্রেষ্ঠ আশাভরসাস্থল, সেই দেশ (সোভিয়েট ইউনিয়ন) হয়েছে আজ মার্কসীয় চিন্তাবিকৃতির শ্রেষ্ঠ নায়ক। তার সমস্ত ঐতিহাসিক সামাজিক কারণ বিশ্লেষণ করার অবকাশ এখানে নেই, কিছু কারণ সংক্ষেপে আমরা উল্লেখ করব। তবে মূল কারণ মনে হয়, মার্কসীয় চিন্তাধারায় মধ্যবিত্ত

---

১. New York, September 9, 1968 : 'Four girls and a young man danced naked outside the United Nations Headquarters in protest against the Soviet invasion of Czechoslovakia. After burning a Soviet flag in front of 50 onlookers last night, the protesters put their clothes on and walked away—' (*Reuter*). সোভিয়েট সামরিক অভিযানের বছরপূর্তি উপলক্ষে চেকজনসাধারণ ও তরুণরা সর্বত্র সোভিয়েটবিরোধী বিক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করে শোভাযাত্রা করে। ব্রেজনেভনীতির বিরোধী মস্কোর ১৬ জন বুদ্ধিজীবী এই উপলক্ষে চেকবাসীদের জানান : 'We declare our solidarity with the people of Czechoslovakia, who wished to prove that *socialism with a human aspect* is possible.' (Moscow, August 21, 1969—*Reuter*) — Italics লেখকের।

নিম্নমধ্যবিত্তের প্রাধান্য, এমনকি মার্কসীয় বিপ্লবোত্তর কালেও। তাই মধ্যবিত্ত-সুলভ যাবতীয় গোঁড়ামি সংস্কার চিত্তদৌর্বল্য স্বার্থপরতা আত্মম্ভরিতা সুবিধাবাদ আজ মার্কসীয় চিন্তধারাকে পঙ্কিল করে তুলেছে। এরই অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে বলা যায়, মার্কসীয় পার্টিগত নেতৃত্বে পুরুষান্তর ব্যবধান (generational gap) বেড়েছে, উপরে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর দীর্ঘকালীন প্রভুত্ব কায়েমের ফলে এবং এত বেড়েছে যে প্রবীণ প্রৌঢ়দের সঙ্গে তরুণ যুবকদের চিন্তাধারার কোন সংযোগ নেই। আজ পৃথিবীব্যাপী তরুণবিদ্রোহ ছাত্রবিদ্রোহ এবং 'student power' বা 'youth power' নামে তৃতীয় শক্তির (শ্রমিক কৃষক ছাড়া) অভ্যুত্থানের অন্যতম কারণও এই পুরুষান্তর বিচ্ছেদ। গণতন্ত্রের নামে সর্বত্র বৃদ্ধপ্রৌঢ়তন্ত্রের প্রতিপত্তি, ডেমক্রাসির পরিবর্তে জেরন্টক্রাসি, বৈপ্লবিক মার্কসিস্ট পার্টিতেও। এক নতুন শাসকশ্রেণী আমলাশ্রেণীর আবির্ভাব, অচল অটল অনড়।

দ্বিতীয় কারণ, যে-ধনতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণে মার্কসীয় চিন্তাধারার উৎপত্তি, পরবর্তীকালে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির ক্রমোন্নতির ফলে সেই ধনতন্ত্রের আদত রূপ ঠিক থাকলেও বাহ্যরূপের এমন ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে যা পঁচাশ বছর আগেও সম্ভব হয় নি। এমনকি পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেও ধনতন্ত্রের বর্তমান রূপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে নি। অত্যুন্নত বস্তুশিল্পসমাজে আজও বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ধনতন্ত্রের অগ্রগতির দরুণ সাধারণ মেহনতী মানুষের দুঃখদারিদ্র্য ক্রম-বৃদ্ধির (increasing immiseration) যে প্রাথমিক মার্কসীয় ধারণা তা আজ অনেকটাই পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কারণ বস্তুবিজ্ঞান ও টেকনোলজির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আজ ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য এমন এক উন্নত স্তরে পৌঁছেচে এবং প্রচারকলাকৌশলে (advertisement) এমন এক লোভনীয় শিখরে ভোগেচ্ছাকে উন্নীত করা হয়েছে ও নিয়ত হচ্ছে যে মেহনতী মানুষ তাতেই নেশাখোরের মতো বুঁদ হয়ে আছে। কৃত্রিম পণ্যময় সমাজে এক বিচিত্র সুখোচ্ছ্বাসের তরঙ্গে ও দিবাস্বপ্নে সকলে সর্বদা ভাসমান। মূলধন ও মেহনত, মালিক ও মজুর, বড়সাহেব ও ছোটকেরানী সকলে আজ একই তরণীর সহযাত্রী — অদম্য ভোগেচ্ছা-তরণীর — দিগন্তবিস্তৃত পণ্যসমুদ্রে। কোম্পানির চেয়ারম্যান ও তাঁর লেডি টাইপিস্টের মনের গড়নে কোন পার্থক্য নেই, কারখানার মালিক ও শ্রমিকের শ্রেণীগত বিরোধও শ্রমিকের ক্রমবর্ধিষ্ণু সুখচৈতন্যের অন্তরালে ঝাপসা হয়ে গেছে। অত্যুন্নত পণ্যশিল্পসমাজের এই টেকনোলজিক্যাল ঔদার্য অস্বীকার করে, তার অকৃপণ ভোগেচ্ছাপূরণের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে, শতকরা ক'জন মেহনতী মানুষ বা কারখানার শ্রমিক আজ তার অন্তরালবর্তী ধনতান্ত্রিক কঙ্কালের দিকে চেয়ে দেখবে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার আকঙ্কাল পরিবর্তনে উৎসাহিত হবে? অথচ এই উন্নত আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে মার্কসীয় আত্মবিচ্ছেদের (alienation) সত্যতা শতগুণ বেশি অকাট্য

প্রমাণিত হয়েছে। যদিও তার আদল অনেকটা পাল্টে গেছে, তাহলেও বর্তমান উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজে এই আত্মবিচ্ছেদের ব্যাদান মানুষের মনে যে অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই আত্মবিচ্ছেদের ফলে বেদনা নৈরাশ্য ও আত্মবিকার সমাজে ক্রমেই দৃঢ়মূল হয়েছে, বৈপ্লবিক চেতনা ভোঁতা হয়ে গেছে আরও বেশি। কাজেই সবদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, আধুনিক উন্নত ধনতন্ত্র তার টেকনোলজিক্যাল বদান্যতায় সমাজটাকে এমন এক বিশাল মধুচক্রে রূপান্তরিত করেছে যার মধ্যে মানুষ মৌমাছির মতো আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। উৎপাদনযন্ত্রের মতো প্রশাসনযন্ত্রেরও (administrative machinery) চরম টেকনোলজিক্যাল উন্নতি হয়েছে এবং তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে বর্তমান সর্বজনতন্ত্র বা mass democracyর নিয়ন্ত্রণ। এই ধনতান্ত্রিক সমাজের সর্বজনতন্ত্রের বিশেষত্ব হল এও একটা 'অ্যাপারেটাস' 'ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট' যান্ত্রিক মুখোস বা অবগুণ্ঠন, যার অন্তরালে উৎপাদন-উৎসাদনের কলাকৌশলসহ রাষ্ট্রনায়করা সহজেই গা-ঢাকা দিতে পারেন এবং কি পরিমাণ মানবিক শক্তি অপচয় করে সমাজে তাঁরা পণ্যসুখ বিতরণ করছেন তাও লোকচেতনা থেকে অপসারিত করতে পারেন[২]। এই অবস্থায় উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিহতি (containment of social change) আজ অনস্বীকার্য রূঢ় সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে (Marcuse ২, ৩)। অথচ এই অবস্থা যে ধনতন্ত্রের অতিবার্ধক্যের উপসর্গ অথবা তার প্রাস্থানিক পর্ব তা মোটেই বলা যায় না।

ঐতিহাসিক পরিস্থিতির এই পর্যালোচনা বর্তমান সমাজের জনবিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের চারিত্রিক পরিবর্তনের কারণগুলির উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। কিন্তু পর্যালোচনার আরও একটু বিস্তার প্রয়োজন। তা না হলে আজকের তরুণের বিদ্রোহ অথবা নিরন্ন নিপীড়িত মানুষের সশস্ত্র বিপ্লবের অঙ্গীকারের মূলপ্রেক্ষণ সম্ভব নয়।

একালের ধনতন্ত্রের উপসর্গমণ্ডলীর (syndrome of late capitalism)

---

২. 'Mass democracy provides the political paraphernalia for effectuating this introjection of the Reality Principle···it also allows the masters to disappear behind the technological veil of the productive and destructive apparatus which they control, and it conceals the human (and material) costs of the benefits which it bestows upon those who collaborate.'— Herbert Marcuse : *Eros and Civilisation*, Political Preface 1966 (England 1969).

অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, উৎপাদন ও উৎসাদন, ভোগনিবৃত্তি ও উৎপীড়ন-দমন, স্বাধীনতা ও দাসত্ব, যুক্তি ও অযুক্তি, এই ধরনের বিপরীতধর্মী সমাজকর্মগুলি একটি অবিচ্ছেদ্য অখণ্ডমূর্তিতে, যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের গুণে, জনমানসে প্রতিভাত হয়। ধনতান্ত্রিক Welfare State হল Warfare Stateএর নামান্তর এবং তার লক্ষ্য হল 'progressive brutalization and moronization of man' (Marcuse ৩)। উনিশ শতকে, এমন কি বিশ শতকের প্রথম পর্বেও, ধনতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েটের শ্রেণীবিরোধের যে মার্কসীয় চিত্র বেশ স্পষ্টাকারে দেখা যেত, পরবর্তীকালের ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির ফলে তা অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। উন্নত টেকনোলজির যুগে ধনতান্ত্রিক সমাজের বর্তমান রূপ দেখলে মনে হয় না যে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েটের সেই আদিরূপ অবিকৃত আছে এবং তাদের পরস্পরসংঘাতের ভিতর দিয়ে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটবে[৩]। তাছাড়া টেকনোলজিক্যাল গতির প্রবণতাই হল টোটালিটেরিয়ান সামগ্রিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দিকে। পণ্যশিল্পোন্নত সমাজের উৎপাদন-বণ্টনের টেকনিক্যাল কলাকৌশল (অটোমেশনের অগ্রগতিসহ) শুধু যে সমাজের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম পেশাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়, সমগ্র আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক জীবনের চাহিদা থেকে সেই চাহিদা-নিবৃত্তির উপাদান পর্যন্ত নির্ধারণ করে। লক্ষণীয় হল টেকনোলজির এই পূর্ণ কর্তৃত্বের প্রভাব বর্তমানে উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের চৌহদ্দি পেরিয়ে অনুন্নত অর্ধোন্নত ক্রমোন্নত সমাজে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, এমনকি 'ক্যাপিটালিজম্' ও 'কমিউনিজম্'-এর বিকাশের মধ্যেও উপসর্গগত সাদৃশ্য স্থাপন করেছে (Marcuse ২)।

অগ্রসর ধনতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েটের শ্রেণীগত বিস্ফোরণ-সম্ভাবনা যে অনেক কমে গেছে তা অস্বীকার করার অর্থ হল বাস্তব ইতিহাস অস্বীকার করা। শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হয়েছে ঐকত্রিক দরকষাকষির আন্দোলন, বাজারের ক্রেতাবিক্রেতার মতো, তার মধ্যে বিদ্রোহ-বিপ্লবের কোন নামগন্ধ নেই, তার কোন চৈতন্যও নেই। তার ফলে 'লেবর অ্যারিস্তক্রাসি' 'হোয়াইট কলার ইউনিয়নিজম' এবং অবিমিশ্র 'ইকনমিজম্' মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে 'সামাজিক শ্রেণী' (social class) সম্বন্ধে বনেদী মার্কসীয় প্রমিতির (Marxian concept)

---

৩. '…the capitalist development has altered the structure and function of these two classes in such a way that they no longer appear to be agents of historical transformation'. – H. Marcuse : *One Dimensional Man : The Ideology of Industrial Society* (Sphere, London 1968) p. 11.

ক্ষেত্রে। গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিশেষ করে) সামাজিক শ্রেণীর মার্কসীয় বিচারপদ্ধতিকে এবং মার্কসীয় বিন্যাসকে সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌রা (Sociologists) এত তরল ও ঘোলাটে করে দিয়েছেন যে তার লেজামাথা কিছুই ধরা ছোঁয়া যায় না। আমেরিকান ফরাসী ও জার্মান সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌রাই এই শ্রেণীভেদ তরলীকরণের কাজে অগ্রণী হয়েছেন সবচেয়ে বেশি, বিশেষ করে আমেরিকানরা। বস্তুত সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক মনোবিজ্ঞানের (Social Psychology) ফলনপ্রাচুর্য আমেরিকার অগ্রসর ধনতান্ত্রিক সমাজের উর্বর টেকনোলজিক্যাল জমিনেই সম্ভব হয়েছে, কারণ এই দুটি বিদ্যার অন্তরঙ্গ সহযোগিতাও এই সমাজের সঙ্গে সর্বাধিক। এখানে প্রসঙ্গত ফরাসী ছাত্র-বিদ্রোহের (১৯৬৮) কথা মনে পড়ছে। সামাজিক মনোবিজ্ঞানের ছাত্ররা (Nanterre বিশ্ববিদ্যালয়ের) তাদের পাঠ্যবিষয় অনাবশ্যকভাবে অত্যন্ত অ্যাকাডেমিক মনে করে পরীক্ষা বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মিলিতকণ্ঠে 'ইণ্টারন্যাশনাল' গান করে এবং 'Why do we need sociologists ?' নামে একটি প্রচারপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্‌পাসে বিলি করে। এই প্রচারপত্রে বর্তমানকালের সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু বক্তব্যের মধ্যে দু'তিনটি বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম বক্তব্য অ্যাকাডেমিক সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বুজরুকি বর্তমান ধনতান্ত্রিক টেকনোলজিক্যাল সমাজেরই ফাঁকা প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়। দ্বিতীয় বক্তব্য—সামাজিক মনোবিজ্ঞান নামক বিদ্যাটি এই ধনতান্ত্রিক সমাজের আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণীর সর্বপ্রকার স্বার্থ রক্ষার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। তৃতীয় বক্তব্য—'American sociologists have discarded the very concepts of classes and the class struggle, substituting the theory of a continuous scale of increasing status.'[৪] আমেরিকা নয় শুধু, অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের সমাজবিজ্ঞানীদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়।

যন্ত্রজগতের টেকনিকের মতো আধুনিক সমাজবিজ্ঞানও কেবল অন্তঃসারশূন্য টেক্‌নিকের ('methodology' বলা হয়) কসরৎ, বিচিত্র প্রমিতিক ঘুঘুৎসু এবং নিছক পারিভাষিক (terminological) ভোজবাজি প্রদর্শনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। দু'তিন কিলোগ্রাম ওজনের, গড়ে আশীনব্বুই টাকা মূল্যের আমেরিকান সমাজ-বিজ্ঞানীদের বইগুলিতে দেখা যায় সারবস্তু সামান্য, বাগাড়ম্বর অত্যধিক এবং অসহ্য। এহেন সমাজবিজ্ঞানের উৎপাদনও আমেরিকায় অটোমোবিল ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে হচ্ছে। আর এই আমেরিকান সমাজ-

৪. Daniel Cohn-Bendit and Gabriel Cohn-Bendit: *Obsolete Communism, The Left-Wing Alternative*, London 1968, পৃ ৩৫-৪০.

বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক প্রভাববিস্তার, বিশেষ করে এসিয়ার অনুন্নত অর্ধোন্নত দেশগুলিতে, লক্ষণীয় ব্যাপার।* অনুন্নত দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে আমেরিকান ডলারের আমদানি ও ইনভেস্টমেণ্টের মতো আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানেরও (ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানসহ) আমদানি হয়েছে। উভয়ের উদ্দেশ্য একই, মার্কসীয় নীতির ভিত্তিক্ষয় করা, শ্রেণীবিন্যাস শ্রেণীসংগ্রাম শ্রেণীভেদবোধ সম্বন্ধে মার্কসীয় মানগুলিকে নস্যাৎ করা। যেমন আধুনিক ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে অধিকাংশই আমেরিকানদের মন্ত্রশিষ্য এবং তাঁদের গবেষণা ও কাজকর্ম প্রধানত আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান-বিজ্ঞানীদের রীতিনীতি অনুযায়ী পরিচালিত[৫]।

সমাজে 'শ্রেণী' বলে গণ্য হতে পারে এরকম স্থিতিশীল কোন মানবগোষ্ঠী নেই এবং শ্রেণীর কোন অচল সংজ্ঞাও নির্দেশ করা যায় না। এই হল আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীদের প্রতিপাদ্য। *class stratum status elite* এবং এই ধরনের কতক-গুলি প্রত্যয়ের সাহায্যে বর্তমান সমাজের গতিশীল রূপ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, শুধু শ্রেণীর মতো কোন বদ্ধধারণা দিয়ে করা যায় না। ক্লাস স্ট্রেটাম স্টেটাস এলিট এগুলিরও আবার উঁচুনিচু স্তরভেদ আছে অনেক এবং স্তর থেকে স্তরান্তরে ওঠানামার সুযোগ সম্ভাবনাও আছে সমাজে। সুযোগ সম্ভাবনা সকল মানুষের সমান নয় এই পর্যন্ত, অবস্থাগুণে ও বংশগুণে 'automatic increment'-এর দৌলতে (Schumpeter ১) কারও সুযোগ বেশি, তার অভাবে কারও কম। কিন্তু মনোভঙ্গি বাল্যকাল থেকে দৃঢ় হলে (যেমন 'achievement orientation'— McClelland) এই সুযোগের অসমতা অতিক্রম করা খুব কঠিন নয়। বিজ্ঞানীদের এই ব্যাখ্যার গুণে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজটাকে মনে হয় যেন 'snake and ladder' খেলার বোর্ডের মতো। ব্যক্তিদের খেলার গুণে, এবং সমাজবিজ্ঞানীদের social mobilityর ইন্দ্রজালগুণে লেজ থেকে মাথায় ওঠা যায়, মইয়ের নিচের ধাপ থেকে উপরের ধাপে ওঠা যায়, আবার নামাও যায়।

---

*এসিয়ার দরিদ্র দেশগুলিতে (যেমন ভারতে) আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানের বই সুলভ মূল্যে প্রকাশ ও বিতরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

৫. আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি এবং ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীদের তার অনুগমন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়পরিধির মধ্যে সম্ভব নয়, পৃথক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। সংক্ষেপে তাই আমরা এখানে শুধু উভয়ের মনোভঙ্গির সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করলাম। 'সামাজিক শ্রেণী' সম্বন্ধে আমেরিকান-জার্মান-ফরাসী সমাজবিজ্ঞানীদের নব্যধারণার উদ্ভাবনও অত্যন্ত আকর্ষণীয় আলোচ্য বিষয় হতে পারে। এখানে তার আভাস দেওয়া হল মাত্র। এবিষয়ে প্রবন্ধের শেষে 'গ্রন্থপঞ্জী' দ্রষ্টব্য।

সমাজে সকল মানুষই 'ক্লাইম্বার' এবং মুনাফা জীবিকা প্রতিষ্ঠা সবকিছুর অবাধ প্রতিযোগিতা হল মই-মই খেলার মতো। ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সামাজিক 'মোবিলিটি'র এমনই মাহাত্ম্য যে সামান্য 'লেবর' বা 'ফার্মার' বা 'লোয়ার মিড্‌ল' – চেষ্টা ও লক্ষ্য থাকলে – স্বচ্ছন্দে ধনী অতিধনী কর্পোরেট-ধনীর স্তরে (Wright Mills ২) ক্লাইম্ব করতে পারেন। আধুনিক ধনতান্ত্রিক দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকে কতখানি বাষ্পীয় পদার্থ মনে করেন তা নিচের তালিকা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

Metropolitan 400	Upper Middle	
Celebrities	Middle	
Very Rich	Lower Middle	
Chief Executives	Opportunity-class	Wootton
Managers	Snob-class	Wootton
Corporate Rich	Maladapted	Gans
Power Elite	Middle class mobiles	Gans
Elite	Routine-Seekers	Gans
White collar	Action-Seekers	Gans
Old Middle	Labour	
New Middle	Farmer	

উপর থেকে নিচে দুদিকে দুটি তীরলাইন দিলে 'সোশ্যাল মোবিলিটির' ডায়েগ্রামও তৈরি হয়ে যায়। এই তালিকাটির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, 'শ্রেণী' নামে সামাজিক পদার্থটি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর হাতেকলমে কতখানি তরল হয়ে গেছে, মার্কসীয় ধারণার এককণাও তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। আসলে 'শ্রেণী' কি বস্তু, বর্তমান সমাজবিজ্ঞানীদের মতে? 'A man's class is a part of his ego, *a feeling on his part of belongingness to something*; an *identification* with something larger than himself' (Centers). এরকম বিচিত্র শ্রেণীসংজ্ঞা আরও অনেক উল্লেখ করা যায়, কিন্তু আপাতত একটিই যথেষ্ট। যে কোন মানুষের শ্রেণীবোধ তার অহমিকারই প্রতিচ্ছবি, একটা কিছুর সঙ্গে তার একাত্মতার অনুভূতি এবং তার চেয়ে বৃহত্তর কিছুর সঙ্গে তার অভিন্নতাবোধ। এরকম শ্রেণীর সোপান দিয়ে যদি সমাজ গঠিত হয় তাহলে তার মধ্যে বিরোধ বা সংঘাত, মার্কসীয় অর্থে, থাকতে পারে না। রেষারেষি হানা-হানি যাহাজানি সবই থাকতে পারে, শুধু মার্কসীয় অর্থে শ্রেণী-সংঘাতজনিত বিদ্রোহ বা বিপ্লব ছাড়া।

সমাজবিজ্ঞানীদের শ্রেণীব্যাখ্যানের এই তারলের মধ্যে আর কিছু না হোক আধুনিক উন্নত ধনতন্ত্রের যন্ত্রীকৃত সমাজের ভিতরের চেহারাটা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মার্কসীয় শ্রেণীসমাজের মডেল এবং শ্রেণীবিরোধের মূল প্রত্যয়

ধূলিসাৎ করা তাঁদের লক্ষ্য হলেও, বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন যে মার্কসীয় 'প্রলেটারিয়েট' দ্বারা ঘটানো বেশ কঠিন, এই সত্যই তাঁরা পরোক্ষে প্রমাণ করেছেন। পুঁজিপতি মালিক আর শ্রমিকের প্রাক্তন সম্পর্কের স্বচ্ছতা প্রত্যক্ষতা সবকিছুই আজ অতিজটিল টেকনোলজিক্যাল পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেছে (Marcuse ২)। কার্ল মার্কস অবশ্য পুঁজিপতিশ্রেণীর এই ভবিষ্যৎ চেহারাবদল তাঁর দূরদৃষ্টিতে ধরতে পেরেছিলেন এবং আধুনিক জয়েন্টস্টক কোম্পানি ও কর্পোরেশন, অথবা কোঅপারেটিভ ও শিল্প-রাষ্ট্রীকরণের ফলে মূলধনের গোত্রান্তরও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। জয়েন্টস্টক কোম্পানি বা কর্পোরেশনের বিকাশের ফল যে 'complete alienation of capital from the real producers, and its opposition as alien property to all individuals really participating in production, from the manager down to the last day-labourer' (Capital, III) – এ সত্য মার্কসের অবিদিত ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর অসাধারণ বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি দিয়ে যা তাত্ত্বিক সত্য হিসেবে বুঝেছিলেন, বাস্তব সত্য হিসেবে তার প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তাঁর হয় নি। মালিকানা (ownership) ও পরিচালনার (control) বিচ্ছেদের ফলে একদিকে যেমন ম্যানেজার-মজুরের সামাজিক ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মালিকরা প্রত্যক্ষ উৎপাদনক্ষেত্রের অন্তরালে থেকে তাঁদের শোষণভূমিকা নিশ্চিন্তে সক্রিয় রাখার সুযোগ পেয়েছেন। এই বিশ্লেষণের পরবর্তী ধাপে এগিয়ে গেলেই বলতে হয় " 'capitalists without function' yield to the 'functionries without capital' " এবং ধনতান্ত্রিক শিল্পক্ষেত্রের এই নতুন পরিচালক বা শাসকশ্রেণীর বিশেষ কোন সাদৃশ্য নেই আগেকার কালের 'full capitalist'-দের সঙ্গে (Dahrendorf)[৬]। এঁদের জাতই আলাদা।

মূলধন ও পুঁজিপতিশ্রেণীর এই গোত্রান্তরের মধ্যে যন্ত্রীকরণের অবাধগতি অব্যাহত রয়েছে এবং তার ফলে ভোগ্য পণ্যের অফুরন্ত প্রবাহ সমাজের মেহনতী মানুষের সর্বস্তরে, কারখানার মজুর থেকে কর্পোরেশনের ম্যানেজার পর্যন্ত, এমন এক সুখোচ্ছ্বাসের ক্রমোজ্জ্বল মোহ বিস্তার করেছে যে তাদের শ্রেণীচেতনা তো দূরের কথা, শ্রমদাসত্বের বেদনা পর্যন্ত আজ বিলীয়মান। সর্বজনসমাজের (mass

---

৬ C. Wright Mills তাঁর *White Collar* গ্রন্থে The Managerial Demiurge অধ্যায়ে, *The Power Elite* গ্রন্থে The Chief Executives, The Corporate Rich ও The Power Elite অধ্যায়ে, William H. Whyte তাঁর *The Organization Man* গ্রন্থে এই মূলধনের গোত্রান্তরজনিত সামাজিক শ্রেণীচিত্রের পরিবর্তন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত J. K. Galbraith-এর *The Affluent Society* দ্রষ্টব্য।

society) প্রসার্যমান গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বর্তমান ধনতন্ত্রের অত্যন্ত শক্তিশালী চতুর রাজনৈতিক কৌশল, যেজন্য সাধারণ মানুষের দাসত্ববেদনা ও তজ্জনিত বিদ্রোহী মনোভঙ্গি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে গেছে আরও বেশি। তাই দার্শনিক মার্কুসে বলেছেন : 'A comfortable, smooth, reasonable, democratic *unfreedom* prevails in advanced industrial civilization, a token of technical progress[৭].' দাসত্বের (unfreedom) বিশেষণগুলি অনুধাবনীয় – মনোরম স্বচ্ছন্দ যুক্তিযুক্ত গণতান্ত্রিক দাসত্ব। এই দাসত্বের বন্ধন-মুক্তির জন্য অধীর আগ্রহ অথবা কঠোর সংগ্রামেচ্ছা কি আজ উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজে মার্কসীয় বৈপ্লবিক চেতনার প্রেরণায় জাগা সম্ভব ? তাহলে কি বিদ্রোহ-বিপ্লব চিরদিনের মতো আজকের ধনতান্ত্রিক যন্ত্রীকৃত সমাজ থেকে নির্বাসিত হবে ? তা হবে না, সেই মুক্তিসংগ্রামের ডায়েলেকটিক্স হবে অন্যরকম। সেকথা পরে বলছি।

তার আগে মার্কসীয় আত্মবিচ্ছেদের (alienation) সমস্যার কথা কিছু বলা প্রয়োজন[৮]। শ্রমিক ও তার শ্রমোৎপন্ন পণ্যের নিঃসম্পর্কতা ধনতান্ত্রিক যন্ত্রশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এই নিঃসম্পর্কতাই আত্মবিচ্ছেদ ও মানুষের খণ্ডিতসত্তার মূল উৎস। এই আত্মবিচ্ছেদের বিশ্লেষণ করেছেন মার্কস তাঁর *Capital* গ্রন্থে পণ্যভূতপূজা নামে (Commodity Fetishism)। তার আগেই তাঁর প্রথম-দিকের রচনায় (অসম্পূর্ণ notes) মার্কস এই আত্মবিচ্ছেদের কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন : 'Under the prevailing economic coditions, the realization of labour appears as its opposite, the negation of the labourer. Objectification appears as loss of and enslave-ment by the object, and appropriation as alienation and expropriation.' – *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844.* পরবর্তী অনেক রচনায় মার্কস এই আত্মবিচ্ছেদের বিস্তারিত বিশ্লেষণব্যাখ্যা করেছেন তাঁর *Critique*, *The German Ideolology*, *Capital* প্রভৃতি গ্রন্থে (Marcuse ৪, ২৭৩-৮৭। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের অতিজটিল যন্ত্রপিঞ্জরে,

---

৭. এটি Herbert Marcuseএর *One Dimensional Man* গ্রন্থের উদ্বোধন লাইন, unfreedom কথাটির উপর জোর দিয়েছি আমি।

৮. মার্কসীয় alienation ও তার বর্তমান রূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। এখানে সংক্ষেপে তার গতি ও লক্ষণগুলি নির্দেশ করা হল। প্রবন্ধের শেষে গ্রন্থপঞ্জীতে এ বিষয়ে উল্লেখ্য কয়েকখানি গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে।

শুধু শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নয়, সর্বশ্রেণীর কর্মরত মানুষের মধ্যে এই আত্মবিচ্ছেদবোধ ভয়াবহরূপে প্রকট হয়ে উঠেছে। তার ফলে দাসত্বচেতনা লুপ্ত হয়েছে এবং যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের দাস যারা তারা আজ 'sublimated slaves' হলেও আসলে যে অকৃত্রিম দাসানুদাস সেই বোধ নেই। কারণ, ফরাসী মনীষী Francois Perroux-এর ভাষায়, 'slavery is determined neither by obedience nor by hardness of labour but by the status of being a mere instrument, and the reduction of man to the state of a thing' (Marcuse ২, পৃ ৪১)। বাধ্যতা দিয়ে অথবা কঠোর মেহনত দিয়ে দাসত্ব বিচার করা যায় না। যন্ত্রজগতে একটি উপযন্ত্র বা নাটবল্টুর মতো থাকা এবং বস্তুজগতে নিছক বস্তুতে পরিণত হওয়াই হল আসল দাসত্ব। আত্মবিচ্ছেদের সঙ্গে এই দাসত্ববোধলোপ হল যন্ত্রীকৃত সমাজের লক্ষণ।

আধুনিক সমাজে আত্মবিচ্ছিন্ন মানুষ অনেক নামে পরিচিত—'stranger' 'free floater' 'outsider, এমন কি 'existentialist' পর্যন্ত বলা যায়। সে যেমন ডস্টয়েভ্স্কির underground-এর মানুষ, কাম্যুর outsider, তেমনি নিউইয়র্ক ও অন্যান্য মহানগরের 'lonely 'crowd'-এ নির্জন মানুষ। মহানগরের বিপুল জনস্রোতে সে নির্জনতার দ্বীপে নির্বাসিত। প্রেম ভালবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি ঘৃণা দুঃখ বেদনা আনন্দ অনুকম্পা অনুভূতি সবই তার কাছে হৃদয় নামক কম্পিউটারের স্নায়ুঝংকার গণনা। কেউ কেউ বলেন একালের অস্তিবিবেকবাদী (existentialist) জীবনদর্শন এই আত্মবিচ্ছিন্নতারই একটা বিশেষ দার্শনিক রূপ মাত্র। ধর্মবিশ্বাসের মূল যেদিন থেকে নড়ে গেছে, যেদিন থেকে মানুষ হত্যা করেছে ঈশ্বরকে (নীট্শের সেই পাগলের ভাষা 'Whither is God. I shall tell you. We have killed him — you and I.'), সেদিন থেকে তার চিরন্তন জীবনের প্রত্যয়েরও মৃত্যু হয়েছে। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে বিশাল এক শূন্য প্রান্তর, কোন রঙ নেই, একমাত্র অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর নিথর কালো রঙ ছাড়া[৯]। এযুগের বড় বড় কারখানায় পণ্যোৎপাদনের যান্ত্রিক ছন্দের সঙ্গে শ্রমিকের দৈহিক প্রতিক্রিয়ারও কোন মিল নেই, সেই ছন্দের কোন মাত্রার সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, সে শুধু নিছক উপযন্ত্র মাত্র। কাজেই উৎপন্ন পণ্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ চরম স্তরে পৌঁছেচে[১০]। তার বাইরে যে বিশাল প্রশাসন সংগঠন ও বিজ্ঞাপনের জগৎ,

---

৯. Daniel Bell এবিষয়ে তাঁর *The End of Ideology* গ্রন্থে (Glencoe, 1960) ভাল করে আলোচনা করেছেন।

১০. Eli Chinoy : *Automobile Workers and The American Dream* (N. Y. 1955) দ্রষ্টব্য। এরকম কারখানাকেন্দ্রিক অনুসন্ধান আরও অনেক হয়েছে।

সেখানকার আত্মবিচ্ছেদ অন্যদিক থেকে আরও ভয়াবহ। এই আত্মবিচ্ছেদের সমগ্ররূপ কি?

Internal darkness, deprivation
And destitution of all property,
Dessication of the world of sense,
Evacuation of the world of fancy,
Inoperancy of the world of spirit ;

T.S. Eliot *Burnt Norton*

সমগ্র সত্তা আবৃত করে এই যে গভীর অন্ধকার, অরণ্যময় গ্রাম্য শ্মশানের অমানিশার মতো, এই যে শূন্যতা ও রিক্ততাবোধ, এই হল বর্তমান সমাজ-জীবনে মানুষের আত্মবিচ্ছিন্নতার অভিশাপ। এই শাপমোচন যন্ত্রায়িত ধনতান্ত্রিক সমাজে অসম্ভব।

ধনতন্ত্রের উদ্‌যোগ ও মধ্যপর্বে পর্যন্ত শিল্পীসাহিত্যিকদের artistic alienation-এর ঊর্ধ্বায়ন হত একরকমের বিদ্রোহের মধ্যে, সাধারণভাবে বলা যায় ধনতান্ত্রিক জীবনদর্শন ও জীবননীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রোমান্টিক কাব্যে এবং নাটক গল্প উপন্যাসের অ-সাধারণ সব চরিত্রের মধ্যে—যেমন 'the artist, the prostitute, the adulteress, the great criminal and outcast, the warrior, the rebel-poet, the devil. the fool'—যারা কেউ স্বাভাবিক নিয়মে উপার্জন করে অর্থাৎ মেহনৎ করে বেঁচে থাকে না। প্রচলিত সমালোচনার মানদণ্ডে একে 'রোমান্টিক' বলা হয়, কিন্তু এ হল শিল্পীদের নিজস্ব অবাধ্যতা ও প্রতিবাদ, কোন আরোপিত কৃত্রিম জীবননীতির বশ্যতা স্বীকার না করা। আজকের যন্ত্রোন্নত ধনসমাজে এই শিল্পীসুলভ আত্মবিচ্ছিন্নতার ঊর্ধ্বায়ন আর প্রয়োজন নেই, শিল্পীদের 'great refusal'-এর দিন শেষ হয়ে গেছে। তাই দেখা যায় আজকের 'the vamp, the national hero, the beatnik, the neurotic housewife, the gangster, the star, the charismatic tycoon perform a function very different from and even contrary to that of their cultural predecessors' (Marcuse ২, তৃতীয় অধ্যায়)। এসব চরিত্র আগেকার বারাঙ্গনা সমাজত্যাজ্য খুনী শিল্পী বিদ্রোহীদের মতো 'images of another way of life' নয়, এরা হল 'freaks or types of the same life, serving as an affirmation rather than negation of the established order' (Marcuse ২, পৃ ৬০)। অর্থাৎ শিল্পীর বিচ্ছিন্নতাবোধের ঊর্ধ্বায়নের বদলে আজ অবনয়ন (desublimation) হয়েছে। এই অবনয়নের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল বর্তমান শিল্পসাহিত্যে ও সিনেমায় যৌন উপাদানের বাহুল্য ও চরম বিকৃতি। আগেকার সাহিত্যশিল্পে

(ধনতান্ত্রিক যুগের) বৈধ-অবৈধ প্রেম, যৌন-সম্ভোগ কামকেলি সবই রূপায়িত হতো সামগ্রিক আরতিক (erotic) মূর্তিতে। তখন যৌনজীবনের একটা 'landscape' ছিল, যার মধ্যবর্তিতায় 'libidinal experience' পূর্ণতালাভ করত। সেই ল্যাণ্ডস্কেপ আটোমোবিলের যুগে মহানগরের স্টীলকংক্রীট ও ম্যাকাডামাইজড পথে একেবারে মুছে গেছে। তার ফলে আজকের যৌনজীবন 'de-eroticized' হয়ে গেছে, মানুষ হয়েছে শিশ্নোদর-পরায়ণ এবং যৌনজীবন হয়েছে কেবল শিশ্নকেন্দ্রিক। ফ্রয়েডীয় ভাষায় বলা যায় 'Eros-এর যুগ শেষ হয়ে গেছে, বর্তমান যুগ 'Sexuality'-র যুগ। এই 'localization and contraction of libido, the reduction of erotic to sexual exprience and satisfaction' (Marcuse ২, পৃ ৭০), আজকের সাহিত্যশিল্পসিনেমায় প্রতিফলিত।

শুধু সাহিত্যশিল্পসিনেমায় নয়, পোশাকপরিচ্ছদেও আজিক যৌনচেতনা অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ পরিচ্ছদ হয়েছে বহিরঙ্গের প্রসারণ মাত্র – 'an extension of the outer surface of the body' (McLuhan)। আমেরিকান মহিলাদের পোশাক প্রসঙ্গে ম্যাকলুহান বলেছেন, 'the American woman for the first time presents herself as a person to be touched and handled, not just to be looked at', অর্থাৎ পোশাক পরে সেজেগুজে আজ আর মহিলারা শুধু বলতে চান না 'আমাকে ছাখো', তাঁরা যেন বলতে চান 'আমাকে স্পর্শ করো, নেড়েচেড়ে ছাখো' (McLuhan, পৃ ১২১)। আমেরিকায় নয় শুধু, সকল দেশেই, ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশেও, পোশাক সম্বন্ধে ম্যাকলুহানের কথা সত্য হয়ে উঠেছে। পোশাকও 'de-eroticized' হয়েছে। তার উৎকট প্রকাশ হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞাপনে (advertisement)[১১] এবং সিনেমায়। চমৎকার ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞাপনের কথা বলেছেন ম্যাকলুহান – 'The art of advertising has wondrously come to fulfil the early definition of anthropology as 'the science of man embracing woman' (McLuhan, পৃ ২২৬)। পোশাকপরিচ্ছদের বিজ্ঞাপন (যেমন শাড়ি, বক্ষাবরণী), সিগারেটের বিজ্ঞাপন, ইলেকট্রিক ক্যানের বিজ্ঞাপন (হাওয়াতে শয্যার উপরে মহিলার শাড়ি উড়ছে), স্কুটারের বিজ্ঞাপন (পেছনসীটে মহিলার চুল ও শাড়ি উড়ছে), সিনেমার পোস্টারের কথা তো বলাই বাহুল্য – সর্বত্র শুধু নারীর অঙ্গকেন্দ্রিক

---

১১. Colin Golby : 'Eroticism in Modern Advertising' (*Penguin Survey of Business and Industry*, 1965).

Vance Packard : *The Hidden Persuaders*, Pelican 1962.

যৌনাকর্ষণ[১২]। যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজ যেন নারীকে স্বাধীনতার মোহে ভুলিয়ে (অর্থাৎ 'unfreedom') তাকেই সবচেয়ে বেশি যান্ত্রিক পণ্যে ও উপযন্ত্রে পরিণত করেছে এবং পর্যাপ্ত ভোগ্যপণ্যের মতো মানুষের যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্তির পথও চারিদিক থেকে খুলে দিয়েছে। সে পথ বিকারবিকৃতির পথ হলেও পুরুষ-নারী কারও চৈতন্য নেই। এবং সে স্বাধীনতা যে কোন্ জাতের স্বাধীনতা তা টাইপরাইটার-টেলিফোনের যুগের লেডিটাইপিস্ট ও 'কল্-গার্ল'দের কথা ভাবলেই বোঝা যায়: 'The typewriter and the telephone···have taken over the revamping of the American girl with technological ruthlessness and thoroughness.' এবং কল্-গার্ল? 'The prostitute was a specialist, and the call girl is not. A 'house' was not a home; but the call-girl not only lives at home, she may be a matron.' (McLuhan, পৃ ২৬৫-৭৪)।

যন্ত্রোন্নত আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের এই মনোরম গণতান্ত্রিক 'unfreedom' ও ভোগবিলাসের স্বাচ্ছন্দ্য দেখলে তার আমূল পরিবর্তন অথবা বৈপ্লবিক রূপান্তর সম্বন্ধে কোন পন্থা নির্দেশ করা, অন্তত মার্কসীয় নীতি অনুসারে, বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। অভ্যস্ত চিন্তাধারায় বিপ্লব-বিদ্রোহের কোন সম্ভাবনাও এই সমাজে বিশেষ দেখা যায় না। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির মৃতপ্রায় অবস্থা দেখলেই তা বোঝা যায়, যদিও দুই দেশে বড় বড় ট্রেড ইউনিয়ন এবং অভিজাত পেশাদার একশ্রেণীর মজুরনেতার আবির্ভাব হয়েছে। যে-দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে শক্তিশালী গণপার্টি হওয়া উচিত ছিল, মার্কসীয় নীতি অনুসারে, সেখানে কেন আজ তা কয়েকজন কমিউনিস্ট তত্ত্ব-বিলাসীর ঘরোয়া বৈঠকখানায় পরিণত হয়েছে তা ভেবে দেখা কর্তব্য। ফ্রান্স ইটালির কমিউনিস্ট পার্টি ইয়োরোপের মধ্যে বড় শক্তিশালী পার্টি, অভিজ্ঞতাও দীর্ঘকালের, কিন্তু আকৈশোর আমরা দেখে আসছি এই দুই পার্টির নেতৃবৃন্দের যেমন বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি, তেমনি তার শক্তির হ্রাসবৃদ্ধিও উল্লেখ্য কিছু হয় নি, বিপ্লবের বদলে ভোটনীতিই পার্টির কর্তৃপক্ষের প্রভুত্বরক্ষার প্রধান কৌশল হয়ে উঠেছে। এই অবস্থার কারণ কি? প্রধান কারণ, আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের এতাবৎ-কালের মহাতীর্থ সোভিয়েট ইউনিয়নে বিপ্লবের কিছুদিন পর থেকে সমাজতন্ত্রের গতিপথে মার্কসীয় নীতির প্রয়োগপদ্ধতিতে নানারকমের গলদ বিচ্যুতি বিভ্রান্তি ও বিকৃতি দেখা দিয়েছে। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়েছে এই যে সোভিয়েট

১২. এরকম বিজ্ঞাপনের নিদর্শন এখানে ছবিসহ প্রকাশ করা সম্ভব হল না, কারণ এবিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা পৃথক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

কমিউনিস্ট পার্টি আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংস্কারবাদী নীতির (Revisionism) শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তার অর্থনৈতিক-সামরিক শক্তির জোরে আজ সে ছোট ছোট প্রতিবেশী কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকেও তার তাঁবেদারি করার জন্য হুকুম দিচ্ছে (যেমন সম্প্রতি দিচ্ছে চেকোস্লোভাকিয়ায়)। একথা ঠিক যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংস্কারবাদী ধারা প্রবর্তনের জন্য মূলত দায়ী স্তালিন, যদিও সোভিয়েত রাষ্ট্রের দৃঢ় বনিয়াদ গঠনে তাঁর দান স্মরণীয়, কিন্তু যাঁরা স্তালিনের মৃত্যুর পরে বিপ্লবীর ছদ্মবেশে 'de-Stalinisation'-এর ঢাকঢোল বাজিয়ে বর্বরের মতো স্তালিনকে কবরান্তরিত পর্যন্ত করেছেন, তাঁরা আজ সংস্কারবাদকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতার যে ঘৃণ্য স্তর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেছেন, আজ আত্মন্তরিতা সত্ত্বেও দৃঢ়চিত্ত স্তালিন বেঁচে থাকলে তা নিতে পারতেন কিনা সন্দেহ। কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এই সংস্কারবাদী প্রতিক্রিয়ার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আজ মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভেদ নয় শুধু, দুই কমিউনিস্ট শিবিরের সম্পর্ক আজ ক্যাপিটালিস্ট-কমিউনিস্ট শত্রুতার চেয়েও ভয়ংকর। এইটাই হল বর্তমান ইতিহাসের সবচেয়ে করুণ মর্মান্তিক ঘটনা।

কিন্তু এই মর্মান্তিক ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে হলে মার্কসীয় সংস্কারবাদের উৎপত্তি, বিস্তার ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অন্তত তার উপসর্গগুলি জানা আবশ্যক। সংক্ষেপে বলা যায়—যুদ্ধ ও শান্তিনীতি, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নীতি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে শ্রেণীবিরোধ সমাধানের নীতি সম্পর্কে মার্কসীয় বিচারভঙ্গির পার্থক্য থেকে সংস্কারবাদের (Revisionism) উৎপত্তি। ধনতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী শত্রুবেষ্টিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের সংকটকালে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (peaceful coexistence) নীতির সাময়িক প্রয়োজন থাকলেও, পরে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রাকালে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিসংগ্রাম যখন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং তার ভিতর দিয়ে আগেকার উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির মধ্যে শ্রেণীবিরোধ নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করল, তখন সহাবস্থান হয়ে দাঁড়াল ধনতন্ত্র-সামাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতারই (collaboration) নামান্তর। তার প্রমাণ পাওয়া যায় আলজিরিয়া, কিউবা, লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশ, কঙ্গো, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সোভিয়েট, ফরাসী, ইটালি ও অন্যান্য সমভাবাপন্ন কমিউনিস্ট পার্টির বকধার্মিক মনোভাবে এবং পরোক্ষে সাম্রাজ্যবাদী-সহযোগিতার নীতি অনুসরণে। শুধু তাই নয়, নিউক্লিয়ার বোমার ভয় দেখিয়ে পর্যন্ত সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি (যে-বোমার বড় মালিক সোভিয়েট ও আমেরিকা) শ্রেণীসহযোগিতার নীতি চালু করতে চেয়েছে এবং

ফ্রান্স ইটালির কমিউনিস্ট নেতারা তার প্রতিধ্বনি করেছেন[১৩]। তাজ্জব যুক্তি! ইতিহাসে যদি এতদিন বন্দুক কামান ট্যাঙ্ক বোমারু বিমান সমাজের শ্রেণীগড়ন ও শ্রেণীবিরোধ নিশ্চিহ্ন করতে না পেরে থাকে, তাহলে নিউক্লিয়ার বোমার মারণশক্তি অনেক বেশি বলে সমাজ থেকে শ্রেণীগুলি আজ লোপ পাবে কেন, অথবা অহি-নকুলের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হবে কেন? একথাও অতিরঞ্জিত নয় যে নিউক্লিয়ার বিশ্বযুদ্ধ হলে মানবসভ্যতা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু শুধু সেই সম্ভাবনায় বা বিভীষিকায় সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য 'অটোমেটিক্যালি' অন্তর্ধান করবে কেন? এসব কথাবার্তার শব্দতরঙ্গ যদি গোরস্থানের মাটির গভীরে প্রবেশ করে তাহলে মার্কস ও লেনিন উভয়ের শুকনো হাড়গুলো পর্যন্ত কবরের তলায় কেঁপে উঠবে। শ্রেণীসহযোগিতার উদ্দেশ্যে মার্কসীয় নীতির nuclear blackmailingএও আজ সোভিয়েট পশ্চাদ্‌পদ নয়। এই নীতির পরিপূরক হল—পৃথিবীতে আজ আর কোথাও কোন বিরোধ (contradiction) নেই, ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের বিরোধ ছাড়া। এ-ধারণাও সোভিয়েটের বদ্ধমূল। এর নির্গলিতার্থ হল ধনতন্ত্রের প্রতিভূ আমেরিকা এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিভূ সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন বিরোধ নেই কোথাও। এই বিরোধেরও সমাধানের পথ হল হোয়াইটহাউস-ক্রেমলিনের সভাকক্ষে উভয় দেশের রাষ্ট্রনেতাদের আলোচনা, মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ, নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা, স্পেস-ফ্লাইটের প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে জমকালো অধিবেশন ও বক্তৃতা এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতা (অবশ্যই foreign aid-সহ)। আর্থিক ক্ষেত্রে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল হল ধনতান্ত্রিক market economy-র প্রসারণ এবং কেন্দ্রগত পরিকল্পনার (সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের) অন্তরালে ধনতন্ত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে রাখা (ব্যক্তিগত মূলধনের বিলোপ সত্ত্বেও)[১৪]। সোভিয়েট সমাজে তাই মানুষের যান্ত্রিক শ্রমদাসত্বের

---

১৩. '…the nuclear bomb does not adhere to the class principle'—Open letter of the CC of CPSU, 14 July 1963. '…atomic weapons have changed the very nature of war'—Togliatti, L'Unita 22 January 1962. এই ধরনের আরও অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। শ্রীসমর সেন সম্পাদিত *Frontier* পত্রিকায় Monitor লিখিত 'On Marx' প্রবন্ধ (১.৬.৬৮—২৯.৬.৬৮) দ্রষ্টব্য।

১৪. Paul M Sweezy, Leo Huberman : 'Lessons of Soviet Experience', *Monthly Review*, November 1967 ; Sweezy :

অবসান হয় নি, নতুন মুক্তি ও আদর্শের নাগপাশে তার বন্ধন অনেক বেশি ঘনীভূত হয়েছে : 'the transition from capitalism to socialism appears, in spite of the revolution, still as quantitative change. The enslavement of man by the instruments of his labour continues in a highly rationalized and vastly efficient and promising form.' – Marcuse ২, পৃ ৪৮.

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির এই নির্গুণ যান্ত্রিক গতির ফলে সোভিয়েট সমাজের গড়নেরও (social structure) কোন মৌল গুণগত পরিবর্তন কিছু হয় নি, বরং দেখা যায় অনেকদিক থেকে যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের বর্তমান গড়নের সঙ্গে তার সাদৃশ্য গড়ে উঠেছে। অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্টে (১৯৩৯) স্তালিন বলেছিলেন, সোভিয়েট সমাজের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজের পার্থক্য এই যে সোভিয়েটে কোন 'antagonistic, hostile classes' নেই, শোষিতশ্রেণী বিলুপ্ত হয়েছে এবং শ্রমিক কৃষক ও বুদ্ধিজীবীরা – 'who make up Soviet society' – বন্ধুর মতো সহযোগীর জীবন যাপন করে – 'live and work in friendly collaboration.' কাজেই স্তালিন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন যে সাম্যবাদী সমাজের উচ্চতর স্তরে উত্তরণ – রাষ্ট্রযন্ত্রের বিলোপ, পার্টির বিলোপ, সীমিত শ্রম ও পর্যাপ্ত ভোগ, সকল রকম দৈহিক মানসিক বন্ধনমুক্তি – ধীরেসুস্থে উন্নত কৌশলে (যান্ত্রিক) সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রসারের ভিতর দিয়ে সম্ভব হবে ('the continuous expansion and perfecting of socialist production on the basis of higher technique'), তার জন্য আর কোন সামাজিক সংগ্রাম বা আলোড়নের প্রয়োজন হবে না[১৫]। ধনতন্ত্র থেকে (যদিও জারের রাশিয়াকে সামন্ততন্ত্র-ধন-তন্ত্রের মিশ্রণ বলতে হয়) সমাজতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদের গতিপথে কেবল কতকগুলি অবাঞ্ছিত লোককে সোভিয়েত-পদ্ধতিতে purge করে, সমাজকে স্থির শান্ত রেখে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া

'Peaceful Transition from Socialism to Capitalism' (যুগোস্লাভিয়া সম্বন্ধে), *Monthly Review*, 1964 ; Sweezy : 'Czechoslovakia Capitalism and Socialism', *Monthly Review*, October 1968 ; Charles Beltelheim : 'On the Transition between Capitalism and Socialism', *Monthly Review*, March 1969 and Sweezy's Reply. এবিষয়ে মূল্যবান বই হল E. Preabrazhensky-র *The New Economics*, Oxford Univ. Press 1965.

১৫. J. Stalin : *Economic Problems of Socialism in the U.S.S.R.*, Moscow 1952.

সম্ভব হবে, আগেকার ফিউডাল ও বুর্জোয়াশ্রেণী, তাদের বংশধর, নতুন বুর্জোয়া-ভাবাপন্ন শ্রেণী, মধ্যশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী, সকলে হৃদয়ের পরিবর্তনের ফলে de-classed হয়ে যাবে, স্তালিনের এই বিশ্লেষণ থেকে এই কথাই ভাবতে হয়। কিন্তু কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর পক্ষে তা ভাবা সম্ভব নয়। আমেরিকান অর্থ-বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরাও তাঁদের সমাজের ভবিষ্যৎ 'classlessness' সম্বন্ধে এইভাবে চিন্তা করেন। সোভিয়েট নায়কদের এই অর্থনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধে একজন সামাজবিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন[১৬] : 'This means by way of evolution, in the same sort of way in which Americans who, while taking the 'optimistic' view, do not yet regard the American society of today as a 'classless' society, visualize the further democratization of the United States.'

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকে মনে করেন 'historical changes in the social structure may well give substance to the American creed of 'classlessness'.' (Sjoberg)। অর্থাৎ অমেরিকারও 'ক্রীড' হল 'শ্রেণীহীনতা' এবং সমাজগড়নের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ফলে সেই 'ক্রীড' বাস্তব সত্য হতে পারে.। অমেরিকানরা শুধু সোভিয়েটের মতো 'সোশ্যালিস্ট' কথাটি ব্যবহার করেন না, তার পরিবর্তে 'ডেমক্রাটিক' কথা ব্যবহার করেন, এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তন হল তাঁদের মতে ডেমক্রাসি ও টেকনোলজির ক্রমপ্রসার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের টেকনোলজিক্যাল উন্নতির ফলে গণতান্ত্রিক নীতির মাধ্যমে 'শ্রেণীহীন সমাজ' প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনেরও টেকনিক্যাল উন্নতির ফলে 'শ্রেণীহীন সমাজ' গঠন সম্ভব। একই পদ্ধতিতে সম্ভব, ধীরেসুস্থে মন্থরগতিতে ('gradual change'), বিনা ঝঞ্ঝাটে, বিনা বিদ্রোহ-বিপ্লবে আলোড়নে। তাছাড়া নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের যুগে বিদ্রোহ-বিপ্লব তো অবাস্তব দিবাস্বপ্ন মাত্র, কারণ তার আতঙ্কে সামাজিক 'শ্রেণী'-ই তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে !

অসম্ভবকে সম্ভব করতে গেলে ধনতান্ত্রিক সমাজের যে রূপায়ণ সম্ভব তার পরিচয় আগে দিয়েছি, আমেরিকান সমাজের শ্রেণীগড়নের আলোচনা প্রসঙ্গে। সোভিয়েট সমাজে ব্যক্তিগত মূলধন ও মুনাফার বিলোপের ফলে (যা নিশ্চয় একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং যার জন্য আমেরিকা বা অন্যান্য ধনতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে তার মৌল পার্থক্য অবশ্যই আছে) আজ সেখানে কোন কোটিপতি ধনিক

---

১৬. Stanislaw Ossowski : *Class Structure in the Social Consciousness* (translated by Sheila Patterson). Glencoe 1963, পৃ ১১৪-১৫ এবং পাদটীকা।

শ্রেণী নেই বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত তিনশ্রেণীর (শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী) সহযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক টেকনোলজিক্যাল উন্নতি ও প্রতিযোগিতার ফলে আজ সেখানেও 'ম্যানেজারিয়াল রেভল্যুশন' হয়েছে, মর্যাদা (status) ও কৃতিত্বমুখী (achievement-oriented) সামাজিক স্তরের (social strata) অভিনব বিন্যাস হয়েছে। আমেরিকার মতো 'কর্পোরেট ধনী'র বিকাশ না হলেও, কেন্দ্রগৃহীত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ফলে এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার ব্যুরোক্রাট ও নতুন মধ্যশ্রেণীর বিস্ময়কর বিস্তার হয়েছে[১৭]। এঁদের কোন ধনিকশ্রেণীর দাসত্ব করতে হয় না, কেবল রাষ্ট্রনেতাদের (অর্থাৎ পার্টি বস্-দের) দাসত্ব করতে হয়। তার উপর সোভিয়েট রাষ্ট্রযন্ত্রের আর্থিক-সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এই ম্যানেজার-ব্যুরোক্রাট-নব্যমধ্যশ্রেণীর প্রতিপত্তিও যথেষ্ট বেড়েছে এবং সোভিয়েট অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতির সংস্কারবাদী আদর্শের প্রতিক্রিয়ায় ক্রমেই আরও বাড়ছে। যত বাড়ছে তত সংস্কারবাদী চিন্তা সোভিয়েট সমাজে দৃঢ়মূল হচ্ছে (অবশ্য এই নতুন মধ্যবিত্ত সমাজে), তত ধনতন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার ব্যগ্রতা বাড়ছে, তত নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র ও স্পেসস্যাটেলাইটের ক্রমোন্নতির দ্বারা পৃথিবীতে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের বিচিত্র ধারণা উগ্রতর হচ্ছে এবং বিপ্লবচিন্তাকে 'ব্যাকডেটেড' বলে বিদ্রূপ করার প্রবৃত্তি জাগছে। সোভিয়েট সংস্কারবাদকে তাই সেখানকার সোশ্যালিস্ট সমাজের নতুন ম্যানেজার-ব্যুরোক্রাট-মধ্যবিত্তের মার্কসীয় চিন্তাধারা বলা যায়।

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল এই উভয়সংকট থেকে মানুষের মুক্তির উপায় কি? একদিকে যন্ত্রোন্নত আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের আরামদায়ক অধীনতা, অন্যদিকে যন্ত্রোন্নত আধুনিক সমাজতান্ত্রিক সমাজের আর্মচেয়ারী ক্রমবিকাশতত্ত্ব, এই উভয়-সংকট থেকে মানুষের মুক্তি কোন পথে? রাজনৈতিক কর্মীদের তো বটেই, প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীর – বিশেষ করে যাঁরা মার্কসীয় সমাজচিন্তার অনুগামী – তাঁদের আজ এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। যাঁরা দায়িত্ব

---

১৭. Ralf Dahrendorf : *Class and Class Conflict in Industrial Society*, London, 2nd Impression 1961. এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'Karl Marx's Model of the Class Society', দ্বিতীয় অধ্যায় 'Changes in the Structure of Industrial Society Since Marx' এবং তৃতীয় অধ্যায় 'Some Recent Theories of Class Conflict' এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। এ ছাড়া *Transactions of the Thirld World Congress of Sociology*-র (1956) মধ্যে সোভিয়েট সমাজবিজ্ঞানীদের papers এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। 'গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

এড়িয়ে যেতে চান, অথবা নিজেদের প্রমাকে সমস্ত প্রমাণের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে চান, অথবা ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিতদের মতো তর্কের ধূম্রজাল বিস্তার করে মার্কসীয় তত্ত্বের অভিনব টীকা করতে চান, তাঁদের স্বার্থ কি তা আজকের দিনে বুঝতে কষ্ট হয় না। পেন্টাগন ও ক্রেমলিনের মনোলোভা রজ্জুজালে জড়িয়ে থাকাই তাঁদের কাছে নিরাপদ পন্থা। আমাদের মতো যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের অধীনদেশের সন্তোষমুক্ত বুদ্ধিজীবী—জ্যাঁ পল সার্ত যাঁদের 'walking lies' (চলন্ত মিথ্যা) বলেছেন[১৮]—ফ্যানন যাঁদের বলেছেন 'know-all, smart, wily intellectuals', অর্থাৎ যাঁরা সবজান্তা কেতাদুরস্ত চতুর, যাঁরা বর্তমানে জাতীয় গভর্নমেন্টের লুণ্ঠন-পরিকল্পনার বুদ্ধির যোগানদার ও সহযোগী অংশীদার, তাঁদের অবস্থা আরও শোচনীয়[১৯]। তাঁদের পক্ষে বুদ্ধিযুক্তির, ধ্যানধারণার পুরাতন শিকড় উপড়ে ফেলা রীতিমত কঠিন। কিন্তু যে-শিকড়ে পচন ধরেছে তা উপড়ে ফেলাই ভাল এবং যদি তার কোন জীবন্ত শাখা থাকে তাহলে তা নতুন মাটিতে রোপণ করাই শ্রেয়।

আধুনিক যন্ত্রায়িত ধনতান্ত্রিক সমাজের মুক্তিসমস্যা বাস্তবিকই জটিল। কেবল ব্যক্তিগত মুক্তি কাম্য হলে সহজ পথ অনেক আছে, সবই চোরাগলি ও বাঁকাপথ। যেমন আত্মহত্যা (suicide)। প্রতিদিন পৃথিবীতে এখন গড়ে একহাজার ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তার আটগুণ (অর্থাৎ আট হাজার) আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ প্রতিবছরে প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যার পথে এই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি কামনা করে[২০]। আত্মহত্যা ছাড়া

---

১৮. Frantz Fanon *The Wretched of the Earth*, Penguin 1969, 'Parface' by Jean-Paul Sartre : 'The European *elite* undertook to manufacture a naive *elite*. They picked out promising adolescents ; they branded them as with a red-hot iron, with the principles of western culture ; they stuffed their mouths full with high-sounding phrases···These walking lies had nothing left to say to their brothers; they only echoed.'

১৯. 'We find in them the manners and forms of thought picked up during their association with the colonialist bourgeosie. Spoilt children of yesterday's colonialism and of today's national governments, they organise the loot of whatever national resources exist.' Fanon. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩৭।

২০. *Prevention of Suicide* World Health Organisation, UNO 1969.

আছে আত্মবিচ্ছেদবোধজনিত (alienation) ব্যর্থতার দ্বীপে নির্বাসিত জীবন যাপন করা, অথবা হিপি-বীটনিকদের মতো—যাদের 'new boheme' 'poor refuge of defamed humanity' বলা যায় (Marcuse ১, পৃ ১৭)—বিচিত্র বিদ্রোহীর বেশে দিন কাটানো। আত্মহত্যাও প্রতিবাদ, হিপি-বীটনিক-বিদ্রোহও প্রতিবাদ, তবে 'ট্রেডিশান্যাল' প্রতিবাদ নয়, কারণ পুরাতন পদ্ধতিতে প্রতিবাদের পথ আধুনিক one-dimensional সমাজে প্রায় বন্ধ। তবে এই প্রতিবাদের লক্ষ্য ব্যক্তিমুক্তি, সমাজমুক্তি নয়। সমাজমুক্তির লক্ষ্য নিয়েও প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ সম্ভব, নতুন পদ্ধতিতে। কাদের দ্বারা সম্ভব? 'the substratum of the outcasts and outsiders, the exploited and persecuted of other races and other colours, the unemployed and the unemployable' (Marcuse ২, পৃ ২০০)। মার্কুস তাঁর এই সম্ভাব্য বিদ্রোহীদের মধ্যে যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে অধিক নৈরাশ্যের প্রশ্রয় দিয়েছেন মনে হয়, যদিও তার কোন কারণ নেই। শ্রমিক-আন্দোলন (trade union movement) যদি ইকনমিজম্ ও রিফর্মইজমের সংস্কারমুক্ত করে প্রকৃত বৈপ্লবিক আদর্শে গড়ে তোলা যায়, তাহলে শ্রমিকদের সুখাচ্ছন্নতা দূর হবে, শ্রমদাসত্বচেতনা তীব্র হবে এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের পাশে তারা প্রবল সংহত শক্তি নিয়ে দাঁড়াবে। তা ছাড়া যন্ত্রোন্নত ধনসমাজেও যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সর্বাংশে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা লোপ পেয়েছে, এমন কথা বলাও যুক্তিসঙ্গত নয়। এ সম্ভাবনা যে নিশ্চয় আছে তা ফ্রান্সের তরুণবিদ্রোহে শ্রমিকশ্রেণীর একাংশের সহযোগিতা থেকে বোঝা যায় (ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা সত্ত্বেও)[২১]। তবে ঐতিহাসিক অবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং মারণাস্ত্রোন্নত রাষ্ট্রের বিকট ও ব্যাপক মারমূর্তির ফলে এই বিদ্রোহের রূপ অন্যরকম হতে বাধ্য। সশস্ত্র শাসকদের সুসংগঠিত violenceএর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র শোষিতদের বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন violence হবে এর বিবিধ রূপের একটি বিশেষ রূপ। নিরস্ত্রদের অস্ত্র হবে আদিমযুগের পাথুরে হাতিয়ার (এমনকি জীবজন্তুর corporeal tools হাত পা নখ দাঁত পর্যন্ত) থেকে যে-কোন ক্ষেপণাস্ত্র ও বিস্ফোরক, দেহের সমস্ত স্নায়ুপেশীর সর্বশক্তি নিয়োগ করে সেগুলি তারা নিক্ষেপ করবে জৈবিক ঘৃণাবোধ (biological hatred) থেকে, বর্তমান শোষণদমনযন্ত্রের বিরুদ্ধে। তারা ব্যারিকেড করবে, বর্তমান আইন-শৃঙ্খলার শিকল ছিঁড়ে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, প্রতিরোধ করবে। শৃঙ্খলাবাদীদের শাস্ত্র-বচন ও শাসানি, হিংস্রতার প্রতিমূর্তিদের মুখে অহিংসার বাণী, কোনকিছুতে তারা কর্ণপাত করবে না। অনেককাল করেছে, আজ আর করবে

---

২১. Cohn-bendit : পূর্বগ্রন্থ, পৃ ৯১-১০৩, ১৪৭-৬৮।

না। আজকের বিদ্রোহীদের এই violence বালখিল্যের আস্ফালন নয়, বর্বর বৃত্তির পুনরুজ্জীবন নয়, নিছক প্রতিবাদ বা ক্রোধপ্রকাশও নয়। এ হল বহুকালের পুঞ্জীভূত অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের পর্বতপ্রমাণ স্তূপে অগ্নিসংযোগ এবং সেই আগুনের ভিতর দিয়ে চিরকালের অমানুষদের 'মানুষ' রূপে পুনর্জন্ম[২২] : 'this irrepressible violence is neither sound and fury, nor the resurrection of savage instincts, nor even the effect of resentment *it is man recreating himself.*' Sartre (Italics লেখকের)।

আজকের পৃথিবী ও সমাজের দিকে চেয়ে মনে হয় যদি এতকালের সভ্যতার ইতিহাসে আমরা বেশির ভাগ মানুষকে 'অমানুষ' করে থাকি, সমাজে 'মানুষ' (বিশেষ করে 'সভ্য') বলে যাঁরা গণ্য তাঁদের মানুষত্বের মাপকাঠিটাই ঠিক করতে না পেরে থাকি, এবং সেই গণ্যমান্য মানুষরাই যদি নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের প্রয়োগে খেয়ালবশে সভ্যতাকে যে কোন সময় ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত থাকেন, তাহলে চিরকালের নিপীড়িত অমানুষরা যদি আজ তাদের বিচ্ছিন্ন নাশকর্মের ফলে সমাজ সভ্যতাকে শেষপর্যন্ত ধ্বংসও করে ফেলে তাতেই বা ক্ষতি কি, অথবা সেইকারণে তাদের অন্যায়টাই বা অধিকতর মারাত্মক হবে কেন ? বোঝা যায় না, মার্কসীয় অমার্কসীয় গান্ধীয় খ্রীস্টীয় কোন যুক্তিতেই বোধগম্য নয়।

তরুণবিদ্রোহ (youth revolt) ছাত্রবিদ্রোহ আজ যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ। Third World-এর মুক্তিসংগ্রামের মতো Third Power যুবশক্তি-ছাত্রশক্তি আজ বিদ্রোহী মানুষের একটি বড় ভরসা, উদ্দীপনার উৎস। এবং অনুন্নত অনগ্রসর একদা-পরাধীন দেশে (যেমন ভারতবর্ষে) যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের (যেমন আমেরিকার) অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের (বৈদেশিক সাহায্য ও টেকনিক্যাল সহযোগিতার নামে) মতো নৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তিও (ideological-cultural infiltration) যেহেতু মারাত্মক সত্য ঘটনা, এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বুদ্ধিজীবীরাই তার অন্যতম বাহক, তাই ছাত্রবিদ্রোহের লক্ষ্য আজ, ধনতান্ত্রিক দেশের মতো আমাদের দেশেও, এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আমূল পরিবর্তন। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচলিত গতানুগতিক আদর্শের ধারক-বাহক ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি আর কিছু নয় এবং সেই আদর্শ তার পাঠ্যবিষয়ে, ডিগ্রিতে, গবেষণায় (research), পাস-ফেলের পরীক্ষায়, কৃতিত্বের বিচারে, সর্বত্র প্রতিফলিত। বিদ্যাও বাণিজ্যের পণ্য, ডিগ্রি হল ক্রেতার জন্য লোভনীয় প্যাকেজ, এবং এই পণ্য ও প্যাকেজ মানু-

---

২২. Frantz Fanon পূর্বগ্রন্থ, Preface। ফ্যাননের গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'Concerning Violence' দ্রষ্টব্য।

ফ্যাক্‌চারিঙের কারখানা হল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যায়তন। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যায়তন, বিদ্বান শিক্ষক-অধ্যাপক, কারও প্রতি আজকের বুদ্ধিমান ইতিহাস-সচেতন তরুণ ছাত্রদের, সেকালের গুরুর আশ্রমের ছাত্রদের মতো, অন্ধভক্তি নেই, থাকতে পারে না[২৩]। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত কি পরিমাণ আমেরিকান অর্থাশ্রিত আদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, স্বাধীনতার পরে ভারতীয় বিদ্যার্থী ও 'স্কলার'দের আমেরিকায় যাতায়াত ও সেখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে লেনদেন, বিভিন্ন আমেরিকান 'ফাউণ্ডেশন'-এর গ্র্যাণ্ট বিতরণ ইত্যাদি বেড়েছে, সেবিষয়ে তদন্ত করলে বিস্ময়কর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। সাংবাদিকতা (journalism) ও প্রকাশনক্ষেত্রেও (publications) আমেরিকান অর্থানুকূল্য কম চমকপ্রদ নয়। এই সমস্ত কারণে আমেরিকা-ইয়োরোপের মতো উন্নত ও ভারতের মতো অনুন্নত দেশের তরুণবিদ্রোহ-ছাত্রবিদ্রোহের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই। বর্তমান নীতিহীন আদর্শহীন সমাজের অরণ্যে জীবনের ভবিষ্যৎশূন্য ভরসাশূন্য তরুণরাই সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত নিগৃহীত বঞ্চিত, কাজেই ভবিষ্যতে বিপ্লবী তরুণশক্তির অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে, এসিয়া আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশে যেখানে সর্বক্ষেত্রে বিদেশী ও দেশীয় ধনতন্ত্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত—সেখানে এই বিপ্লবী ও বিদ্রোহী তরুণ-শক্তি মজুর-কৃষকের বৈপ্লবিক শক্তিসংহতিকে অনেক বেশি দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করবে, এবং বৈপ্লবিক মার্কসবাদকে সংস্কারবাদের বিকারমুক্ত করতেও সক্ষম হবে। বস্তুত চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (Cultural Revolution) মাধ্যমে সেখানকার বর্ধিষ্ণু কমিউনিস্ট ব্যুরোক্রাসি ও সংস্কারবাদের পরিবর্জন-পরিশোধনে তরুণদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—'The most picturesque and startling feature of the Cultural Revolution was the part played in it by school children and students.' (Joan Robinson, পৃ ২৪)—এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সেকথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি[২৪]। পৃথিবীর

---

২৩. 'The mediocrity of university teaching is no accident, but reflects the life-style of a civilization in which culture itself has become a marketabla commodity and in which the absence of all critical faculties is the safest guarantee of 'profitable specialisation of university studies'. The only way to oppose this type of stupidity is to attack all those academic restrictions whose only justification is that they exist…' Cohn-Bendit, পূর্বগ্রন্থ, পৃ ৩৫।

২৪. Large numbers of revolutionary young people, previ-

ইতিহাসে কোন রাষ্ট্রনেতা বা পার্টিনেতা তাঁরই হাতে গড়া রাষ্ট্র ও পার্টির নৈতিক অবনতি ও আদর্শবিচারের কঠোর সমালোচনার জন্য মুক্তকণ্ঠে সর্বজনকে আহ্বান করছেন, বিশেষ করে তরুণদের—এবং সেই আহ্বানের সাড়ায় যখন ব্যাপক বিদ্রোহ ও তীব্র সমালোচনার জোয়ার শৃঙ্খলার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে তখনও বলছেন 'Rebellion is justified'—'বিদ্রোহ সঙ্গত'—এ দৃষ্টান্ত বিরল নয় শুধু, কল্পনাতীত। মাও-সে তুঙ তাই করেছিলেন। একসময় দেখা যায় তাঁর আহ্বানে দূর গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে প্রায় বিশ লক্ষ তরুণ পিকিং শহর অভিমুখে অভিযান করে (এ-দৃশ্য আমরা ঠিক কল্পনা করতেও পারব না) এবং পোস্টারে ও বিতর্কে পার্টিনেতাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে, কিন্তু তখনও মাও 'বিদ্রোহ সঙ্গত' বলতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন নি। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে পরিষ্কার বলা হয়েছে—'In such a great revolutionary movement, it is hardly avoidable that they (তরুণরা) should show shortcomings of one kind or another, but their main revolutionary orientation has been correct from the beginning.'—এতবড় একটা বৈপ্লবিক ঘটনাবর্তের মধ্যে বিদ্রোহী তরুণদের পক্ষে ভুলভ্রান্তি করা স্বাভাবিক, কিন্তু তাদের বৈপ্লবিক মনোভঙ্গি গোড়া থেকেই নির্ভুল ছিল। যিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর অখণ্ড প্রতিপত্তি ও ব্যক্তিত্বের জোরে বিরুদ্ধবাদীদের ম্যাজিসিয়ানের মতো নিশ্চিহ্ন (purge) করতে পারতেন, তিনি কেন এই পন্থা অবলম্বন করলেন—'Why did he rely on the young people to open the attack for him?' (Robinson, পৃ ২৬)। কারণ তিনি জানেন, বেশি বয়সের একটা গোঁড়ামি আছে, একটা ক্ষমতাপ্রিয়তা ও আরামকেদারীয় মনোভাব আছে, একটা সর্বজ্ঞানীর দম্ভ আছে, যা তরুণরা ছাড়া কেউ ধূলিসাৎ করতে পারবে না। পর্দার অন্তরালে সোভিয়েট ইউনিয়নের 'purge'-এর মতো তিনি যদি তাঁর ব্যক্তিত্বের জোরে বিরুদ্ধবাদীদের অপসারিত করেন, তাহলে তাঁর আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। সেই উদ্দেশ্য হল, তিনি চান যে তাঁর অবর্তমানে জনগণের পার্টির কর্তৃত্ব যাতে জনসাধারণের হাতেই থাকে, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে না যায়[২৫]। তাই তরুণবিদ্রোহ মাও স্বেচ্ছায় আহ্বান করেছিলেন।

---

ously unknown, have become courageous and daring pathbreakers. They are vigorous in action and intelligent.'—*Decision of the C.C. of C.C.P. concerning the Great Proletarian Cultural Revolution, 8 August 1966.*

২৫. '…if Mao had cleared out the Rightists and attached the Party more firmly than ever to himself, he would have

পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই এ এক বিচিত্র বিদ্রোহ। বিদ্রোহ যিনি প্রকাশ্যে আহ্বান করেছেন তিনি পার্টি ও তার অধীন রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক, বয়সে অত্যন্ত প্রবীণ, তৎসত্ত্বেও তরুণদের বলেছেন সেই পার্টি ও রাষ্ট্রের নির্ভীক সমালোচনা করতে। বিদ্রোহকে বলছেন 'justified', এবং বিদ্রোহ ও সমালোচনার আতিশয্য ও ভুলভ্রান্তিকেও বলছেন 'hardly avoidable'. মস্কোর গোপন চক্রান্ত-আর-উচ্ছেদের পথ বর্জন করে পিকিঙের এই পথ মার্কসীয় বিপ্লবের ইতিহাসে নতুন দিগ্‌দর্শন। মস্কোর পথ মধ্যযুগের মোগল বাদশাহদের প্রাসাদচক্রান্তের পথ, পিকিঙের পথ বৈপ্লবিক জনগণের উন্মুক্ত পথ। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য কি? 'To the historian of the future it will appear as the first example of a new kind of class war··· against the incipient *new class of organisation men in the Communist Party*' (Robinson, পৃ ২৮, Italics লেখকের)। যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের 'অর্গানাইজেশন্‌ মেন', ম্যানেজার, ব্যুরোক্রাট, একসিকিউটিভদের নিয়ে গঠিত নতুন 'power elite' কমিউনিস্ট-পার্টি শাসিত সমাজে মার্কসীয় আদর্শের যে কি বিপর্যয় ঘটাতে পারে, সোভিয়েট ও যুগোস্লাভিয়া তার দৃষ্টান্ত। এবং এই পঞ্চকেশ ব্যুরোক্রাটদের জরদ্‌গবতন্ত্র (gerontocracy) যে-কোন বৈপ্লবিক পার্টিকে যে কতদূর ভেজিটারিয়ান রিভিসানিস্ট পার্টিতে পরিণত করতে পারে, বর্তমানে ফ্রান্স ইটালি ও আরও অনেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নৈতিক বিভ্রান্তি তার প্রমাণ[২৬]। এই সংকট থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন মাও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে। কিন্তু মাও-এর পক্ষে যে দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক কর্তব্য পালন করা সম্ভব হয়েছে, তা তাঁর উত্তরসূরীদের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা এখনই বলা যায় না, ভবিষ্যতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে পার্টি-ব্যুরোক্রাটদের শাসনমুক্ত থাকতে হলে এবং মার্কসীয় নীতির বিকৃতি না ঘটাতে হলে বিপ্লবী জনগণ, বিশেষ করে বিপ্লবী তরুণদের অতন্দ্র প্রহরীর মতো সজাগ

---

created the very situation that he was most anxious to avoid – a personal struggle for the succession, such as followed the death of Lenin and the death of Stalin. He wanted the succession to go to the people··' Joan Robinson ১, পৃ ২৬।

২৬. Milovan Djilas *The New Class : An Analysis of the Communist System*, N.Y. 1957.

Cohn-Bendit : *Obsolete Communism*, Andre Deutsch 1968 : এই গ্রন্থের 'The Nature of Communist Bureaucracy' অধ্যায় দ্রষ্টব্য, পৃ ১১০-২৫।

থাকতে হবে – 'The price of freedom from Party bosses is eternal vigilance' (Robinson, পৃ ২৬) – একথা ভুললে চলবে না। আমাদের ভারতবর্ষে অবতারবাদের ও গুরুবাদের ঐতিহ্য অত্যন্ত দৃঢ়মূল বলে, কমিউনিস্ট আন্দোলনে বৈপ্লবিক নীতিগত বিচ্ছেদ সত্ত্বেও অবতার-আর-গুরুর মোহ যে সহজে কাটছে না, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ভারতের তরুণ ও ছাত্রদের কমিউনিজমের এই বিকার সম্বন্ধে সেইজন্য আরও বেশি সজাগ থাকা প্রয়োজন।

সংকটমুক্তির তৃতীয় পথ হল ভিয়েৎনাম কিউবা প্রভৃতি দেশের মুক্তিসংগ্রামের পথ – এসিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন-আমেরিকার শোষিত অনুন্নত দেশের জনসাধারণের মুক্তির একমাত্র পথ। এই ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক পথেরও প্রথম প্রদর্শক চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং মাও-সে তুঙ। রুশবিপ্লবের শহরকেন্দ্রিক শ্রমিকনির্ভর বিপ্লবের প্রাগাদর্শ (model) যে কৃষি-কৃষকপ্রধান অনুন্নত দেশে প্রযোজ্য নয়, চীনবিপ্লব পরিচালনার কঠোর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে মাও তা প্রমাণ করেন। পরবর্তীকালে ভিয়েৎনামে হো-চি মিন, কিউবায় কাস্ট্রো ও গুয়েভেরা এই পথের সার্থক অনুগমন করেন। এ-পথ হল গ্রামকেন্দ্রিক কৃষকনির্ভর (প্রধানত) বিপ্লবী সংগ্রামের পথ, দীর্ঘ কঠোর পথ এবং সশস্ত্র গেরিলাসংগ্রামের পথ। অবিচলিত নিষ্ঠা, দীর্ঘ প্রস্তুতি, কঠোর সংগঠন, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস (অবশ্যই অবতারমোহমুক্ত) এই পথের প্রধান অবলম্বন এবং গ্রামের কৃষকরা হল (যারা যুগযুগান্তের শোষণ-পীড়নের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, যন্ত্রশিল্পযুগের শ্রমিকদের মতো দেড়শত বছর শোষিত নয়) এই সংগ্রামের বৈপ্লবিক শক্তির অফুরন্ত উৎস – 'in the colonial countries the peasants alone are revolutionary, for they have nothing to lose and everything to gain' (Fanon ১, পৃ ৪৭)। জ্যাঁ-পল-সার্ত (Fanon, ভূমিকা) সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন: '…the peasantry, when it rises, quickly stands out as the revolutionary class. For it knows naked oppression, and suffers far more from it than the workers in the towns…'

•

নগরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের আকর্ষণ মধ্যবিত্তের কাছে অত্যধিক, কারণ সেটা স্বচ্ছন্দ পেশায় পরিণত হতে পারে, তাই মার্কসীয় রাজনীতিও এতাবৎকাল নগরকেন্দ্রিক ও শ্রমিকনির্ভর হয়েছে, ভারতের মতো কৃষকপ্রধান অনুন্নত দেশেও। এবং যদি 'the city can bourgeoisify the proletarians, (Regis Debray, পৃ ৭৫), তাহলে শহর যে মধ্যবিত্ত মার্কসিস্টদের অবস্থা কতদূর শোচনীয় করতে পারে তার দৃষ্টান্ত সবদেশেই যথেষ্ট আছে। গ্রাম্য পরিবেশ ভোগীবিলাসী 'বুর্জোয়া'কেও 'প্রলেটারিয়ানাইজ' করতে পারে, করার

সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু শহুরে পরিবেশ মজুরকে, এমনকি গ্রাম্য কৃষকও, অল্প-দিনের মধ্যে 'আর্বানাইজ' অর্থাৎ 'বুর্জোয়াজিফাই' করতে পারে, বিশেষ করে গ্যাজেট্‌বহুল জীবনের সুখস্বর্গ আধুনিক মহানগরের পরিবেশ। কাজেই মার্কসীয় সংস্কারবাদের পুরিশোধন, অনুন্নত দেশে, মহানগরে সম্ভব নয়, গ্রামে সম্ভব। বিপ্লবের গতি গ্রামকেন্দ্র থেকে মহানগরমুখী হবে, মহানগর থেকে গ্রামমুখী হবে না, কারণ, সার্তের ভাষায় (Fanon, ভূমিকা) : 'the puppet bourgeoisie of businessmen and shopkeepers, the urban prolefariat, which is always in a privileged position, the *lumpen-proletariat* of the shanty towns – all fall into line with the stand made by the rural masses…'[২৭]

কিন্তু এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথে রোমান্টিক চোরাগলি আছে অনেক, তার মধ্যে প্রধান হল ট্রট্স্কাইট রোমান্টিসিজম, অসংগঠিত অতিবিপ্লববাদের কল্পনা-বিলাস (Debray, পৃ ৩৭-৪০)। মুক্তিসংগ্রামে এই বিপজ্জনক বিপ্লববিলাস সম্বন্ধেও সজাগ থাকা কর্তব্য।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের সুখভোগের মৃগতৃষ্ণা, সুখস্বর্গ, মহানগরের আকর্ষণ, নির্বিকার আত্মদাসত্ব, নিরাকার আত্মবিচ্ছিন্নতা – আধুনিক সমাজতান্ত্রিক সমাজের নব্য-মধ্যবিত্ত মার্কসীয় চিন্তাধারায় সংস্কারবাদের নিশ্চিহ্নতা – এবং তার সঙ্গে ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র উভয়ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র ও স্পেসক্রাইটের প্রতি-যোগিতার মর্মান্তিক দৃশ্য দেখলে বাস্তবিকই মনে হয় যেন সভ্যতার মুক্ত অঙ্গনে আজ মানুষ এক বিচিত্র 'অ্যাবসার্ড ড্রামা'র অসহায় দর্শক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু 'অ্যাবসার্ড ড্রামা' ছাড়াও যে জীবনমঞ্চে, সমাজপ্রাঙ্গণে, অন্য নাটকও অভিনয় করা সম্ভব – মানবমুক্তির নাটক – সেই কথাই আমরা বলতে চেয়েছি। সেই মুক্তিসংগ্রামের পথ ছাড়া মানুষের সামনে বেঁচে থাকার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। অন্য পথ আত্মহত্যার পথ, বীটনিকবিদ্রোহের পথ, বিচ্ছিন্নতার দ্বীপে নির্বাসিতের জীবনযাপনের পথ, নৈরাশ্যের দুর্ভেদ্য অমানিশার অন্ধকারে আত্ম বিলোপের পথ।

---

২৭. মাও-সে তুঙের বহু রচনায় এবিষয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অনেকেই তা জানেন বলে এখানে মাও-এর গ্রাম-নগর সম্বন্ধে উক্তিগুলি উদ্ধৃত করলাম না। এই প্রসঙ্গে হো-চি মিন, ফিডেল কাস্ত্রো, চে-গুয়েভেরা, ফ্যানন, দাব্রে – এঁদের রচনাবলীও উল্লেখ্য ('গ্রন্থপঞ্জী' দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থপঞ্জী

ক

Regis Debray : *Revolution in the Revolution ?* Pelican 1968.
Herbert Marcuse :
১ *Eros & Civilisation*, Sphere 1969. ; ২ *One Dimensional Man*, Sphere, Nov., 1968. ; ৩ 'Liberation from the Affluent Society in *The Dialectics of Liberation*, edited by David Cooper, Pelican 1968. ৪ *Reason and Revolution*, London Reprint 1969. ; ৫ *Negations – Essays in Critical Theory*, London 1968. এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় 'Aggressiveness in Advanced Industrial Society' দ্রষ্টব্য।
Frantz Fanon : *The Wretched of the Earth*, Penguin reprint 1969.
Che Guevara : *Reminiscences of the Cuban Revolutionary War*, Pelican 1969, *Guerilla Warfare*, Pelican 1969.
Joan Robinson *The Cultural Revolution in China*, Pelican 1969.

Joseph Schumpeter :
১ *Imperialism and Social Classes*. Meridian 1955.
২ *Capitalism, Socialism and Democracy*, London 1943.
C. Wright Mills :
১ *White Collar*, N. Y. 1951. ২ *The Power Elite*, N. Y.
৩ *The Marxists*, Dell 1969.
I. L. Horowitzed : *The New Sociology*, N. Y. 1965.
T. H. Spear : *English Social Differences*, London, 2nd Imp. 1956.
R. Centers : *The Psychology of Social Classes*. P. Univ. Press 1949.
Berle & Means : *The Modern Corporation and Private Property*, N. Y. 1932.
Lewis & Maude : *The English Middle Classes*. London 1949.
Merton, Gray etc. ed. : *Reader in Bureaucracy*, Glencoe 1952.
L. A. Coser : *The Functions of Social Conflict*. London 1956.
W. L. Warner : *Social Class in America*, Chicago 1949.
Bendix and Lipset ed. *Class, Status and Power : A Reader in Social Stratification*. Glencoe 1953.
T. B. Bottomore : *Classes in Modern Society*, London 1955.
G. D. H. Cole : *Studies in Class Structure*, London 1955.
T. H. Marshall ed. : *Class Conflict and Social Stratification*, London 1938.
Bendix and Lipset : *Social Mobility in Industrial Society*, London 1958.
James Burnham : *The Managerial Revolution*. N. Y. 1941.
P. F. Drucker : *The New Society : Anatomy of the Industrial Order* N.Y. 1950
W. H. Scott : *Industrial Democracy, A Revolution*, Liverpool 1955.
Barbara Wootton : *End Social Inequality*, London 1941.
Bertrand Russell : *Power : A New Social Analysis*, London 1938.
J. L. Talmon : *The Origins of Totalitarian Democracy*. London 1952.
David Reisman : *The Lonely Crowd*. N. H. 1950.
In *Transactions of the Third World Congress of Sociology* (vol. 3, London 1956) :
T. H. Marshall : 'General Survey of Changes in Social Stratification in the Twentieth Century'.
Moris Janowitz : 'Some Consequences of Social Mobility in the United States'.
Stanislaw Ossowski : 'Old Nations and New Problems : Interpretation of Social Structure in Modern Society'. (vol. 8, London 1957)
P. N. Fedoseyev : 'Laws of Social Changes in the Twentieth Century'.

V. S. Nemchinov : 'Changes in the Class Structure of the Population of the Soviet Union'.
Gosta Carlsson : *Social Mobility and Class Structure*, Sweden 1958.
Gunnar Myrdal : *Economic Theory and Underdeveloped Regions*, London 1959
David C. McClelland : *The Achieving Society*, Princeton 1961.
Marshal McLuhan : *Understanding Media – The Extensions of Man*. London 1964.
Herbert Gans : *The Urban Villagers*, N. Y. 1962.
H. S. Becker : *Outsiders, Studies in the Sociology of Deviance*, N. Y. 1963.
Edward Tiryakian : *Sociologism and Existentialism*, Prentice Hall 1962.
Daniel Bell : *The End of Ideology*, Glenco 1960.
A. J. Yates : *Frustration and Conflict*, N. Y. Science edition 1966.
A. Gunder Frank : *Capitalism and Under-development in Latin America*, N. Y. Monthly Review Press 1967.
R. Dumont : *Lands Alive*, M. R. Press 1965.
Pierre Jalee : *The Pillage of the Third World*, M. R. Press 1968.
Stanislaw Ossowski : *Class Structure in the Social Consciousness*, Glencoe 1963.
Ralf Dahrendorf : *Class and Class Conflict in Industrial Society*, London, 2nd Impression 1961.
William H. Whyte : *The Organization Man*, Pelican 1960.
Vance Packard : *The Status Seekers, The Waste Makers, The Hidden Persuaders*, Pelican.

খ

F. Musgrove : *Youth and the Social Order*, London 1964.
Paul Goodman *Growing up Absurd*. London 1961.
W. F. Whyte : *Street Corner Society*, Chicago 1964.
Ferdinand Zweig : *The Student in the Age of Anxiety*, London 1963.
T. R. Fyvel : *The Insecure offenders – Rebellious Youth in the Welfare State*, London 1961.
Philip H. Coombs : *The World Educational Crisis*, O. U. P. (N. Y.) 1968.
Cohn-Bendit : *Obsolete Communism – The Left Wing Alternative*, London 1968
Cockburn & Blackburn ed. : *Student Power*, Penguin Special 1969.
Seale & McConville ed. : *French Revolution 1968*, Penguin Special 1969.
Priaulx & Ungar ed. : *The Almost Revolution, France 1968*, Dell 1969.
Revolt in France, May-June 1968 : A Contemporary Record, Compiled from International Press and The Militant, N. Y. 1968.

কবিতা

সেই বুকই গুলি খায়

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

যেখান থেকে শুরু করেছিলুম,
একটা শিশু আকাশকে আস্তে আস্তে
বড়ো হতে দেখেছি,
অনেক খেল্না-মেঘ আর চিলের ডানার স্বাদলাগা
আকাশ।
নিচের ছায়ারা গাছের মাথায় ভর ক'রে
আমার দিকে ঝুঁকে দেখছিল আমার যৌবনের ভ্রূণের
পরিণতিটাকে।
প্রথম শরৎকালকে, প্রথম প্রাইজ-পাওয়া
চক্‌চকে চিত্রবহুল বইএর মতো
হাতে করে ঘুরে বেড়িয়েছি।
একটা মিথুন-বোধ, অল্প শ্মশ্রুরেখা
পায়ে লাগে দিগ্বিজয়ী তাড়া।
সব মিলে লিঙ্গ-শ্রেণী, মনের আত্মীয় সব
ভিড় ক'রে মিশে যায় পরিণত মনের শরীরে।
প্রথম কুৎসিত শব্দ অশ্লীল বর্ণগুলি
গায়ত্রীর মতো, আবৃত্তির রূপায়ণে ব্যক্তি হয়ে ওঠে।
দুর্বার নায়ক, বেরিয়ে পড়ল একদিন,
শারদীয় আভিযানে—কলেজ প্রাঙ্গণে
ময়দানে মিছিলের ভিড়ে।

রোস্তোরাঁ মাংসের স্বাদ শ্যামাঙ্গীর তন্বী দেহ ঘিরে—
কাছে এসে নিম্নস্বরে আদিরস স্তব করে—
বিপ্লবের আলো এসে চোখে মুখে লাগে।
দেহের ঘরের রস জৈব-জাহ্নবীর ধারা
নদী হয়ে বয়ে চলে মোহানার দিকে।
সমূহ, সাহিত্য আর সংখ্যাহীন অস্তিত্বের মেলা—
প্রবল ধ্বংসের পাশে সৃষ্টির বিলাস।
ঠিক এখানেই দেখি সেই শরৎ, দৈনিক
সশস্ত্র সোনালি আর প্রসিদ্ধ চরিত্রহীন পাড়ার নায়ক—।
গৈরিক আশ্রমে কোনো শ্রম নেই, পতন নেই, উত্থানও নেই,
প্রাণের বৈধব্যে নেই শরতের রৌদ্রবর্ণ
আন্দোলিত ধান আর শস্যের খামার।
যে উন্নত বুকের গভীরে সর্বনাশী প্রেমের গুঞ্জন,
সেই বুকই গুলি খায় প্রতিযুগে শরতে শরতে॥

যৌবন অথবা প্রেম অথবা প্রত্যয়!

কবিতা সিংহ

শেষদেখা এখানেই হবে
একথা নির্ঘাৎ জেনে এ শ্মশানে বসেছিল
নচ্ছার অচ্ছ্যুৎ এক শ্মশান সংগিনী!
দগ্ধচিতা নেড়ে বাঁশে ফাটায়ে করোটি
চুপ্‌চাপ ভেবেছিল—জ্যান্তেমর্তে বাক্য বিনিময়
মৃত্তিকার দু আঙুল উর্ধ্বে উঠে হবে।
জীবিতে প্রেতিনী হয়ে তাই এই তীব্র রসে থাকা।
বিদ্যুতের নিমেষ কশায় তাই সব মৃত মুখে
সনাক্ত-করণ।
যখনি হরিধ্বনি সংকীর্তন ক্রন্দনের রোল
ফুলপোড়া গন্ধ ওঠে, খৈ
জ্বলে যায় দূরের চিতায়।

রমণী অস্ফুটে বলে, – 'বলো ত কে আগে ছেড়ে যায় ?
যৌবন অথবা প্রেম, অথবা প্রত্যয় ?'
তখনি সে ডোমের মাথায় চড়ে
অকস্মাৎ চলে এলো একা বিলকুল
নির্ভেজাল বেওয়ারিশ লাশ
ব্যর্থ নারীর কাছে বৃথা এক নিহত পুরুষ।
শিয়রে দাঁড়ায়ে তার অন্ধকারে শ্মশানচারিণী
ক্রন্দনের রোলের অভাব, ফুল হরিধ্বনি পায়
ক'রে দিয়ে গড় গড় পড়ে গেল তার
নিজের রচিত এপিটাফ্ !
'– কুক্কুরেও পৃথিবীর মোটমাট যৌবনের ভাগ
যেভাবে বয়সে পায় তুমিও সেভাবে
পেয়েছিলে।
তারপর মানুষের ধাঁচে প্রেম ও প্রত্যয়, তাও
তাহলে কি পাপে ফের বিবর্ণ সময়
তোমাকে এভাবে এসে বাঘের মতন খেয়ে গেল ?
জিনে ও রেকাবে তুমি বসে রইলে, ঘোড়া
যৌবনের ঘোড়া ছুটে গেল দুপায়ের মধ্য থেকে
দূরে
আজ তাই যৌবনবিহীন ঐ
যৌবনের অহংকারী মুখে, নষ্ট প্রেম লুণ্ঠিত প্রত্যয়
মার্জারের মুখের ধারে চুরি করা দুধের মতন
লেগে আছে
আজ তাই তোমার চিতায়
আগুন ছোঁয়াতে গিয়ে হাত ফিরে আসে
প্রশ্ন, ফিরে আসে মাঠে মারা যাওয়া
বৃথা বজ্রপাত…'
একথা বলতে গিয়ে ক্রমে সেই ব্যর্থ রমণীর
চক্ষুস্থির হয়ে আসে।
কারণ সে মৃতের এ লাশ
শেষ চোখে নিদারুণ জ্যান্ত দেখেছিল।

দেখি, কে হারে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পথের দুপাশে দুটো সরু একরোখা গাছ
যেন যুদ্ধ বাধলেই বুঝি দিতে বসবে
নিজেরা তো নট্ নড়নচড়ন ঠকাস্
তাই, পরের কানে কুমন্তর ঢালতে ওস্তাদ-বাহাদুর
এমন কি, ঐ সূচ্যগ্র মেদিনীর কথাটাও
বলতে ভুলবে না
থাক্, ওদের কথাটা থাক্—
নিজের ব্যাপারটাই ধুয়ে-মুছে বলি
তোমাদের মধ্যে কেউ সাতগেঁয়ে আছো নাকি ?
তাহলে, কানে এটু তুলো দে বসো বাপু
আমাদের খেতির মুলো—কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান
তার নাম দিয়েছিলুম ভালোবেসে
পাড়াতে ছিলো এক অলপ্পেয়ে ক্ষয়কেশে
কী তার নাম ? নাঃ মনেও পড়ে না—
তাহলে, তার কথাটাও থাক্
নিজের ব্যাপারটাই একটু খুলেমেলে বলি
চকদীঘির ঐ যে মুচ্ছুদি খলিল
সে আমায় জানতো
আর সেই যে নেয়েপাড়ার কাস্ত, সেও
তবে, দুজনায় গেছে মরে
আগুপিছু—একে খেলে আগুনে, তো সে দুশমনকে গোরে
এখন আমিই শালা বাঁচছি
দুটো গাছের একটাকেও চাচ্ছি
আমায় ডালে তুলে নাও বাপধন
তারপর, সেখেন থেকে সটান যুদ্ধে পাঠাও
দেখি, কে হারে ?
আমি না ঐ ব্যাটা কেলে কুষ্মাণ্ড !

অসীম রায়

'প্রেমের হাল কে বোঝে শালা!'

আমি এখন দুপুরে ছানা খাই। ছানায় প্রোটিন আছে। কোনো অসুবিধে নেই। মণিকা বানায়। ছানার জলও পেটের পক্ষে ভাল।

সমস্ত যৌবনটা ভয়ে ভয়ে কাটত। এই বুঝি বিপ্লবের বাস-টা হু-হু ক'রে বেরিয়ে যাবে আমাকে পেছনে ফেলে। কোন অপরিচিত বন-বাদাড়ে অথবা বহুপরিচিত বাড়ির উঠোনে পড়ে থাকব সেই ভয়ে মরতাম। তারপর বিয়াল্লিশ বছরে বাথরুমে হঠাৎ আছাড় খেলাম। হাসপাতালে বিলিতি ডিগ্রির লম্বা লাজ আঁটা ডাক্তার বলেছিলেন আমার বেঁচে ওঠা তাঁর জীবনের অন্যতম বিস্ময়। আধখানা শরীর পড়ে গেল। মণিকা তিন রাত্তির পর পর আমার মৃতদেহের স্বপ্ন দেখল। তারপর বেঁচে উঠলাম। চেয়ে দেখি বিপ্লবের বাস-টা হু-হু ক'রে বেরিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে হাত-পা ফিরে পেলাম। শোনা গেল এটাও ডাক্তারি শাস্ত্রের অন্যতম বিস্ময়। তারপর একদা পার্টি কমরেড পুষ্পর মারফত চাকরিও পেয়ে গেলাম।

পুষ্প কেন চাকরি দিল এ কথাটা প্রথমে বুঝতে পারি নি। কারণ একই পার্টির দৃঢ় বন্ধনে অনেকদিন থাকলেও সেই বন্ধনের মধ্যে আমি আর পুষ্প একেবারে ছাড়াছাড়া ছিলাম। ওর ব্যাপার-স্যাপার ঠিক বুঝতাম না। আমরা যখন আমাদের সমস্ত যৌবনটা একেবারে কম্বলা বানিয়ে ফেলছি পুড়িয়ে তখন ও আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। সেজন্যে আমরা অনেকেই ওকে 'অপর-চুনিস্ট', 'কাওয়ার্ড' এরকম নানা আখ্যা দিয়েছি, কিন্তু আমরা মনে মনে জানতাম

আমাদের সামরিক উত্তেজনা প্রশমিত করার পরমুহূর্তেই যে বোধহয় ওকে আমরা ঈর্ষা করি। বোধহয় ওর শান্ত কালো চেহারার সতেজ দীপ্তি আমাদের বিব্রত করে। আমরা লক্ষ করতাম আশেপাশে আমাদের অনেকেরই মুখেচোখে পেটে পিঠে বয়সের ছাপ পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওর ঝাঁকড়া কালো চুল, সতেজ শ্যামল চামড়ার আভা ও বিজ্ঞাপননিন্দিত ঝকঝকে দাঁতের হাসিতে পুষ্টু বেঁধে রেখেছে প্রথম যৌবন। আর কাওয়ার্ড সে নয়, কারণ ভীতু না হতে হলে যা যা করা কিংবা হওয়া দরকার, যেমন জেলে যাওয়া, পুলিশের ঠেঙানি খাওয়া, সে সবের মধ্যেই সে ছিল।

পুষ্টু চাকরিটা দিল এগারো বছর আগে শ্যাম স্কোয়ারে শীতের সকালে আমাদের যে সাক্ষাৎকার হয়েছিল সে জন্যে। তখন খুব ধরপাকড় চলেছে। আর আমরা সাধারণত পার্কে রাস্তায় রেস্তোরাঁতে দেখাসাক্ষাৎ করতাম। টাক-পড়া পার্কটার পশ্চিমদিকের বেঞ্চিতে পুষ্টু বসেছিল। আমাকে দেখেই ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

আমার এসব ন্যাকামি অসহ্য। নিশ্চয় কোনো কেলেঙ্কারি ক'রে আমার সাহায্য প্রত্যাশী। বুঝতে পারছিলাম আমার চোয়াল ওকে দেখামাত্র শক্ত হয়ে যাচ্ছিল।

'তুই আমার মুখে থুতু ফেল! থুতু ফেল!'

'তার মানে?' অবাকের চেয়ে বিরক্তই হই বেশি।

'আমি যে কী জঘন্য কাজ করেছি তুই ভাবতে পারবি না!'

'পেট বানিয়েছিস?'

চোখ মুছতে মুছতে পুষ্টু বললে, 'তুই কোনো জিনিসটা সিরিয়াসলি নিবি না। সব ব্যাপার হাল্কা ক'রে দিবি।'

'সিরিয়াসলি নিচ্ছি বলেই তো বলছি।'

'না না। তোরা বুঝতে পারবি না। তুই একেবারে একরোখা কট্টর কমিউনিস্ট। এসব কথা তোর কাছে বলতে যাওয়াই আমার অন্যায় হয়েছে।'

আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'ওসব ন্যাকামি রাখ্। আমি একরোখা, আমি কট্টর কমিউনিস্ট। আই অ্যাম্ প্রাউড অফ্ ইট।...তুই কি ভেবেছিস আমি পাদরি? খুন ক'রে এসে হাঁটু গেড়ে বসলেই সাতখুন মাপ? আমার সময়ের দাম আছে। যা বলবার আছে বলে ফ্যাল্।'

পুষ্টু উঠে পড়েছিল। আবার ধপাস ক'রে বসে পড়ল। তারপর যান্ত্রিক গলায় বললে, 'আমি রমাকে বিয়ে করতে চাই।'

কপালে লাঠি পড়ল আমার। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, 'ইয়াকি মারিস না। সব ব্যাপারে ইয়াকি ভাল না।'

'রমাও আমাকে ভালবাসে।'

বেঞ্চির কোণায় আমিও বসে পড়ি। পার্কের তিনদিক জুড়ে বাড়ির মাথাগুলোর ওপর অকারণে চোখ বুলাই। খুব সুন্দরী এক মহিলা অদূরের ব্যালকনিতে তন্ময়ভাবে নাক খুঁটছেন। হঠাৎ সেই ঝলমলে সকালে ফেরিওয়ালার হাঁক আসে,—চাই কাঠ।

"একটা ব্যাপারে তোর কাছে অ্যাডভাইস চাইছিলাম। কর্তার ব্যাপারে।'

শেষ কথাটা খুব আস্তে আলগোছে ছুঁড়ে দেয় পুহু।

পুহু জানে অনেক বড় বড় নামজাদা নেতার চেয়েও কর্তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। অবশ্য যোগাযোগ বলা বোধহয় ঠিক হবে না। বলতে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই, আমি কর্তার অ্যালসেশিয়ান কুকুর। আমি রাজনীতি এত বছর করলেও অনেক সময় ঘাতঘোত ঠিকমতো বুঝি না, কিন্তু এটা বুঝি, কর্তা যদি বলতেন মণিকাকে পরিত্যাগ করতে, আমার ছেলের মুখ না দেখতে, আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতাম না। কর্তা আমার জীবনের দীপশিখা, একথা জীবনের তিরিশটা বছর পার করেও যদি কেউ বলতে পারে তার মতো সৌভাগ্যবান কে আছে? আর আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখেছি। ওসব আত্ম-সমালোচনা ক'রে হুকুম দেওয়া যায় না। কোনো প্রস্তাবের ভালমন্দ মিশিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়, খবরের কাগজের সম্পাদকীয় লেখা চলে, পাবলিক ওপিনিয়ন গড়ার ব্যর্থ চেষ্টার নামে ব্যবসা ফাঁদা যায়। কিন্তু হুকুম দিতে গেলে ভগবানের মতো হুকুম দেওয়া দরকার। কর্তা যেমন দিতে পারেন। আমার জীবন ধ্বংস হয়ে যাক কিন্তু যদি আমার দিকে তাকিয়ে তিনি একবার হাসেন তাহলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

পুহু আমার মনের অবস্থাটা জানে বলেই এই থিয়েটার করছে একথা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু রমা তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে ভেবে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ি।

'তুমি জানো? রমাকে তুমি ইনভল্‌ভ করছো। আমি তোমার নামে রিপোর্ট করতে পারি পার্টিতে?'

'কর, মাইরি কর, তোর পায়ে পড়ি কর, ওরা আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না।'

আমাদের পার্টির অন্যতম নেতা রণজিৎ ভট্টাচার্যের স্ত্রীকে ভাগিয়ে আনছে পুহু একথাটা একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয়। অবশ্য রমা এককালে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিল। পার্টিমহলে কেন বাইরেও এরকম আশ্চর্য সজীব গতিময় চেহারা খুব কম। কিন্তু আমার মতো কট্টর লোকের পক্ষেও একথাটা না বললে অন্যায় হবে যে শুধু চেহারায় নয় কথাবার্তাতেও রমা সত্যিই অসাধারণ। রমার অহেতুক গায়েপড়া ভাব নেই, তেমনি পুরুষবিদ্বেষী ব্রীড়াও তার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। বলতে কি, আমি একটু ঈর্ষান্বিত হচ্ছিলাম, বিশেষ ক'রে যদি রমার বক্তব্য সত্যি হয়।

'তোর মতলব কী বলে ফেলতো ?' আমার কাছে ব্যাপারটার গুরুত্ব ক্রমে ক্রমে ধরা পড়তে থাকে।

পুনুর কানে আমার কথা পৌঁছয় না। 'আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, রণজিৎ-দার কোনো দোষ নেই! রণজিৎদা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বেস করেছিলেন। আর আমি ? আমি রণজিৎদার নামেই রিপোর্ট করেছি।'

'রণজিৎদার নামে ?'

'তাছাড়া কোনো রাস্তা নেই আমার। আমি কি ক'রে সত্যি কথাটা বলব ? আমি বলতে পারি রণজিৎদা যখন ট্রেড ইউনিয়নের মিটিং-এ গিয়েছিলেন বম্বে ওঁর বাড়ির সব ভার আমার উপর দিয়ে, তখন আমি সেই সুযোগ নিয়েছি ?'

'তুই কী বলেছিস ?'

'আমাকে উল্টো চাল চালতে হয়েছিল। আমি বলেছি রণজিৎদা লম্পট, রমা চিরকাল অসুখী বিয়ের পর থেকে। বলেছি আমার কাছে ডকুমেন্ট আছে এ ব্যাপারে। আরও কি সব বলেছি, খেয়াল নেই।'

পুনুর সেই চিকণ তেলা চেহারাটা আমার কাছে হঠাৎ সড়সড়ে পোকার মতো লাগে। একটা পোকা আমার গায়ে উঠছে। আমি নিজের অজান্তে শার্টের কলার ঝাড়ি।

'রণজিৎদা লম্পট—একথা তুই উচ্চারণ করতে পারলি ? শালা, শুয়ারকা বাচ্চা, তোকে আমি টিপে মারব।' আমি পুনুর শার্টের কলার চেপে ধরি। বাস্তবিক কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। সমস্ত যৌবন ধরে যে পার্টির সেবা করেছি, চারপাশের ধরপাকড় ও প্রবল নিষ্পেষণেও যার বিক্রম অপরাহত সেই পার্টির এক অন্যতম স্তম্ভ রণজিৎ ভট্টাচার্যের নামে এইরকম জঘন্য জ্যান্ত মিথ্যে অপবাদ আমাকে পাগল ক'রে দেয়।

সাদা পমেরিয়ান নিয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক পার্কে ঘুরছিলেন। আমার কাণ্ড দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ান। কুকুরটাও তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় ঘেউ ঘেউ ক'রে আমার দিকে তেড়ে আসে। আমি পুনুর গলা ছেড়ে দিয়ে অবসন্ন-ভাবে বসে পড়ি। পুনু হাঁফায়। আমি যে প্রকাশ্যে তার গলা টিপে ধরেছিলাম একথাটা এখন বুঝতে পারি। সিগারেটের বাক্স বার ক'রে তাকে একটা দিই, আমিও ধরাই।

এখন আমার কাছে ব্যাপারটা আর ছাড়াছাড়া থাকে না। মাস তিনেক আগের কথা। খুব ভোর থাকতে রণজিৎদার বাড়ি গিয়েছি, বম্বে থেকে ফিরেছেন কিনা জানতে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পরও কেউ খোলে না। ফিরে যাব ভাবছি এমন সময় রমা দরজা খুলে দিল। একেবারে আলুথালু ঝড় বয়ে যাওয়া চেহারা। যেরকম স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে সে সবাইয়ের দিকে চায় তা অনুপস্থিত। বিয়ের আগে সে আমার এক বোনের সঙ্গে পড়েছিল। দেখা হলেই জিজ্ঞেস করেছে তার

'প্রেমের হাল কে বোঝে শালা!'

সম্পর্কে। এখন সে পালাতে পারলে বাঁচে। ভেতরে তক্তাপোষের উপর পুনু বসে। পরনে লুঙ্গি, হাতে চায়ের কাপ।

'অমিয়দা, এক কাপ চা হয়ে যাক। রমা একটু তাড়াতাড়ি কর।' বললে বটে পুনু, কিন্তু যতক্ষণ আমি ছিলাম নিজেকে কেবল অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছিল। অথচ রণজিৎদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক পুনুর চেয়ে অনেক দিনের। আসলে পার্টির অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাকে করতে হয় বলে রণজিৎদা আমাকে তাঁর বাড়ি সামলানোর কাজে ডেকে নি।

রমা নিজেও এক কাপ চা নিয়ে বসে। মাথা নিচু ক'রে একমনে চা খায়।

'রণজিৎদার চিঠি এসেছে?'

'হ্যাঁ, লিখেছে দু-একদিনের মধ্যে আসবে। হয়ত কাল পরশু আসতে পারে।'

আমি কোনোদিন এইসব মেয়েছেলের ব্যাপার বুঝি না। বলতে গেলে, আমার লাইনে নয় ও ব্যাপারটা। আমার সামনে আশেপাশে পার্টির ভেতরে বাইরে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেক ডিনিস ঘটে যাবার অনেক পরে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি। সেদিনও আমার সেই অবস্থা, কিন্তু তবু সেদিন সকালে পুনুর অহেতুক লাজুক লাজুক হাসি, আর রমার ঠাসা চুলের পাড় দেওয়া কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, তার একটু বেশিরকম জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা এ সমস্ত-গুলোর বিরুদ্ধেই আমার অবচেতন প্রতিবাদ ভাষা খোঁজে।

'বুলু কই? বুলু?'

'বুলু ঘুমোচ্ছে।' রমা বললে।

'সে কি! সাতটা বেজে গেছে। এখনও পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে? তুলে দাও।'

তারপর রমা উঠে যেতে আমি ঠাট্টা করি, 'তাহলে কমরেড? রণজিৎদার বাড়ির কেয়ার-টেকার হওয়া ছাড়া আর কি করছো?'

'বাঃ! তুই তোর কাজ ছাড়া আর সবকিছু নেকনজরে দেখিস?'

'কী কাজ? ও তোর পীস্‌ফ্রন্ট?' আমি খেঁকিয়ে উঠি।

'হ্যাঁ পীস্ একটা মস্ত বড় সমস্যা। সারা দুনিয়াজোড়া সমস্যা।'

'স্যাখ পুনু, অফিসে বড় চাকরি করবি, ওদিকে পীস্ পীস্ ক'রে পার্টিও করবি। এসব মামদোবাজি আমার কাছে দেখাস নে।'

পুনু চটে গিয়ে বলল, 'তুমি অ্যান্টি পার্টি কথা বলছো।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'পার্টি তো আমাদের নিয়েই। আমাদের বাদ দিয়ে তো নয়। আমরা শালা কয়লা বানাচ্ছি নিজেদের আন্দোলন ক'রে, চারপাশে মাঠে ময়দানে আন্দোলন ফেটে পড়ছে। চীনে আফ্রিকায় ল্যাটিন আমেরিকায় নতুন অভ্যুত্থান হচ্ছে। আর তোমরা রাসকেল কদমতলায় বাঁশী বাজাচ্ছো?'

পুনু যান্ত্রিকভাবে বললে, 'এ আর্গুমেন্ট আমিও শুনেছি। কিন্তু যে কথাটা

তুমি একদম ভুলে যাচ্ছো, যা আমরা পীস্ ফ্রন্টে বরাবর বলছি, এবার যদি বিশ্ব-যুদ্ধ হয় সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট কেউ থাকবে না।'

'ওটা এক মস্ত ধাপ্পা! আসলে সে রকম কিছু হবে না। আর শান্তি কারা করবে? যাদের দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে তারা এখন বসে বসে আইসক্রিম খাক, ব্যালে নাচুক। কিন্তু আমাদের ওর মধ্যে ভেঁড়ানো কেন?'

বুঝতেই পারছিলাম আমি বড্ড উত্তেজিত হয়েছি। এতক্ষণ নজর করি নি, বুলুকে নিয়ে রমা দাঁড়িয়ে।

'এসো বুলু, এসো, কোন্ ক্লাস হল?'

ঘুম থেকে সদ্য উঠে এসেছে ছেলেটা। একেবারে মায়ের মতো মুখের গড়ন। মায়ের অল্পবয়সের মুখখানা কেউ কেটে বসিয়ে দিয়েছে তার মুখে।

আমার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল বুলু।

আমি প্রায় ধমকানির স্বরে বললাম, 'জিজ্ঞেস করছি শুনতে পারছো না?'

'বল, কাকা জিজ্ঞেস করছেন।' এতক্ষণ পর রমলার স্বাভাবিক গলা কানে এল।

বুলু তার টানা টানা ঘুমে জড়ানো চোখে বিরক্তির স্বরে বললে, 'ক্লাস টু।' তারপর মা-কে জড়িয়ে ধরলে।

'বানান করতো পৃথিবী?' আমি ফস্ ক'রে জিজ্ঞেস করি।

এ আক্রমণের জন্য শিশুটি একেবারে প্রস্তুত ছিল না। তার চোখে ভয়ের ছাপ ঘনায়। প্রশ্নকর্তা সম্পর্কে প্রবল বিরোধিতা তার সমস্ত শরীরে মুখেচোখে। মায়ের আঁচল ছেড়ে সে সরে আসে। তারপর আমার খেঁকুটে চেহারার দিকে চেয়ে বলে, 'পয় রফলা···'

আমি পুনুর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে এক নজর চেয়ে খেঁকিয়ে উঠি, 'পয় রফলা?'

'না না পয় রিফালা,' নিজেই সংশোধন ক'রে নেয় ভুল।

'তারপর তারপর?'

'থয় হ্রস্বই বয় হ্রস্বই।' এক নিঃশ্বাসে বলেই আবার মায়ের কোলে মুখ লুকায় বুলু।

'এরকম নেগলেক্ট করছো কেন ছেলেটাকে? এখন তোমার কী কাজ রমা? নাচছোও না গাইছোও না, মাস্টারি করতেও ছুটছো না, এইটুকু যদি না করতে পারো তাহলে আমাদের মেয়েদের পড়াশোনার কি মানে?'

আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি রণজিৎদার পারিবারিক ব্যাপারে একেবারে গায়েপড়া উদ্বেগ দুশ্চিন্তা দেখিয়ে এখানে একটু স্থান ক'রে নিতে চাই। কারণ এত ভোরে পুনু এসে রমার সঙ্গে লুচি পরে চা খাবে এটা আমার মনঃপূত নয়।

'বাজার করতে হবে?' পুনু বেজারভাবে উঠে পড়ে।

'চাবি তো তোমার কাছে আছে। খুলে নাও না।' রমা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলে।

আর আমি যে এই অন্তরঙ্গতার বহিঃপ্রকাশে চিড়বিড়োচ্ছি এটা টের পেয়ে সে যেন মজা পায়। আমার কেমন সন্দেহ হয় এটা তার প্রতিশোধ। আমি যে তার অবিবাহিত জীবনে তার নাচ গান চর্চার খ্যাতিকে ঠোক্কর দিয়েছিলাম এটা তারই উত্তর।

'বাজার না হয় আর একটু পরেই করবে। আর একটু বোস না। আর এক কাপ চা করি', রমা বললে। পুনু উঠে পড়ল। তার অসোয়াস্তিকে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ঘরের কোণ থেকে মাছের থলি নিয়ে বললে, 'আমি চললাম। অমিয় চা খাও। এর পর গেলে পচা মাছ আনতে হবে।'

এখন আমার স্মরণ হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা। সেদিনের সকালের খুঁটিনাটিগুলো আজ সকালে পার্কে বসে একটার পর একটা মনে আসতে লাগল।

তক্তাপোষের কোণে পড়ে থাকা একখানা ইংরেজি উপন্যাস নাড়াচাড়া করছিলাম। কে একজন ফরাসি ভদ্রলোকের লেখা। আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই ওসব ব্যাপারে। রণজিৎদার বাড়িতে এরকম ধরনের বই দেখে আমি বরং অবাক হই।

'বইটা পড়েছেন অমিয়দা ? দারুণ ভাল !' রমা উৎসাহের সঙ্গে বলে।

আমি ভুরু কুঁচকাই। উত্তর দিই না। রণজিৎদার স্ত্রীর পক্ষে এ ধরনের বাচালতা প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয় এটা বুঝিয়ে দিই।

কিন্তু রমা তার ভরাট সুরেলা গলায় বলতে থাকে, 'পুনুদা দিয়েছে। আশ্চর্য ! কিছুই না। স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার। তাদের মিল হবার সমস্ত কিছুই আছে অথচ মিল হয় না !'

'এসব বুর্জোয়া ন্যাকামি কবে থেকে পুনু আমদানি করছে ? আশ্চর্য ! আমি তোমার কথা শুনে সত্যি আশ্চর্য হচ্ছি রমা !

'বইটা কিন্তু দুনিয়াজোড়া তারিফ পেয়েছে অমিয়দা !'

'ওসব কাগজের বুজরুকি ছাড়ো। যার টাকা আছে সেই জ্ঞানী—এই তো ক্যাপিট্যালিস্ট ওয়ার্লডের লজিক। এখানে ভাল বই কি ক'রে হবে তুমি বল ?'

রমা ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকায়। কথার জন্যে হাতড়ায়। তাকে ঠিক দেখাচ্ছিল তার সদ্য ঘুমভাঙা ছেলের মতো। আমার প্রশ্নের সামনে সে যে-রকম তাকাচ্ছিল ঠিক তেমনিভাবে আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললে, 'কিন্তু খুব সত্যি লাগে কথাগুলো, জানেন ? মনে হয়, মনে হয়, এগুলো অনেকের ক্ষেত্রেই হতে পারত।' তারপর আরও নিচু গলায় বললে, 'অনেকের ক্ষেত্রেই হয়।'

রমার কথা শুনে আমার আতঙ্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সমাজ শুধু পুলিশ গুপ্তচর দিয়ে নয়, তার সাহিত্য লেখাপড়া সমস্ত কিছু দিয়ে আমাদের সমস্ত নতুন চেষ্টার বনেদে ফাটল ধরাবার জন্যে তৎপর। এমন কি যেটা আরও অদ্ভুত হয়ে দাঁড়াচ্ছে

তা হল, যে-সর্ষে দিয়ে আমরা ভূত তাড়াব ভাবছি সেই সর্ষের মধ্যেই ভূত এসে হাজির হচ্ছে।

সেদিন রমার কথাবার্তাগুলো কোনো আগামী দুর্যোগের সম্ভাবনা নিয়ে আমার বুকের মধ্যে গরগর ক'রে উঠেছিল। তারপর অবশ্য ভুলে গেছি। বেমালুম ভুলে গেছি। সামনে নির্বাচন আসছিল। তার জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে করতে সমস্ত ব্যাপারটা মন থেকে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু আজ শীতের সকালে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে সমস্ত ঘটনাটা মনের মধ্যে নড়েচড়ে উঠল।

শেষ টান দিয়ে সিগারেটের ডগাটা ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, 'তারপর ?'

'তারপর খুব নোংরা ব্যাপার !' পুনু চুপ ক'রে থাকে। একটানা মন্থর গলায় বলে চলে, 'বম্বে থেকে রণজিৎদা ফিরলে রমা সোজাসুজি তাঁকে জানিয়ে দেয়— এভাবে আর চলা যায় না ; তাছাড়া, সে এখন দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে চলেছে.. আর এ সন্তান···'

'ও।' আমার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা জোগাচ্ছিল না। এতদিন ভাবতাম ভাল ক'রে আলোচনা করতে পারলেই দুনিয়ার বেশির ভাগ সমস্যা মিটিয়ে ফেলা যায়, বিশেষ ক'রে এ জাতীয় ব্যক্তিগত সমস্যা। কিন্তু আমার আগে ধারণা ছিল না যে এই সব ব্যাপার তলায় তলায় এক নির্দিষ্ট উপসংহারের দিকে মানুষকে নিয়ে যায়, তলে তলে কুরে কুরে সমস্ত সমাধানের বাঁধন আল্গা ক'রে দেয়। এমন চোখের ওপরে এমন হাতের বাইরে চলে যাওয়া ব্যাপার আমার জীবনে ঘটে নি।

'রণজিৎদা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ইউনিটে ব্যাপারটা তুলেছে। খুব গুছোনো লোক তো, বাইরে থেকে কিছুই বুঝতে পারবি না ভেতরে এরকম ঝড় বয়ে গেছে। আর সেইজন্যেই আমার কাছে অসহ্য লাগছে ব্যাপারটা। রণজিৎদা যদি আমাকে গালাগাল দিত, থাপ্পড় মারত, আমি বুঝতাম। জানি না কি হতো, কিন্তু এরকম ভগবানের মতো উদাসীন হয়ে আছে দাঁতে দাঁত টিপে যে আমার গায়ে জ্বালা ধরে যায়।'

আবার পুনুর চোখ ছলছল করে। 'আমি ঠিক তোর মতো মনে করি, রণজিৎদা দেবতুল্য লোক। কিন্তু এই দেবতা হবার জন্যেই রমা মরল।'

'শাট্ আপ্ !' আমি আবার গর্জে উঠি।

'বিশ্বেস কর, বিশ্বেস কর। আমি রণজিৎদার পাশে দাঁড়াতে পারি না। কিন্তু ঠিক এই জন্যেই রমা আমার কাছে আসতে চায়। সে সবকিছু আমাকে বলতে পারে। তার মনের সমস্ত আবোল তাবোল আমার ওপর ঢেলে দেয়। আমার তাই ভাল লাগে ! কোনো তর্ক করি না। তুই যদি পাশের ঘরে বসে থাকতিস, বিশ্বেস কর রমার কথা শুনলে তোর মনে হবে কথার ঝর্ণা বয়ে চলেছে। আর সেই রমা একেবারে চুপ মেরে যায় রণজিৎদার সামনে।'

'সে তো হালের কথা বলছিস যখন তুই ফুঁসলোচ্ছিস রমাকে।'

'প্রেমের হাল কে বোঝে শালা!'

'সত্যি আমাকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয় নি। আগে করেছি। তুই তো জানিস আমাকে। আমার মানে ও লাইনে একটু···'

'তোকে অতো বলতে হবে না। সেই জন্যেই তো বলছি রমাকে তুই ফুঁসলিয়ে বার করছিস, রণজিৎদার ঘর ভাঙছিস।'

পুষ্প খানিকক্ষণ চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে। চারপাশে অফিসের তাড়া পড়ে গেছে। কেউ পানের দোকানে পান খেয়ে রাস্তায় ঝাঁঝরিতে পিক্ ফেলে দৌড়চ্ছে বাস ধরতে। কেউ টাইয়ের গিঁট হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে চলেছে। কিন্তু চারপাশের এই চলমান ভাসমান জগতের বাইরে এক দ্বীপের অধিবাসীর মতো পার্কের কোণে বসে থাকি। পুষ্প আবার সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'আমি জানতাম তুই আমাকে বুঝবি না।'

'তুই আমাকে কি পেয়েছিস বলতো? তুই ভুল করবি, দোষ করবি, বিশ্বাস-ঘাতকতা করবি আর আমার কাছে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে সেগুলো বললেই আমি তোকে মদত দেব? তুই আমাকে এতখানি···ধ্বজভঙ্গ ভাবলি?'

'আমার অতো তাড়া নেই। বিশ্বেস কর। আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারতাম, কিন্তু রমা বলছে সে আর সহ্য করতে পারছে না।'

'তুই বলাচ্ছিস।'

'ঠিক আছে, তাই ভাব।'

পুষ্প উঠে দাঁড়াল। আমিও উঠলাম। পার্ক থেকে বেরোতে বেরোতে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তুই আমাকে কেন ডেকেছিলি বলতো?'

'সে আর বলে কি লাভ!' পুষ্প ম্লানভাবে বললে। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'সামনের সোমবার রাত্তির নটায় কর্তা আসছে রণজিৎদার বাড়িতে। একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যাক অমিয়। আমিও আর এভাবে পারছি না।···আমি ভেবেছিলাম তোকে বলব থাকতে। অবশ্য তোর যখন···'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাব।'

অনেক রকম মিটিংএ আগে গিয়েছি। কিন্তু এ ধরনের চরিত্র সংশোধন করার মিটিংএ যাই নি। ঘরে ঢুকতেই রণজিৎদা ডাকলেন, 'এসো অমিয়, এসো।' আমি রণজিৎদার উল্টোদিকে শতরঞ্জিতে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসি। আমার পাশেই পুষ্প। তার সুপ্রতিভ তেল চিকচিকে চেহারা আর ব্যস্ত চোখের চাহনি রণজিৎদার গম্ভীর গলা আর আয়ত স্থির দৃষ্টির পাশে একেবারে বেমানান। কিন্তু সবচেয়ে আমি অবাক হলাম রমাকে দেখে। খানিকটা সেজেছে রমা। সাদা চিকণের শাড়িতে তার বয়স আরও কম দেখাচ্ছে।

কর্তা নটা বাজার দু মিনিট আগে আসেন। রমার পাশে বসে রণজিৎদাকে বললেন, 'গ্যাস কম্পানির ব্যাপারটা তো মিটে গেছে?'

'হ্যাঁ আজ মিটল।'

'কটায় আর স্ট্রাইক চলছে?'

'চারটেতে, না পাঁচটাতেই চলছে।'

কর্তা পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোট বই বার ক'রে পাতা উল্টিয়ে বললেন, 'তুমি রণজিৎ পরশুদিন চারটেতে এসো কথা আছে।'

তারপর ঘড়ি দেখলেন। ঠিক নটা বাজে। ঘরের মধ্যে হঠাৎ থমথমে ভাব নেমে এল। দেখলাম পুষ্পরও ঠোঁটের ফাঁকে হাসি মিলিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে একটা উদ্ধত চোয়াড়ে ভাব ফুটে উঠছে। রমা নড়ে চড়ে বসে। চোখ দুটো এমনিতেই বড়, তার ওপর আরও বড় ক'রে চেয়ে থাকে, যেন সে প্রতীক্ষা করছে প্রতিপক্ষের আক্রমণ। রণজিৎদার মুখের কোনো ভাবান্তর হয় না।

'কদ্দিন সংসার করছো মা?'

'দশ বছর।' রমা নিজের পায়ের আঙুলের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে।

'এতদিনের সংসার ভেঙে দিতে চাও?'

আমি একবার রণজিৎদার দিকে তাকাই আর একবার রমার সুন্দর আনত মুখখানার ওপর আমার চোখ পড়ে। কত গুরুত্বপূর্ণ কথাই এর আগে কানের পর্দায় আনাগোনা করেছে কিন্তু খুব কম প্রশ্নের উত্তর শুনবার জন্যেই আমি এত উদ্‌গ্রীব হয়েছি।

রমা তার পায়ের আঙুলের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, 'মিথ্যে জিইয়ে রেখে কি লাভ?'

কর্তা একবার ভুরু কুঁচকালেন কিন্তু গলার স্বর পাল্টাল না। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন একটু হাসি হাসি মুখেই, 'প্রণব বাবুর সঙ্গে পরিচয় না হলে আপনার সংসারটা মিথ্যে বলে মনে হোত? নিশ্চয় হোত না? না?'

রমা বোধহয় প্রশ্নটা গুলিয়ে ফেলে। বোধহয় অন্য কথা ভাবছিল। বোধহয় মুহূর্তের জন্যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একাগ্রতার কথা ভুলে গিয়েছিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'কী বললেন?'

প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করা হলে রমা বলে, 'ভাঙা জিনিস জোড়া লাগে না।'

প্রশ্নকর্তার নিঃশব্দ হাসি আরও বেড়ে যায়। 'মোট কথা, রণজিতের সঙ্গে তুমি আর সংসার করতে রাজী নও, এই তো?' তারপর সেই শাণিত মৃদু হাসিখানা হঠাৎ মুখ থেকে মুছে ফেলে বললেন, 'বুলুর কথা ভেবেছো?'

'হ্যাঁ, আপনারা যা বিচার করবেন তাই হবে।' চাপা ধারাল গলায় রমা জবাব দেয়।

'আমাদের মনে হয় ঘর ভাঙার দায়িত্ব তোমারই। কাজেই বুলু রণজিতের কাছেই থাকবে।'

এতক্ষণ পর রমা মুখ তোলে। লক্ষ করলাম একবার অস্থিরভাবে পুষ্পর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে।

'প্রে মে র হা ল কে বো ঝে শা লা !'

'আর একবার ভেবে দেখ রমা। ছেলেকে ছেড়ে থাকা···'কর্তা বললেন।

রমা হঠাৎ নিচু স্পষ্ট গলায় বললে, 'আমাকে আর এক ছেলের কথাও ভাবতে হবে···যে ছেলে আসছে।'

'কী বললে ?'

আবার ঠিক তেমনি গলায় রমা জবাবের পুনরাবৃত্তি করে।

কর্তা এবার রণজিতের দিকে উৎসুকভাবে তাকান। তাঁর মুখ দিয়ে একটা ছোট্ট আওয়াজ বেরোয়, 'ও !'

'বুলু মায়ের সঙ্গেই থাকুক। নইলে ওর কষ্ট হবে।' রণজিৎদা গম্ভীর গলায় বললেন।

আমি বরাবরই রণজিৎদাকে সম্মান করি। তাঁর প্রবল কর্মদক্ষতা, কলের মতো দিবারাত্র কাজ করার সাথে সাথে সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, গেঁতো লোককে দিয়েও কাজ করিয়ে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা, এগুলো সর্বজন-পরিচিত। নইলে প্রায় গোটা তিরিশেক ইউনিয়ন চালানোর আসল দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে থাকবে কেন ? কিন্তু আজকের রণজিৎদা মিটিংএর সেই রণজিৎদা থেকে একেবারে আলাদা, এক বিশাল আগ্নেয়গিরির মতো রণজিৎদাকে লাগে। তাঁর ভেতরে ভেতরে যত আলোড়নই হোক, বাইরে সমাহিত। আমি সেই সমাহিত জীবন্ত আগ্নেয়গিরির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। মাঝে মাঝে পুনুর দিকে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নিই।

কর্তা একবার ঘড়ি দেখলেন। একবার গলা ঝাড়লেন। তারপর পুনুর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'তারপর প্রণববাবু ? আপনার কি বক্তব্য ?'

পুনু হকচকিয়ে যায়। সাধারণত ডাক নাম ধরে ও 'তুমি'-তে কর্তাকে ডাকাতেই সে অভ্যস্ত। কর্তা যে নতুন দূরত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন তা বুঝে পুনু আরও উদ্ধতভাবে তাকায়। অতুল নাচিয়ে বলে, 'আমার বক্তব্য হোল, একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যাওয়া দরকার। এরকম ভাবে চলতে পারে না।'

'কি রকম ভাবে চলবে ? বলুন ! বলে ফেলুন !'

'আমি,···আমি···রমাকে বিয়ে করতে চাই।'

'বাঃ ! বেশ !'

'আর রমাও···'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

পুনু একবার রমার আনত মুখের দিকে এক নজর চেয়ে তড়বড় ক'রে বলতে থাকে, 'তাছাড়া, তাছাড়া, রমা বরাবরই অসুখী। রণজিৎদা আদর্শ পার্টি-কর্মী হতে পারেন কিন্তু মোটেই আদর্শ স্বামী নন !'

'এসব আদর্শের কথা আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই না প্রণব বাবু।'

পুনু এক মুহূর্ত ভেবে বললে, 'রমাও তাই বলবে।'

কর্তা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমি তাও শুনতে চাই না। রণজিতের দিকে চেয়ে বললেন, 'পার্ক সার্কাসে রাত সাড়ে দশটায় মিটিং আছে।'

'হ্যাঁ, আমিও যাব। চলুন, এক সঙ্গেই যাব।'

এ মিটিং প্রায় ভাঙো ভাঙো। একটা চাপা উল্লাসের হাসি পুষ্পর মুখচোখে উপচে পড়ছে।

কর্তা বোধহয় সেদিকে চেয়েই বললেন, 'পার্টি-কর্মীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা মানে পার্টির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা।'

'আপনারা শাস্তি দিন। আমি শাস্তি নিতে প্রস্তুত', বিদ্রেটারি গলায় বললে পুষ্প।

'আমি জানতাম পার্টির স্বার্থ দেখবার ছঁশ আর আপনার নেই।'

কর্তা উঠে পড়ছিলেন। হঠাৎ বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি থামার আওয়াজ আসে। আতঙ্কিত গলায় রমা বললে, 'মা, তুমি এখানে?'

ভদ্র মহিলার পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি, শক্ত চেহারা। রণজিতের পাশে বসে পড়ে চোখ বুঁজে দু-তিনবার নিঃশ্বাস নেন। সাদা ধবধবে একরাশ চুলের সঙ্গে লাল পাড় বেশ বাহারে লাগে। ভদ্রমহিলা চোখ খুলে স্থির দৃষ্টিতে কর্তার দিকে চেয়ে বলেন, 'আমার জামাইয়ের কোনো দোষ নেই, আমার মেয়েই দোষী।'

ঘরের মধ্যে হাওয়াটা থমথমে হয়ে ওঠে আবার। 'এই কথাটা বলবার জন্যে দৌড়ে এলাম। হার্টের অসুখ। নড়াচড়া বারণ।'

'কেন কষ্ট ক'রে এলেন?' কর্তা বললেন।

'কেন এলাম? এলাম রণজিতের জন্যে। রণজিৎ সোনার টুকরো ছেলে। আমার মেয়ের দুর্ভাগ্য! আমার দুর্ভাগ্য! আর এলাম বুলুকে নিয়ে যেতে।'

'সে কি মা!' মাথা ঝাঁকিয়ে বলতেই রমার ঘোমটা পড়ে যায়। তার কাঁধের ওপর একরাশ চুল নজরে পড়ে।

মা মেয়ের দিকে তাকান না। কর্তার দিকে চেয়ে চেয়ে বলেন, 'আমার নাতিকে আমি জলে ফেলে দিতে পারি না। আমার মেয়ের ওপর কোনো বিশ্বাস নেই। ছেলে বড় হলে ওর বাপের কাছে চলে আসবে।'

ঠিক এই সময় পাশের ঘর থেকে হুটপাটের শব্দ আসে। বুলুর গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। 'মা, মা, দেখবে এসো, বেড়ালটা সব দুধ খেয়ে ফেলল,' বলে চিৎকার করতে করতে দুরজার কাছে এসেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় বুলু। এই অসময়ের সভার দিকে চেয়ে তার আধঘুমন্ত চোখেও প্রশ্ন জেগে ওঠে।

'তুই যা বুলু, আমি আসছি।' রমা বললে।

বুলু চলে যেতে রণজিৎদা ধীর গলায় বললেন, 'মা, আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। একটা গাড়ি ডাকি। আমরা আপনাকে নামিয়ে দেব, কাল সকালে আমি বুলুকে দিয়ে আসব।'

'প্রে মে র-হা ল্ কে সো বে শা লা!'

আশ্চর্য! সেদিন ট্যাক্সি খুঁজতে মোটেই বেগ পেতে হল না। বাড়ি থেকে দুপা বেরিয়েই একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে ধরলাম। রণজিৎদার শাশুড়ী ও কর্তা গাড়িতে উঠলেন। আমি পুনু ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। দরজায় রমা, আর তার হাঁটু জড়িয়ে বুলু।

তারপর পুনু আমাদের জীবনের কক্ষচ্যুত হয়ে কোথায় ছিটকে বেরিয়ে গেল হিসেব রাখি নি। মাস কয়েক পরেই আমরা দলে-দলে ধরা পড়লাম: কর্তা, রণজিৎদা, আমি, আরও অনেকে। আর আমার ওপর কর্তার অপরিসীম বিশ্বাসের নজির দেখে আমার আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। জেলে যাবার বেশ কিছু আগে থেকেই আমি কর্তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসি। আমাদের মধ্যে সম্পর্কের সামান্য অতিরঞ্জনের চিহ্ন মাত্র ছিল না। কর্তা সকলের মতো আমার সঙ্গেও বরাবর প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাকে এতদূর বিশ্বাস করবেন ভাবি নি। আর পার্টির সেই জীবনমরণ সংগ্রামে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের মাঝখানে এসে আমার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছিলাম। বলতে কি, তখন একেবারে নিজের দিকে তাকাই নি। সমস্ত কান খাড়া ক'রে আমি কর্তার হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করছি। হুকুম যে কখনো আলোচনাসাপেক্ষ হতে পারে এ যুক্তি তখন আমার কাছে অন্য কোনো গ্রহের মানুষের যুক্তি মনে হতো। আমাকে ঘনিষ্ঠ মহলে কর্তার অ্যালসেশিয়ান কুকুর বলত। এজন্যে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা ছিল না, এখনও নেই। বরং এ আমার গর্ব। আমি বরাবরই দেখেছি সমালোচনা আত্মসমালোচনা কখনও মানুষকে তার লক্ষে পৌঁছতে সাহায্য করে না, তাকে ক্রমশ ক্লীবে পরিণত করে। আত্মসমালোচনা কেবল নিজেকে কুরে কুরে খাওয়ার জন্যে। আসল কাজ হচ্ছে একবার লক্ষটা ঠিক ক'রে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে নিজেকে সেদিকে পরিচালিত করা। এবং কর্তার হুকুম ঠিক ভগবানের হুকুমের মতো আমার কানে বাজত। সর্বধর্ম পরিত্যাগ ক'রে খালি আমাকে ভজনা কর, কর্তার সমস্ত আচরণে গীতার এই সার কথা আগাগোড়া প্রতিধ্বনিত হতো। যারা একে অবতারবাদ বলে, গুরুপূজা বলে নাক-উঁচু করে তারা আসল ব্যাপারটা একদম বোঝে না। মানুষ তার কর্মক্ষমতা প্রকাশের নির্দিষ্ট রূপ খোঁজে, মেথডলজি আবিষ্কারের জন্যে সে তৎপর। যত তা ছড়ানো হয়, বহুজনের মধ্যে বিধৃত হয় সে রূপ, ততো তার কর্মশক্তি ঢিলে হয়ে পড়ে। লক্ষে পৌঁছানোর জন্যে আর সমস্ত লক্ষ গৌণ হয়ে পড়া চাই। যুদ্ধক্ষেত্রে তার ঊর্ধ্বতন অফিসার ছাড়া সৈনিক কাউকে চেনে না, সে বিচার ক'রে বেওনেট চার্জ করে না। তার কানে হুকুম, দৃষ্টি সরাসরি শত্রুর ওপর। কোনোরকম লিবারাল আলোচনার স্থান এখানে নয়।

জেলে যেসব চিঠিপত্র কমরেডরা লিখতেন বাইরে সেগুলো সেনসার করার

ভার ছিল আমার ওপর। এ নিয়ে বিতণ্ডা হয়। একজন খুব বিখ্যাত পার্টি-নেতা লংগত কারণেই আপত্তি করেন তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠি খোলার ব্যাপারে। আমার বয়স অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া তখন আমি অবিবাহিত। স্ত্রীলোক সম্পর্কে সাধারণ বিচারে আমি অনভিজ্ঞ। কিন্তু কতা অনড়। তিনি জানতেন, আমার মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বেরোবে না। এখনও বেরোয় নি।

মোটামুটি কাজটায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এ সম্পর্কে খুব একটেরে নির্দেশও ছিল না। দু-চারখানা প্রেমিক-প্রেমিকার চিঠি আদান প্রদান হতো। গোটা তিনেক অবৈধ প্রণয়ও ছিল। এসব ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি কিছু ছিল না। পার্টির সাংগঠনিক কোনো ব্যাপারের আলোচনা, আলাদাভাবে জোট বাঁধার চেষ্টা এসব বিষয়তেই আমাকে খবরদারি করতে হত। জেলে আমাদের তখন বছর দুয়েক কেটেছে। কে কি ভাবছে না ভাবছে মোটামুটি আমি ওয়াকিবহাল। এরই মধ্যে একদিন সব ওলোট পালট হয়ে গেল আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম নেতা রতন চৌধুরীর একই দিনে লেখা চারখানা চিঠিতে। প্রথমটি যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালের এক ডাক্তারকে লেখা, দ্বিতীয়টি মাসতুতো ভাইকে লেখা, তৃতীয় চিঠি এক সহপাঠী ও পাড়া সম্পর্কের বন্ধুকে, আর শেষ চিঠিও হাসপাতালের ঠিকানায়, রতন চৌধুরীর 'মামাতো বোন' অমলাকে। খামের ওপর যাকে চিঠি পাঠানো হচ্ছে তার সঙ্গে পত্রলেখকের সম্পর্ক দেখে আমি চিঠিটা খুলি। চিঠিটা আমি মনে মনেই কপি ক'রে ফেলি।

'অমু,

তুমি যে আমার জন্যে এতদিন বসে আছো তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আর যদি তুমি ডাকলেই আমাকে তাহলে এত দেরিতে কেন? মৃত্যুর দ্বারে এসে তুমি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছো, এ ডাক আমি কি ক'রে উপেক্ষা করি? তুমি অমু নিজের শরীরের ওপর বিশেষ নজর দেবে। এতদিন ধরে নিজেকে ক্ষয়ে যেতে দিয়েছো। আমি সব শুনলাম। এত বছরের ভার তুমি সহ্য করতে পার নি। তাই এরকম অসুখ বাধিয়ে আমার ওপর শোধ তুললে। সত্যি বলছি, আমি ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা কেঁচে গেছে। তোমার বাবার এত অমত, আমাদের সংসারের দুরবস্থা এ সব ভেবে আমি আর এগোই নি। আমার এখন নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হচ্ছে। গত দু-বছর চাকরি যাওয়ার পর সংসারে একটা পয়সা দিতে পারি নি। আমার ভাইবোনেরা যে জোট বেঁধে আমাকে 'ব্লাফ' দিয়ে এসেছে আর তুমি আমাদের সংসার চালাচ্ছো। তলে তলে আমি কল্পনাও করতে পারি নি। তোমার চিঠি পেয়ে আর তোমার কাণ্ড-কারখানা শুনে আমারি যে কি মনের অবস্থা হয়েছে তোমাকে বোঝাতে পারব না। এখন আমার পাড়ার সম্পর্কের বন্ধু ও আমার স্কুলের সহপাঠী আর আমার

এক. করিতকর্মা মাসতুতো ভাইকে লিখছি। তারা তোমাকে দেখবে। কিন্তু যতদিন না তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় ততদিন মনে রেখো তোমার রতন-দার আদেশ তোমাকে ভাল হয়ে উঠতে হবে। এইটাই আমার একমাত্র কথা।'

রতন চৌধুরী এক বর্ধিষ্ণু ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে উঁচু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অফিসার গ্রেড্ থেকেও শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব করার অপরাধে হঠাৎ চাকরী যায়। সেই বাড়ির বড় ছেলে। রতনদের সংসারের খুব দুরবস্থার কথা কর্তাও দু-চারবার বলেছেন। তবে যেখানে কিছু করার নেই সেখানে মামুলি আহা-উহু করেও কোনো লাভ নেই। এ পর্যন্ত আমি জানতাম। পরের ব্যাপারটা আমার জানার বাইরে।

রতন চৌধুরীকে পরদিন প্রসঙ্গটা তুলতে সামান্য যে সঙ্কোচ হয় নি তা নয়। এ যে হেলাফেলার ব্যাপার নয় তা তার চিঠিতেই স্পষ্ট। আর তাছাড়া জের। করবারও কিছু নেই। সব ব্যাপারটাই সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আলোর এ দীপ্তি আমাকে সামান্য ঘাবড়িয়ে দেয়। রতন চৌধুরীর বয়স আমার চেয়ে একটু বেশি, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ তো হবেই। তার মতো কর্মদক্ষ কর্মীও কম। কোনো প্যাঁচোয়া ব্যাপারে লোকটা নেই। এই লোকটা যদি আবার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকে তাহলে পার্টির ক্ষতি হবে এরকম আশঙ্কা যে আমার মনে ওঠে নি তা হলফ ক'রে বলতে পারব না। তবে প্রসঙ্গটা তুলতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। কালো কুচকুচে পাট জোয়ান প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের অফিসারটি আমাকে দেখা মাত্রই এগিয়ে এসে নিচু গলায় বললে, 'আমার খুব দূর সম্পর্কের মামাতো বোন অমলা। সে প্রায় পাঁচ-ছ বছর হয়ে গেল। ওকে বিয়ে করব বলতে ওর বাবা লাঠি নিয়ে তেড়ে এসেছিল।'

আমার কোনো প্রশ্ন করবার দরকার ছিল না। রতন জানতো আমি জেলের চিঠিপত্র দেখি। বললে, 'আপনি নিশ্চয় খুব অবাক হয়েছিলেন? আমিও হয়েছিলাম।' সেই পাট জোয়ান লোকটি এমন কোমল মায়াবী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে যে আমারই অসোয়াস্তি হয়।

'এখন কি করবেন ভাবছেন?'

'আগে তো বাঁচুক।'

চিঠিপত্র মারফত সবই খবর পেতাম। একদিকে হাসপাতালে মরণজয়ী সংগ্রাম চলে, আর ওদিকে জেলের ভেতর একজনের সমস্ত হৃদয় সেই সংগ্রামের খবরের জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকে। দেখা গেল এই বিপদে যাদের ওপর সে আস্থা রেখে-ছিল তারা রতনকে নিরাশ করে নি। ঠিকমতো খবরাখবর ক'রে যথাসময় রতনকে জানিয়েছে, মাসে দু-একবার জেলেও তারা এসেছিল দেখা করতে। মাঝে মাস দুয়েক অমলার অবস্থার অবনতি হয়। ডাক্তার প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিল।

অন্তত সেই মর্মে একটা চিঠিও আমি দেখি। তারপর ধীরে ধীরে চাকা অন্যদিকে ঘুরতে থাকে। আমাদের ছাড়া পাবার মাস খানেক আগে নীরোগ অমলা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে। তার প্রাক্তন সরকারি চাকরিতেই পুনর্বহাল হয়।

এই ক-মাসে আমার সঙ্গে রতনের এক অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। এ অন্তরঙ্গতা গড়ে আমার মানসিক বিরোধিতা সত্ত্বেও। কারণ যৌবনের প্রথম যুগ পার ক'রে এসেছি। এখন আর কারও সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সময় নষ্ট করতে চাই না, এই মনোভাবটা আমি কোনো সময় ত্যাগ করতে পারি নি। কিন্তু তবু আমি কিছুটা জড়িয়ে পড়ি। জেলখানায় জীবনযাত্রার একঘেয়েমি থেকে বরং এক ধরনের মুক্তির সন্ধান পাই রতনের বন্ধুত্বে।

ওদিকে রণজিৎদার কাছ থেকে আমি সরে আসি। তাঁর বাড়িতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনার নীরব সাক্ষীর সাহচর্য তাঁকে বিব্রত করে। মুখে কিছু বলেন নি। কিন্তু সেদিনে তাঁর বাড়িতে থাকা যে আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা হয়েছে সে কথা তাঁর হাবভাবে প্রকট। আর তাছাড়া তিনি এমন রাশভারি মানুষ যে এ প্রসঙ্গের ধার কাছ দিয়ে নিজে তো হাঁটেনই নি আমার পক্ষে কোনো কথা তোলা ইচ্ছে সত্ত্বেও অসম্ভব ঠেকেছে। এক একবার বুলু সম্পর্কে প্রশ্ন করবার প্রবল ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু রণজিৎদার মুখের দিকে চেয়ে কথা জোগায় নি। এছাড়া আর একটা নৈর্ব্যক্তিক কারণও আমাদের দূরত্ব আরও সুদৃঢ় করেছে। সম্প্রতি রাজনৈতিক কারণে রণজিৎদা-দের থেকে আমরা বেশ কিছু লোক অন্যভাবে চিন্তা করতে শুরু করি। যে ভাবনা আমাদের পার্টিকে পরবর্তী সময়ে দু টুকরো ক'রে দিল সেই ভাবনার বীজ জেলখানাতেই বোনা হয়েছিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেহারার বিচার নিয়ে মূলত এই বিরোধ। সেই বিচারে আমরা কি ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করব অথবা সোজাসুজি সংঘর্ষে যাব—সর্বাত্মকভাবে এই দুই চিন্তার প্রবল দোটানা স্রোতে আমরা দুদিকে ছিটকাবার উপক্রম করি। তখন অবশ্য বুঝতে পারি নি। উত্তেজনার আলোড়নে একটা কথা চাপা পড়ে যাচ্ছিল, এই দোটানার মূল প্রেরণা রাজনৈতিক হলেও তার সঙ্গে আরও অনেক কারণ জড়িয়ে মিশিয়ে একেবারে লেবড়ে গিয়েছিল। কর্তার ক্ষেত্রে কিংবা রণজিৎদার ক্ষেত্রে এসব কথা ওঠে না, কারণ নৈর্ব্যক্তিক চেহারার রূপ যে কতখানি সংহত হতে পারে এ সময় আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত গভীর বন্ধুত্ব এমনকি শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে চিড় খেতে শুরু করে রাজনৈতিক কারণেই। কিন্তু জেলের ভেতর আরও অনেকে ছিলেন, তাঁদের বিরোধের কারণ যে প্রধানত ব্যক্তিগত সে বিষয়ে আমার তখনও সন্দেহ ছিল না।

এই সমস্ত বুকচাপা পরিবেশের মধ্যে রতনের সাহচর্য আমাকে আনন্দ দিত।

আমি পত্রালাপের মারফত রতন ও অমন্তার জীবন নাটকের সমস্ত খবর পেতাম। আমাকে কিছু বলতে হতো না। রতনই সব বলত। একবার প্যারোলে হাসপাতালে আমলার সঙ্গে দেখাও ক'রে আসে ইতিমধ্যে। তারপর মুক্তি।

কিন্তু জেলখানা থেকে মুক্তি বলতে যা বোঝায় আমাদের ক্ষেত্রে তা হয় নি। বেরিয়ে আমরা প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যে পড়লাম। আমাদের মধ্যে বিরোধিতা আরও বেড়ে গেল। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কোনো কোনো জায়গায় নিজেদের মধ্যে খাওয়া খাওয়িতে যেমন দুর্বল হয়ে পড়লাম তেমনি আবার নতুন নতুন সংগঠন গড়ে উঠল। আমি নাক ডুবিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে ভিড়ের মধ্যে পাঞ্জাবী বাসের আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে আঁতকে উঠলাম। মাথার সামনের দিকটা একবারে ফাঁক হয়ে গিয়েছে। তা বোধহয় পাশের তরুণী যাত্রীটির ঠাসা চুলের কাছে একেবারে বিসদৃশ লাগছিল। খুব দ্রুত বিয়ে করলাম। যারা আমার সম্পর্কে হাল ছেড়ে দিয়েছিল তারাও তাক মেরে গেল আমার বিয়ের চিঠি পেয়ে। মণিকা ইস্কুলে পড়ায়, খুব ছুঁছুনে মেয়ে। ভাল খাওয়া কাকে বলে ভুলে গিয়েছিলাম। মণিকার হাতে রান্না খেয়ে জীবনের এক নতুন স্বাদ পেলাম। দেড় বছর যেতে না যেতেই বাবা হলাম। পার্টির কাজও প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছিল। তখন নিজেকে ঠিক রেসের ঘোড়ার মতো মনে হতো। ছুটছি, অবিরত ছুটছি, আরও বেগ বাড়াচ্ছি যত দিন যাচ্ছে।

এক শীতের সন্ধেবেলা রাত ক'রে বাড়ি ফিরলাম। ছেলেটার উড়বুড়ু কাশি। মণিকার হুকুমে পার্টি অফিস হয়ে তালমিছরি কিনে ফিরছি। ঠিক অন্যদিনের মতোই লাগছিল। পার্টির ভেতরে যে বিরোধী পক্ষ তাদের ঘায়েল করবার জন্যে লাগসই লাগসই যুক্তি মনে আসছিল। সেইসব চমৎকার জুৎসই কথাগুলো যেন হাত পা তুলে আমার চারপাশে নাচছিল। অন্যদিনের মতোই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে মণিকাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লাম। বোধহয় মাঝরাত। বাথরুমে গিয়েছি। হঠাৎ আমার চারপাশটা দুলতে আরম্ভ করল। ভাবলাম সাময়িক দুর্বলতার জন্যে মাথা ঘুরে গেছে। ভিটামিন খাওয়ার কথাও একবার মাথার মধ্যে খেলে গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই আরও এক বিরাট বিপদ আমার পা থেকে উঠে আসছে টের পেলাম। দু হাত দিয়ে কলের মুখ শক্ত ক'রে ধরেছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে হাত শিথিল হয়ে গেল। মণিকাকে ডাকবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু স্বর বেরলো না। আটচল্লিশ ঘণ্টার পর হাসপাতালে জ্ঞান হল।

কখনো মানুষের শরীরের ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝি নি। আমরা যে সর্বদাই এক প্রবল অনিশ্চিতির মাঝখানে বাস করছি একথা বিয়াল্লিশ বছরে এক প্রকাণ্ড দুর্ঘটনার মারফত টের পেলাম। গোটা একচল্লিশটা বছরে আমার জীবনব্যাপী অনিশ্চিত বলে কিছু ছিল না। কারণ যা অনিশ্চিত তা যুক্তি দিয়ে নিশ্চিত করা যায়। একথা আমি মনেপ্রাণে মানতাম যদি পার্সপেক্টিভ ঠিক থাকে তাহলে

সমস্ত বিশ্ব তোমার পায়ের তলায়। তাই রেসের ঘোড়ার প্রচণ্ড গতি সঞ্চালনে তোমাকে ছুটতে হবে তোমার লক্ষ্যের সন্ধানে। আর যা কিছু সব বাজে। এই নিশ্চিত জগত তৈরি করেছে আমার বাল্যকালের শিক্ষা, আমার স্কুল কলেজ, পার্টি, আমার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু হাসপাতালে এসে আমার এ বিশ্বাস প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। আমাদের দেহের ব্যাপারটা আমাকে আতঙ্কে স্তম্ভিত ক'রে দেয়।

মনে আছে পরদিন সকালে অনেক দূরে দরজার গোড়ায় মণিকাকে দেখা মাত্র আমি জন্তুর মতো শব্দ ক'রে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলাম। ডাক্তাররা সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীকে ভাগিয়ে দিলেন। প্রায় দশ-বারো দিন কোনো ভিসিটারের সঙ্গে দেখা একদম নিষেধ। দশদিন আমার বাক্‌শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল, সমস্ত বাঁদিকের অঙ্গ পড়ে যায়। ভোরবেলা ঘরে আলো এলে আমি খালি ডান হাতটা সেদিকে তুলতাম। আর গলা দিয়ে আমার জন্তুর মতো বিকট আওয়াজ বেরতো। এক কান দিয়ে সেটা ঠিক শুনতে পেতাম। আকস্মিক সর্বাত্মক অসহায়তায় আরও আওয়াজ করতাম। পাশের রোগীরা কানে হাত দিয়ে পাশ ফিরে শুত।

এরই মাঝে খুব ধীরে ধীরে প্রায় বোঝা যায় না ধরা যায় না-এরকম অলক্ষ কিন্তু অনিবার্য গতিতে আমার শরীরের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। শরীরের সাড় নাও ফিরে পাওয়া যেত, ফিরে পাওয়া গেল। পাকা ছমাস পর আমি উঠে বসলাম। আর চারপাশে চেয়ে দেখলাম যা ভেবেছি তাই ঠিক। বিপ্লবের বাস আমাকে ফেলে হু হু ক'রে বেরিয়ে গেছে। আমি চারপাশের সকলের কাছে, পরিবার প্রিয়জনের কাছে, পার্টির কাছে খরচের খাতায়। আমি এখন একটি ধ্বংসাবশেষ। আর মানুষের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে মাথা ঘামাবার বিশেষ সময় নেই।

আমাকে নিয়ে ডাক্তারি মহলে এক তুলকালাম ব্যাপার চলে। যে বিশাল বিশেষজ্ঞ আমার জীবনমৃত্যুর ভার নিয়েছিলেন তাঁর কাছে আমার কেসটা শুধু চাকরির পর্যায়ে থাকে না। নানা বিভাগের ডাক্তারকে জড়ো করেন, আমেরিকা থেকে অষুধ আনান। আর মাঝে মাঝে বলেন, 'আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমি বলতে পারব না মশাই। আপনি একটা চিকিৎসা শাস্ত্রের ওয়াণ্ডার! কি ক'রে বেঁচে উঠলেন ভগবান জানেন।' তাঁর উৎসাহে আমি মাঝে মাঝে বিরক্ত হতাম। আমাকে যেন ফটো ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখতে চান। পৃথিবীতে আমার শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া কি আমার কিছু নেই, কোনো সত্তা নেই? স্পষ্ট মনে আছে, শরীরটাকে ভয় পেতে শুরু করেছিলাম। শরীর আর মন যেন দুই সমান্তরাল জগত। আগে শরীরের কথা ক্ষণিকের জন্যেও ভাবি নি। এখন শরীর তার শোধ তুলছে!

হাসপাতালে এক রাত্তিরের কথা বিশেষভাবে মনে আসে। তখন আমি

'প্রেমের হাল কে বোঝে লালা!'

খুঁড়িয়ে হলেও ঘরের মধ্যে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছি। মন একেবারে ফাঁকা। শুনেছিলাম আমার অচৈতন্য অবস্থায় কর্তা এসেছিলেন। কিন্তু নিজে এই প্রবল আকস্মিক বিচ্ছিন্নতায় কোনো রকম সান্ত্বনা খুঁজে পাই না। আর সব সময় যুক্তি দিয়ে মনকে বুঝ দেবার যে ক্ষমতা তা ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

সে রাত্তিরে খাওয়া হয়ে গেছে। উঠে আলোয়ান জড়িয়ে অন্ধকার বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে আছি। রাত খানিকটা গড়িয়েছে। ঘরের মধ্যে রুগীরা কেউ ঘুমিয়ে, কেউ আধঘুমন্ত। দরজার গোড়ায় একটি খুব তরুণ রুগী রেডিও ধরবার চেষ্টা করছে। বোধহয় দিল্লী থেকে সঙ্গীতের আসর রিলে করা হচ্ছে। একটু পরেই গাঙ্গুবাই হাঙ্গলের গলা পেলাম। আর আমি কোনো ব্যাখ্যা করতে পারব না। খুব সহজে সরাসরি সেই ভারি পুরুষালী গলায় গাঙ্গুবাইয়ের আলাপ আমার মধ্যে এমন এক প্রবল তন্ময়তার সৃষ্টি করে যার স্বাদ একেবারে নতুন। অশিক্ষিত কানেও বুঝতে পারি ধীরে ধীরে ইটের পর ইট সাজিয়ে এক ইমারত তৈরি হচ্ছে। আমি এক বিরাট মানসিক পক্ষাঘাত থেকে মুক্ত হয়ে সেই ইমারতের কক্ষে কক্ষে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াই। দরবারী সে আলাপ মোটা ধারায় আমার ফাটা মাঠে ঝরতে থাকে। আমি একেবারে এক অন্য জগতে পা দিই। স্থির করি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গান শুনব।

হাসপাতাল থেকে বেরোবার আগে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বন্ধুটি আমাকে বললেন, অন্য কেউ হলে বলতেন গীতা পড়তে, কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী বলে সে সব কথা বলছেন না। তবে মৃত্যুর দরজায় বাকি জীবনটা সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে একথা চিন্তা ক'রে আমি যেন পরিশ্রম ও ছোটাছুটি বেশি না করি। তাহলেই দরজাটা পেরিয়ে যাব। আর হাসপাতালে পৌছাবারও সময় পাব না।

বাড়িতে গিয়েও চিকিৎসা চলে আরও তিনচার মাস। এক ভদ্রলোক ম্যাসাজ করতে আসতেন। হাতের আঙুলগুলো কাজ করত না। শেষপর্যন্ত সেগুলোও তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিরে পেল। আর মণিকা তার বিবাহিত জীবনের তিনবছরের মধ্যেই বুড়িয়ে গেল। আমি যাদের উপর নির্ভর করতাম একই সঙ্গে তাদের মড়ক লেগে গেল। বড়দা সবচেয়ে অদ্ভুতভাবে চলে গেলেন স্টেট বাস থেকে পড়ে। লোকটা আমার জীবনের অনিশ্চয়তার অনেকখানি বহন ক'রে এসেছে এতদিন।

এতদিন কেবল আগামীকাল ও আগামী সমাজব্যবস্থার সঙ্গেই আমার নিজের জগতের আদানপ্রদান ছিল। কখনও এই চারপাশের জগত, এই সমাজব্যবস্থা, এই বর্তমান কালকে বাস্তব বলে ভাবি নি। এখন বর্তমান দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তার বাস্তবতা প্রমাণ করতে লাগল। পাবলিসিটি ফার্মে কয়েকজন বাল্যবন্ধু ঢুকেছে। সেখানে কিছুদিন ঢুঁ মারলাম। একটা মারোয়াড়ি ফার্মে, মাস ছয়েক কেরানির কাজ করবার পর ছাঁটাই হয়ে গেলাম। বর্তমান সমাজের সামনাসামনি হয়ে

দেখি যে পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া অত্যন্তর নেই। পুরো একটা বছর বইয়ের ব্যবসা করব বলে সামান্য যা কিছু টাকা ছিল নষ্ট করলাম। দারুণ গা-গরম-করার মতো কয়েকখানা হুদো হুদো বই কয়েকজন নামজাদা লেখককে তালিম দিয়ে লিখিয়েও কিছু হল না। মণিকার চাকরিটা না থাকলে বোধহয় সপরিবারে ধরা-ধাম ত্যাগ করতে হতো। ইতিমধ্যে একদিন একটা শুভবিবাহের চিঠি পেয়ে চমকে উঠলাম। রতন ও অমলার বিয়ে। গেলাম বাস ঠেঙিয়ে কলকাতার এক রিফিউজি-অধ্যুষিত শহরতলি। অমলার চেহারা মোটেই রূপকথার রাজকন্যার মতো নয়। তারপর সুস্থ হয়ে একটু বেশি মোটা হয়ে গেছে। কিন্তু কথায় তার প্রবল আত্মবিশ্বাসের সুর আমার এমন বিপর্যস্ত অবস্থায় একটু বাড়াবাড়িই লাগছিল। প্রীতিভোজের পর রতন অমলা আমাকে বাস পর্যন্ত এগিয়ে দিল। অমলা বললে, 'আমি জানতাম, আপনি আসবেন।' আমি মনে মনে স্থির করি এবার চাকরি পেলে মণিকার জন্যে একটা ভাল টনিক কিনতে হবে।

চাকরিও পেলাম। এবারেও মাঝোয়াড়ি ভরসা। তবে বদলির কাজ। ওদের একাউন্টসের এক কর্তা কোনো এক মামলায় ফেঁসে গিয়ে উধাও হয়েছেন। তিন মাস পর ফিরবেন। ইতিমধ্যে অসম্ভব কাগজপত্তর জমেছে। তার কিছু আমি সে-ভদ্রলোকের তিনভাগের একভাগ পারিশ্রমিকে পরিষ্কার করার কাজে হাত দিই। মাসের প্রথমে আমার জীবনে প্রথম চারখানা করকরে একশো টাকার নোট পকেটে ট্রাম থেকে নামলাম।

নেমেই সামনে ওষুধের দোকান, কিন্তু টনিকের কথা মনে পড়ল না। বাস স্ট্যাণ্ডে অমলার মুখখানা ভেসে আসতে লাগল, তার সঙ্গে জেলখানা থেকে লেখা রতনের চিঠি, 'তুমি অমু নিজের শরীরের ওপর বিশেষ যত্ন নেবে। এতদিন ধরে নিজেকে অবহেলা ক'রে ক'রে নিজেকে ক্ষয়ে যেতে দিয়েছো। আমি সব শুনলাম···।' প্রত্যেকটা কথা আমার কানে বাজতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গানের আওয়াজও কানে এল। রাস্তার মোড়ে রেডিও-গ্রামোফোনের দোকানে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাজছে :

তোমার ঐ ঝর্ণাতলায় নির্জনে
মাটির ঐ পরশখানি ছাপিয়ে গেল কোনখানে।

দোকানটায় হঠাৎ ঢুকে পড়লাম। সোজা কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'গাঙুবাই হাঙ্গলের রেকর্ড আছে—দরবারী কানাড়া?'

টেরিলিনের শার্ট পরা ব্যস্ত যে ছেলেটি ক্রেতাদের রেকর্ড দেখাচ্ছিল সে আমার দিকে চেয়ে একবার ভুরু কুঁচকায়। বোধ হয় ধুতির ওপর হাত গোটানো শার্ট পরা কালো কম্বলার মতো আমার চেহারার সঙ্গে দরবারী ক্লানাড়ার যোগসূত্র আবিষ্কার করতে না পেরে তরুণটি অবাক হল। তারপরই রেকর্ডখানা নিয়ে আসে। আমি মরিয়ার মতো কোনো দিক চিন্তা না ক'রে রেকর্ডখানা কিনে

ফেলি। কিনে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকি। সামনেই পুনু আর বোধহয় তার ছেলে। কচি গলায় ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল, 'সুচিত্রা মিত্রের আর রেকর্ড নেই? এটা চলবে না, এটা রেখে দিন।' ঠিক এই সময় পুনু কাউন্টারের দিকে মুখ ফেরায়। 'অমিয় না?' সেও তার ছেলের মতোই চেঁচিয়ে ওঠে।

দুজনেই দোকান থেকে বেরিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। পুনু মোটা, ভারি, ক্লান্ত। এ পুনু সে পুনু নয়।

'ক বছর আগে রে?'

আমি বুঝতে পারছিলাম কী বলতে চাইছে পুনু—ক-বছর আগে আমাদের সেই আলাপ হয়েছিল পার্কে?

'তা দশ-এগারো বছর হল।'

'হ্যাঁ! মেঘে মেঘে অনেক বেলা হল!' পুনু বললে।

হঠাৎ পুনুর ছেলে আমার হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললে, 'তুমি একদিন আমাদের বাড়ি এসো না!'

আমি একনজর ছেলেটির দিকে তাকাই। নিঃসন্দেহে এই সেই বিতর্কিত সন্তান, রণজিৎদার চেহারার কোনো সাদৃশ্য নেই। তার চোখের দিকে চেয়ে এগারো বছর আগের পুনুর ঝকমকে চোখ জোড়া মনে এল। পুনুর বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে বাধো-বাধো লাগছিল। কিন্তু আবার ঝাঁকানি দিল ছেলেটি, 'চল না, এখনই চল না।'

'চল্ না, এই তো কাছেই।'

'আজ থাক, আজ ভীষণ ক্লান্ত। কোনোদিন তো তোদের মতো চাকরি করি নি! একটা দু মাসের চাকরি পেয়েছি।'

'দু মাসের চাকরি।'

'হ্যাঁ মারোয়াড়ি ফার্মে। আর কে দেবে বল!'

পুনু আমার দিকে এক নজর চেয়ে নিচু গলায় বললে, 'আমাদের অফিসে লোক নিচ্ছে। তুই তো অঙ্ক-টঙ্ক করতিস।···তুই আয় একদিন। একটু তাড়াতাড়ি।'

'আমি তাহলে সোমবার সকালেই যাব।'

'আমরা পাশের বাড়িটায় গিয়েছি দু-বছর। নতুন যে চারতলা উঠেছে তার দোতলা ফ্ল্যাটে।

সোমবার যে দোলযাত্রা খেয়াল ছিল না। বাজার করতে গিয়ে টের পাই। বাজারের গায়ে রাস্তার পাশে দোকানে আবির আর পিচকিরির মহড়া। একবার ভাবলাম আর একদিন গেলেই হবে। কিন্তু আমারই গরজ বেশি। তাছাড়া পুনুর সংসারটা দেখবার যে কৌতূহল একেবারে ছিল না তা নয়।

ঢুকেই মনে হল বেশ ছিমছাম সংসার। যেখানে যেটি থাকার কথা সেখানে সেটি আছে। আমার সংসারের একেবারে বিপরীত। কিন্তু পুনুর মুখে চোখে

এমন এক আড়ষ্টতা যা কিছুতেই চোখ এড়িয়ে যাবার নয়। পুনু আমাকে একটা দরখাস্ত দিতে বললে তার কাছে, তার একটা মোসাবিদাও ক'রে দিলে। তার হাবভাবে মনে হল বোধহয় হয়ে যাবে চাকরিটা। কিন্তু যে জন্যে আমি এতক্ষণ উসখুস করছিলাম তা হল রমার আবির্ভাব। পুনু সে ধার দিয়েও গেল না, শেষ-পর্যন্ত ফস ক'রে বলেই ফেললাম, 'রমা বাড়িতে নেই ?'

'এক্ষুণি আসছে। দাঁড়া, বলি !'

পুনু ভেতরে চলে গেল। তারপর আর ফেরে না। বেলা চড়ছে। রাস্তার ছেলেদের সম্ভাব্য অক্রমণের কথা চিন্তা ক'রে আমি উসখুস করি। পুনু আসে। একটু আমতা আমতা ক'রে বলে, 'রমার শরীরটা ভাল নেই।'

পাশের ঘরেই বোধহয় রমা। তার সঙ্গে পুনুর গুজগুজ ফুসফুসের আওয়াজটাও কানে আসছিল। পুনুকে ভীষণ বিপর্যস্ত লাগে, ভীষণ তাড়িত পীড়িত এক ভদ্রলোক সে। একথাটা আমার মনে আসে যে বোধহয় রমাকে সামলাতে সামলাতেই তার অর্ধেক জীবনীশক্তি নিঃশেষিত। আমার মুখের দিকে চেয়ে মরিয়ার মতো পুনু চেঁচিয়ে ওঠে, 'এক কাপ চা করবে নাকি গো ?'

'নিজে ক'রে খাও না। বসে বসে তো ল্যাজ নাড়াচ্ছো !' ঝাঁঝালো প্রায় অপরিচিত গলা ভেসে আসে পাশের ঘর থেকে।

এবারে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে পুনু। সোফায় রেডিওগ্রামটার গায়ে একেবারে দুমড়ে বসে থাকে। আস্তে আস্তে বলে, 'মানে···ঠিক হয় নি জানিস ? যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক হয় নি।'

'আচ্ছা, দরখাস্তটা আমিই দিয়ে যাব।' আমি প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসি। নামতে না নামতেই বেগুনী রংয়ের ঝর্ণায় পিঠ ভিজে যায়। কিন্তু ভেজা পিঠের দিকে আমার খেয়াল ছিল না। সেই অবিস্মরণীয় সকালে রমার ঘাড়ে একরাশ চুল, তার কথা 'মিথ্যেকে জিইয়ে রেখে কি লাভ ?' সেই আধঘুমন্ত বুলুর চিৎকার, 'বেড়ালটা সব দুধ খেয়ে ফেলল' আমার মনের মধ্যে ভিড় ক'রে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে রতন অমলার মুখ দুটোও উঁকি মারে।

হঠাৎ সামনে একটা ভিড় দেখে থমকে দাঁড়াই। হোলির পার্টি। কয়েকটা ছেলে শূন্যে আবির ছিটোচ্ছে। হ্যাটপরা একটা ছেলে ঢোল বাজচ্ছে। হঠাৎ একটা ছেলে লাফ মেরে বেরিয়ে গান ধরে, কানে একটা হাত। প্রথমে বুঝতে পারি নি কথাগুলো। আবিরে রাঙা খাকি প্যান্ট পরনে ছেলেটা, গায়ে লাল আর সাদা ডোরার শার্ট। গালে মেচেতা, ঠোঁটের ওপর ফৌজি গোঁফ, রোগা। একটু হিজড়াসদৃশ অঙ্গভঙ্গিতে পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছেলেটি চড়ুই পাখির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এসে কোমর বেঁকিয়ে এক হাত কানের পেছনে রেখে গান ধরে :

প্রেমের হাল কে,বোঝে শালা !
কিছু নেহি তাতে মাল মশালা,
চেয়ে আছে ঐ মধুবালা
হাঁ-হাঁ-হাঁ হাঁ-হাঁ-হাঁ হাঁ !

আর সঙ্গে সঙ্গে ওপর তলায় সে জানলার দিকে চায় আর চোখ মারে। শেষ লাইনে পাখির মতো গলাটা সামনে পেছন করে।

আমি সম্মোহিতের মতো সেই গান শুনি। আর একবার বেগুনী ঝর্ণায় আমার পিঠ ভিজে যায়।

অশোক মিত্র

বাংলাদেশ : ১৯৬৯

বাংলাদেশের আরো অগণিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্তের মতো, প্রারম্ভিক অন্ধ গান্ধিভক্তি থেকে শৈশবসন্ধে আমার বাবার অয়ন ঘটে কমিউনিস্ট পার্টির সন্নিকট বৃত্তে। ১৯৬৪ সালের যে-সপ্তাহে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে দু'ভাগ হয়, সেই সপ্তাহেই আমার বাবা মারা যান। ঘনবদ্ধ তমিস্রার সময় গেছে সেটা, আন্দোলন ছত্রভঙ্গ, পরিপার্শ্ব নির্জীব ; ভদ্রলোক মৃত্যুর অব্যবহিত আগে মনে পড়ে দুঃখ ক'রে বলেছিলেন : যা ব্যাপার-স্যাপার ঘটে গেলো, গোটা পঁচিশ বছরের মধ্যেও আর দেশে কমিউনিজম আসবে না।

কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরেই ভেল্কিবাজি হয়েছে। আসলে ইতিহাস নিজের নিয়মে বেয়ে এগোবেই। সাময়িক বাধা মাঝে-মাঝে কিছু অস্থৈর্যের সঞ্চার করতে পারে মাত্র, তার বেশি কিছু না। এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশের পটভূমি যেমন বদলেছে, মানসিকতার রঙও আশ্চর্য দ্রুততায় পরিবর্তিত হয়েছে সেই সঙ্গে। দ্রুত, ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ, কোলাহলদীর্ণ এক আবর্তের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। ইতিহাস খানিকটা সময় থমকে থেকে হঠাৎ ফের বেগবান হয়েছে বলেই হয়তো, এক সঙ্গে অনেক-কিছু ঘটছে, তাল-বেতাল, প্রকট-অস্ফুট, মোলায়েম-রূঢ়, মহান-ক্লেদাক্ত। একটি বিশেষ গ্রহের আবহের আনুগত্য থেকে অন্য এক মূল্যের আবহে পৌঁছুবার ক্রান্তিলগ্নে এরকম এলোপাথাড়ি ঘটনা-উপঘটনা অনিবার্য। সামাজিক উপপ্লবের প্রথাটি কোনোদেশেই ঠিক মধ্যবিত্ত আচারকলা-শিষ্টতা-ভদ্রতা মেনে নিয়ে এগোয় না। গণিতের অনুশাসনে সমাজ কখনোই বাঁধা পড়ে না : যদি পড়তো, তাহলে একমাত্র পদার্থবিজ্ঞানী ছাড়া কারো প্রয়োজনই থাকতো না এই পৃথিবীতে।

রোজ কাগজ খুলে আপাতত আমাদের বিস্মিত শান্তির খবর পড়তে হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে দামাল অশান্তি, কলকারখানায় ঘেরাও-ধর্মঘট, ছাত্রমহলে উচ্চগ্রাম অবিনয়ী প্রতিবাদ, সদাগরী পাড়ায় কেরানিদের শক্তির আস্ফালন। ভীষণরকম গোলমাল, করালবদনী তারা শ্মশানে নৃত্যরতা হলে যে-ধরনের প্রলয়াভাস আমাদের কল্পনায় আসে, হুবহু যেন সেরকম অবস্থা। অবিকল নৈরাজ্য নয়;

অসুবিধা ঘটলেও, অধিকাংশ শ্রেণীর লোকই এখন পর্যন্ত মোটামুটি খাচ্ছে-দাচ্ছে, কিন্তু একটা অর্ধস্বচ্ছ অনুভাবনা যে আর খুব বেশিদিন এভাবে চলতে পারবে না, বিস্ফোরণ ঘটবেই। এই বিস্ফোরণের আশঙ্কায় কেউ ভয়ে কুঁকড়ে আসছেন, কেউ শিলীভূত ক্রোধে রুদ্ধবাক হচ্ছেন ; অন্য কেউ-কেউ বিস্ফোরণের প্রত্যন্তে নীলাকাশ-কাশফুল ইত্যাদির স্বপ্ন দেখছেন ; তেমন-কেউই নিরপেক্ষ চিন্তায় উৎক্ষিপ্ত নেই আর।

তার আগে শ্রেণীবিভাজনের দিকে ক্রমশ আমরা এগোচ্ছি। ঢালাও উক্তি করা হল। মানছি, যা-যা ঘটছে তাদের মধ্যে অনেক উচ্চাবচতা আছে, অমুক তত্ত্বের তমুক প্রশাখার ফলিত দৃষ্টান্ত কেউ খুঁজতে গেলে অবধা হন্যে হবেন, নয়তো গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপাতপরস্পরবিরোধী অনেক কিছুর সমন্বয় ১৯৬৯ সালের বাংলাদেশে : যে মীমাংসাই উপস্থিত করি না কেন, তার পরিপন্থী কোনো ভগ্নাংশিক সিদ্ধান্ত অন্য-কেউ নিশ্চয়ই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাজির করতে পারবেন। সুতরাং আমি পাদটীকা নিয়ে ঝগড়ায় নামবো না, খুব সাধারণভাবে শাদামাটা কতগুলি লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করব। লক্ষণগুলি দেখেই মনে হয়, ছায়া পূর্বগামিনী।

দেখে-শুনে প্রথমেই যা মনে হয়, বাঙালি সমাজে মিহিন মধ্যবিত্তদের প্রভাব কমছে, একদা-যাঁরা-ভদ্রলোক-নাম-অভিহিত হতেন, তাঁদের একটা বড়ো অংশ শ্রেণীস্খলিত হয়ে প্রথাগত ছোটোলোকদের কাছাকাছি যাচ্ছেন। দেশভাগ না-হলে এই পরিবর্তন অসম্ভব ছিল। দুটো ঘটনাক্রমের ফলে ভদ্রশ্রেণী কৌলিন্যচ্যুত হয়েছেন, এখনো হচ্ছেন। কলোনিতে-স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে-শহরের বস্তিতে জড়ো-হওয়া শরণার্থী সম্প্রদায় বিগত দুই দশকে মস্ত ক্রান্তির মধ্য দিয়ে গেছেন। বামুন-বদ্যি-কায়েতরা পূর্ববঙ্গের ভিটেবাড়ির নিটোল সুখাচ্ছন্দ্যের স্বপ্নগর্ব অহমিকা আস্তে আস্তে ভুলেছেন, গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ ইত্যাদির স্মৃতি ফিকে হতে হতে একেবারেই মিলিয়ে গেছে ; বর্তমানের প্রকট দারিদ্র্য-খিন্নতার মধ্যে যে-ছেলেমেয়েরা আস্বাস্থ্যে-বিরক্তিতে বড়ো হয়ে উঠেছে, পূর্ববঙ্গের অভিজাত রূপকাহিনী তাদের কাছে উপন্যাসকথার পরিচয় নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। যেখানে স্মৃতি নেই, সেখানে জড়তাও নেই। কলোনির শিক্ত-সম্প্রদায় তাই সমতায় মিলতে পেরেছে, বিত্তহীনদের অভাবের সমতায় পর-স্পরের কাছাকাছি চলে এসেছে। খাদ্যে-পোশাকে-শিক্ষার সুযোগে-অবস্থানের মালিন্যে একেবারে কাছাকাছি এসে যাওয়া : একদা যাঁরা জমিদার ছিলেন, পৈথিন সদাগর ছিলেন, রাজপুরুষ পরিবারের অঙ্গীভূত ছিলেন, টিটাগড়ে-যাদবপুরে তেলেনি-পাড়ায়-শক্তিগড়ে-রানাঘাটে-কল্যাণীতে তাঁরা সবাই এখন কলোনীয় অকৌলিন্যের সমান অংশভাক।

এটা এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা, কিন্তু দুঃসহ বলেই হয়তো, তার গাভীর্যেরও

পরিসীমা নেই। শরণার্থীশ্রেণীর বহির্গত যত পরিবর্তন ঘটেছে, মানসতার রূপান্তরের প্রকোপ তার চেয়ে বরঞ্চ উদ্দামতর হবেই। প্রায়ই অনুশোচনা হয় আমার, বাংলাদেশের এই মস্ত সামাজিক উপপ্লব নিয়ে তেমন-কোনো মহৎ উপন্যাস লেখা হল না, হৃৎপিণ্ড দীর্ণ ক'রে বেরিয়ে এল না কোনো উথাল-পাথাল মহাকাব্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার' আজ থেকে চল্লিশ-বছর আগেকার পটভূমিতে একটি বিশেষ জরাজীর্ণ অবক্ষয়ের মর্মকথা বিবৃত করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে যে প্রলয় ঝড় বয়ে গেছে, তার কাহিনীর দ্যোতনা আরো অনেক বেশি ব্যাপক, অনেক বেশি ইতিহাসমুখর। এবং এই ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে আত্মঘাতমত্ততার আভাস মাত্র নেই। যেখানে স্মৃতি নেই, অবমাননার পরিসরও শূন্য সেখানে: বাংলা-দেশের উদ্বাস্তু সন্তানেরা অতএব আত্মগ্লানি থেকে ভুগছে না, নিজেদের পরিকীর্ণ খিন্নতা অভ্যস্ততার সঙ্গেই গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাই বলে বর্তমান অবস্থাকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করবার প্রবৃত্তি নেই তাদের। এই প্রবৃত্তি-না-থাকাটাই আসলে স্বাভাবিক: থমথমে হিংসা, পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ, রক্তাক্ত হানাহানির অভাব ঘটলেই কেমন-কেমন ঠেকতো।

অন্ত যা ক্রান্তি সাধিত হয়েছে তা বৃত্তির লোকায়ত্তে। অর্থনৈতিক দুর্দশার চাপে একদা-ভদ্রলোকের ছেলেরা কারখানায় ঢুকে মুসলমান-নমঃশূদ্র-হাড়ি-বাগ্দীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গতর খাটছে, সংগঠন করছে, মিছিলে সোচ্চার হচ্ছে, সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে করাস-পিয়ন-চাপরাশি ইত্যাদি কাজে বামুন-কায়েতের ছড়াছড়ি, যেমন অন্তপক্ষে বড়োসাহেব-বড়োবাবুদের মধ্যে প্রচুর 'ছোটোলোক' শ্রেণীর ভিড়। ট্রাম-বাস কণ্ডাক্টর-ড্রাইভারদের লিস্টি দেখুন, রেলোয়ের ফায়ারম্যান-পয়েন্টসম্যানের লিস্টিও, কিংবা পুলিশের জমাদার-কনস্টেবলের তালিকাও। পেটের তাগিদে শ্রেণীভেদ-বর্ণভেদ একাকার হয়ে যাচ্ছে: রেস্তরাঁ-চায়ের দোকানের ছোকরাগুলোর পরিচয় নিতে গেলেও একই বিস্ময়; হয়তো আবদুল্লা রসুলের সঙ্গে গলাগলি হয়ে কাজ করছে মিলন বাঁড়ুয্যে, তাদের সঙ্গে গভীরতম দোস্তি যে-ছেলেটির তার নাম শুনতে পাবেন বাগেশ্বর ডোম। বড়োলোকরা নামছে, ছোটোলোকরা উঠছে, নতুন-এক ভারসাম্যের দিকে সমাজ এগোচ্ছে। সদ্গোপের ছেলে কবিতা লিখছে, বিশুদ্ধ বস্তিসন্তান ছুতোরের কাজ করছে, তিরিশ বছর আগে এ রকম ঘটনাপরিক্রম কল্পনা করা মুস্কিল ছিল। অবশ্য নানাধরনের অসমতা এখনো আছে: রাস্তায়-মিছিলে-কারখানায়-দপ্তরে-কাজের আঙিনায় যে-নিরঙ্কুশ মিশ্রণ চোখে পড়ে, পারিবারিক ক্ষেত্রে তা সম্ভবত এখনো তেমন ব্যাপক রূপ নেয় নি। কিন্তু প্রবণতায় ভুল নেই, জীবনযাত্রার নানা খুঁটিনাটি যেহেতু সমমাত্রিক হতে চলেছে, ব্যবহারিক বাকি আড়ালগুলিও আস্তে-আস্তে তাই মিলিয়ে যাবে।

ঐতিহ্যের গালে চড় মেরে বাঙালি সমাজ হঠাৎ জঙ্গম হয়ে উঠেছে, এবং, প্রধান পরিণতি যা দেখা দিচ্ছে, গরীবশ্রেণীর আপতিক ওজন ক্রমবর্ধমান। প্রতীপ ঝোঁকও যে এখানে-ওখানে সোচ্চার হচ্ছে না তা নয়। যাঁরা বস্তিতে-কলোনিতে, তাঁদেরই কোনো জ্যাঠতুতো বা মামাতো গোষ্ঠী মওকা পেয়ে অবস্থা ঘুরিয়েছেন, বাড়িতে এয়ার-কণ্ডিশনার লাগিয়েছেন, টেরিকটের নাতিশীতোষ্ণ মসৃণতায় চামড়ার আরাম উপভোগ করছেন, ঘেরাওয়ের আতঙ্কে নীল হয়ে আসছেন, মিহিন মহিলাদের নিয়ে মসৃণ ব্যভিচারের সোনালি স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু, বাংলাদেশে অন্তত এঁরা অতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। দীর্ঘ কুড়ি বছরের কংগ্রেসী শাসনের অযোগ্যতার জন্যই হোক, অথবা দেশস্থ অদক্ষতার জন্যই হোক লাইসেন্স-পারমিটের মরীচিকাময় গোলকধাঁধায় বাঙালিরা বেশিদূর এগোতে পারে নি; এদিকে-ওদিকে দু-একজন সদাগরি চাকরিতে উন্নতি দেখিয়েছে, একজন-দুজন নতুন দিল্লিতে মস্ত রাজপুরুষ হতে পেরেছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মহারাষ্ট্র-পঞ্জাব-তামিল নাড়ু ইত্যাদি নানা অঞ্চলে প্রথমদিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরে প্রতিরক্ষার হুজুগের ফিকিরে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তরা নিজেদের ব্যাপার-স্যাপার যেমন গুছিয়ে নিতে পেরেছেন, বাংলাদেশের উক্ত শ্রেণী তার শতাংশও পারেন কি। এমনকি র‍্যাজেন মুখুজ্যে গোছের প্রাচীন পুরুষরা একযুগ-দুযুগ আগে যতটুকু গুছিয়ে রেখে যেতে পেরেছিলেন, তাঁদের বংশধরেরা তাতে উল্লেখযোগ্য কোনো সংযোজন তো করতেই পারেন নি, অনেক ক্ষেত্রে তা বসে-বসে ধ্বংস করেছেন মাত্র।

সুতরাং নিতান্তই গুটিকয় লোক এখন বাংলাদেশে মধ্যবিত্তসুলভ সচ্ছলতা-প্রাচুর্যের স্বপ্ন দেখে থাকে, লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে—এই ভাবালুতার ঋতু শেষ হয়েছে। ছোটলোকদের স্বপ্ন-দেখার পদ্ধতিটি অন্যরকম, স্বপ্নের সারাৎসারও ভিন্ন হতে বাধ্য। কারখানার মজুর ফোরম্যান হবার মতো অভীপ্সা নিয়ে সময় নষ্ট করে না, দপ্তরের পিয়ন অফিসারের আসনে বসবার কল্পনা নিয়ে নিজেকে প্রসারিত করতে চায় না; তাদের চিন্তার প্রধান উপজীব্য সপ্তাহ-কি-মাসান্তে একটু-বেশি রুজি, কাজের পরিবেশে ঈষৎ-একটু নিয়ন্ত্রণের হ্রস্বতা, একটু ভালো মাথা গুঁজবার জায়গা; এদেরই মধ্যে যারা নিজেদের জীবনের গ্রন্থিগুলির সঙ্গে ইতিহাসের গতিরেখাকে মিলিয়ে নিতে শিখেছে, তারা হয়তো সামান্য একটু আরো এগিয়ে আজ সমাজব্যবস্থার পাল্টানোর কথাই ভাবছে, কিন্তু এই ভাবনার উপসংহারে রাজপুত্তুর-রাজকন্যা জড়ানো বিলাসব্যসন নেই। বাংলাদেশে স্বপ্নও গরিবিয়ানার দিকে ঝুঁকছে।

আবহাওয়া তাই কর্কশ হয়ে উঠছে। চিক্কণতা-পেলবতা ক্রমশ কমে আসছে, অভাবের কথাবার্তাই এখন বেশি; ঘাম-কাদা-ছেঁড়া জুতো-ছেঁড়া জামার প্রসঙ্গ, শালা-বানচোত-গোছের সম্বোধনের মাত্রাবৃদ্ধি, চিরাচরিত উপদেশামৃতকণার

সন্দেহ, বড়োলোকদের সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য-ঘৃণা-ক্রোধ। এরই পাশাপাশি, গ্রাম্যতা-বোধের বর্ধমান প্রসার। লোকের ভিড়, স্থানসংকুলান হয় না বাঙালিদের, পশ্চিম বাংলার সীমিত গণ্ডির মধ্যে চারকোটি লোক কোনোক্রমে গাদাগাদি-ঠাসাঠাসি ক'রে থাকে। শহর-গ্রামের অপরিচয় আস্তে-আস্তে তাই ঘুচছে: জীবিকার জন্য ট্রেন ঝাঁকিয়ে আসতে হয় কলকাতায়, কিন্তু যেহেতু থাকবার ঠাঁই হয় না সেখানে, দিনান্তে ফিরতে হয় পল্লীর উপান্তে। শহর, শহরাঞ্চল, কলোনি, কারখানার ব্যারাক, গ্রাম: একটি বিশেষ ঢালুরেখায় ক্রমশ পরস্পরমণ্ডিত হওয়া। গ্রামচেতনা বেড়ে যাওয়ার অন্যতর কারণ অবশ্য রাজনৈতিক। ভাগচাষী-মজুরচাষী বহুদিন মুখ বুঁজেই পড়েছিল: মাঝে-মাঝে, কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনের ফলে, এখানে-ওখানে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়েছে, কখনো নিষ্পেষণের ফলে, কখনো নেতাপর্যায়ের লোকেদের সুবিধাবাদের ফলে, তা অচিরে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু ইদানীং প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। মাথাপিছু ভোট, কিছু-কিছু প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, কিছু-কিছু সংহত আন্দোলন, সব মিলিয়ে পল্লী অঞ্চলের হাভাতেরা নিজেদের মধ্যে একটি অন্য শক্তি আবিষ্কার করতে পারছে। সংগঠন, প্রায় আশোষ নিয়মেই, জোরালো হচ্ছে; দাবি প্রবলতর হচ্ছে; দাবির প্রকাশ ক্রমশই রূঢ় থেকে রূঢ়তর। এমনকি যদি যুক্ত ফ্রন্ট ইতিমধ্যে সরকার দখল ক'রে না-বসলেও, অবস্থার এমন মোড় ফিরেছে যে ১৯৫৯ সাল বিধান রায়ের পুলিশ যে-ধরনের অবলীলাক্রমে কৃষকমিছিলের উপর গুলি চালিয়ে নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিল, তার পুনর্বিন্যাস আদপেই আর এখন সম্ভব নয়, তার আগে পুরো বাংলাদেশ জলে-পুড়ে-ধ্বসে যাবে।

যুক্তফ্রন্টের উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গ্রামে-গ্রামে ক্ষমতা-হস্তান্তরের পর্ব উপস্থিত চরমে উঠেছে এতকাল ধরে বড়োলোকদের-অনশাসন-মানা গ্রাম ছোটোলোকদের দখলে চলে যাচ্ছে। এ-ব্যাপারেও অবশ্য বহু মিশ্র লক্ষণ চোখে পড়ছে। এক-ধরনের পটপরিবর্তন ঘটছে, একদল নিঃস্ব হচ্ছে, আরেক দল শূন্য-স্থান পূর্ণ করছে; কিন্তু ঘটনাপরম্পরা এমন যে কোনো নির্দিষ্ট সমাজবিপ্লব বলে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়; বিবিধ আবিলতা প্রবেশ করেছে, কার মনে কী আছে সব সময় বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়, আবর্তের সুযোগ নিয়ে বহু এ-ও-সে সুবিধা গুছিয়ে বসছে। তাছাড়া, বিপ্লব বিখণ্ডিত বস্তু নয়, কোনো-বিশেষ পল্লী ও তার আশেপাশে বিপ্লব সংগঠিত, আপাতত অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা অঙ্গুল চুষুক, তা হবার নয়; শহরে-কারখানায় পালাবদল হল না, একমাত্র গ্রামেই শুধু হল, তা-ও যুক্তিগ্রাহ্য নয়; অধিকন্তু বা বলা চলে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান এমন যে শুধু বাংলাদেশেই ক্রান্তিকাল এসে গেছে, ভারতবর্ষের বাকি ভূখণ্ড আপাতত অন্যভাবে নিয়োজিত, তা-ও দুরূহ প্রস্তাব: যদি না রাজনৈতিক-সামরিক-গঠনতান্ত্রিক নিয়মকলার ভিত্তিমূল উপড়ে না ফেলা যায়,

তাহলে দেশের অন্যান্য অংশকে বাদ দিয়ে স্রেফ বাংলাদেশের পক্ষে বিপ্লবের শোভাযাত্রায় সামিল হওয়া ভীষণ কঠিন হবে।

সুতরাং ক্রান্তির প্রান্তরেখায় আপাতত আমরা দাঁড়িয়ে দুমদাম কিছু পটকা ফাটালেই পরিজাত-ছাওয়া সমাজতন্ত্রের রাজ্যে পৌঁছে যাবো এমন দাবি করা বাতুলতা হবে। গ্রামে-শহরে-কারখানায়-রাস্তায়-বস্তিতে নিশ্চয়ই এক প্রগাঢ় অস্থ আবহ সঞ্চারিত হয়েছে। মধ্যবিত্তদের দীর্ঘ প্রহর বাংলাদেশে শেষ। ঐতিহ্য-গতভাবে যাদের আমরা ছোটোলোক বলে এসেছি, তাঁরা ক্রমে-ক্রমে ক্ষমতার শীর্ষ এবং উপত্যকা দুই-ই দখল করবেন। দখল করার আয়োজন সমাপ্ত, ঘনঘটা ইতিমধ্যে উঠেও গেছে। এই অধ্যায়টি নিস্তরঙ্গ হবার নয় একটি বিশেষ শ্রেণী তাদের বনিয়াদি দখল থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, নতুন আরেক শ্রেণী বেধড়ক যেখানে-পারছে ক্ষমতা দখল ক'রে বসছে, রক্তারক্তি-আর্তনাদ বাদ দিয়ে এত-সব সম্পূর্ণ হবে, তা হতেই পারে না। এই অন্তর্বর্তী সময়ে শান্তি ব্যাহত হবে, উৎপাদন ব্যাহত হবে, দক্ষতা ব্যাহত হবে। অনেকরকম চুরি-চামারি ঘটবে, চতুরালি-হাতসাফাইয়ের বিরাম থাকবে না, ভেকধারী অনেক নারীপুরুষও দেখা দেবেন, মোহিনী-মায়ায় দু'দিন সাধারণ লোকদের ভোলাবেন, কাজ হাসিল হলে কেটে পড়বেন। ঠিক নিরাশ্রয়ে না-হলেও, নিরালম্ব-বায়ুভূত অবস্থার মধ্যেই আপাতত কিছুটা সময় আমাদের অবস্থহেলন।

এরকম এলোমেলো জট-পাকানো অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে-যেতেই একদিন পরিস্রুত স্বচ্ছতার দেখা মেলে। ছোটোলোকদের শক্তি বেড়েছে বলেই সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি আমরা যাচ্ছি, তা অন্তত এখনো কিছুতেই বলা চলে না। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে যখন চোখে পড়ে শ্যামাপুজো-বিশ্বকর্মা পুজোর সমারোহও বাড়ছে, তখন সংখ্যাতত্ত্বকে গাল না-পেড়ে নৃতত্ত্ব নিয়ে ব্যাপৃত হওয়া উচিত। সমাজতন্ত্রের জন্য যাঁরা আন্দোলন করছেন, অর্থ-নৈতিক কাঠামোটা তাঁরা মস্ত নাড়া দিয়ে সফল হয়েছেন, রুজির লড়াইতে খুব বিস্তারিতভাবে চেতনা সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। কিন্তু ফাঁক থেকে গেছে। বাঙালি মানস প্রথাগত সাংস্কৃতিক দায়ভাগ থেকে এখনো মুক্ত হতে পারে নি : যিনি কমিউনিস্ট, তিনিই ফের মাদুলি পরছেন ; যিনি ময়দানের সভায় গলা ফাটিয়ে মৈত্রীর-সৌভ্রাত্রের প্রবচন শোনাচ্ছেন, কলেজে-পড়া-মেয়ে পালিয়ে মুসলমান বিয়ে করছে বলে তাঁর এখনো ক্ষোভ উদ্রেক হতে দেখি। মধ্যবিত্ত মানসতা এখানে-ওখানে টিঁকে আছে বলেই স্বভাবে-আচরণে এধরনের পার-স্পর্যের অভাব, এই ব্যাখ্যাও বোধহয় এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। কতিপয় প্রথা-প্রণালী-ব্যবস্থার মোহ হয়তো চট ক'রে ঘোচবার নয়। ইতিহাসচেতনা, শ্রেণী-চেতনা প্রখর হলেই ঐ মোহ মিলিয়ে যাবে, তা না-ও হতে পারে। এখানেই ভারসাম্যের প্রশ্ন আসে : যতদিন ঐতিহ্যাশ্রিত সংস্কারমোহজড়িত বাধাগুলি

চেতনার বৃহদংশ জুড়ে থাকবে, সামগ্রিক বিপ্লবের ততদিন আশা নেই। রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের দায়-দায়িত্ব এক্ষেত্রে তাই মস্ত ব্যাপক।

তবে সর্বের ভিতর ভূত থাকলে,সমস্যা আরো কঠিন। বাংলাদেশে আজ যে-অবস্থায় এসে পৌছেছে, দেশভাগের পরবর্তী ঘটনাক্রমের অমোঘ নির্দেশেই হয়তো পৌছেছে, কিন্তু কমিউনিস্ট কর্মীদের বাদ দিয়ে ঠিক গেল একুশ-বাইশ বছরের ইতিবৃত্ত লেখা সম্ভব নয়। এবং, এখন থেকে যে-বিশেষ গতিক্রম কল্পনায় ছক কাটা চলে, সেই রাস্তা ধরে এগোবার কালেও কমিউনিস্টরাই দিগ্‌নির্দেশ করবেন, এটা প্রায় ধরে নেওয়াই চলে। কিন্তু এখন থেকে নেতৃত্ব দেবেন কারা? আন্দোলনে যুক্ত জনতার চেহারা বদলে যাচ্ছে, একদা যা মধ্যবিত্ত ভিড় ছিল, এখন সেখানে ছোটোলোকদের প্রকট উপস্থিতি। অথচ, যুক্তফ্রন্টের প্রধান পুরুষদের দিকেই তাকিয়ে দেখুন, নেতাদের কোনোই গোত্রান্তর চোখে পড়ে না। অথচ, এখন থেকে যদি নিম্নশ্রেণীর ভিড়ই আন্দোলনে উত্তমর্ণ, তবে নায়করাও ভিন্ন হতে বাধ্য : মধ্যবিত্ত সংস্কার দিয়ে ছোটোলোকদের গতির আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। আপাতত কিছুদিন এই দ্বন্দ্ব উপলক্ষ করেই বাংলাদেশে একটা সংকট চলবে : গতকাল যাঁরা প্রগতিশীল ছিলেন, তাঁরা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন ; ছোটোলোকদের স্তর থেকেই নেতৃত্ব মাথা তুলবে। রাতারাতি এই অন্তর্বিপ্লব সংসাধিত হবে না ; অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে। কিন্তু এই অপেক্ষা বাদ দিয়েও কোনো উপায় নেই। অনেক নোংরামি, নির্মমতা, চোরা-গোপ্তা আক্রমণ, এই অপেক্ষার ইতিহাসে জড়িয়ে থাকবে। বাংলাদেশের পলিমাটিতে সম্ভ্রান্ততার বীজ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর আগে পাওয়া দুষ্কর : আবহমান কাল শূদ্রের দেশ ছিল এটা ; সেই নিকষ শূদ্রত্বেই বাংলাদেশ তাহলে ফিরে যাবে।

কিন্তু শূদ্রত্ব মানেই অবৈকল্য নয়। মধ্যবিত্তের সংস্কার বিত্তহীনদের উপরেও বর্তায়। তাছাড়া, শ্রেণীচেতনা অপরিস্ফুট থাকলে নানা ঝুটঝামেলা জায়গা জুড়ে বসে। কেউ-কেউ হয়তো এমন হিশেবও দাখিল করবেন, বাংলাদেশের ছোটোলোকদের মধ্যে যত অর্থপ্রসঙ্গরহিত অপপ্রথা-অপবিশ্বাসের ছড়াছড়ি, মধ্যবিত্তদের মধ্যে তার শতাংশও না।

এ-সব সংশয় স্বীকার ক'রে নেওয়া ভালো। বড়োলোকদের দিন গেছে, অভিজাত হোটেলের ব্যাংকেট-ঘরে কি ঘোড়দৌড়ের মাঠে যত নর্তনকুর্দনই হোক না কেন, সমস্তই পরিশিষ্ট কাহিনী। এমন কি মধ্যবিত্তদের যে-অধ্যায় বাংলাদেশে ১৯০৫ সালে শুরু হয়েছিল, তাও প্রায় পরিণতির মুখে : ঝিকিমিকি ক'রে বড়ো জোর আর দশ-পনেরো বছর মধ্যবিত্ত উজ্জ্বল্য আলোকিত থাকবে, তারপর নিশ্চিহ্ন নিভে যাবে, শূদ্রযুগে প্রবেশ করব আমরা। অন্তর্বর্তী বছরগুলি আবিলতায় ভরা থাকতে বাধ্য। একটি শ্রেণী ক্ষমতাবিচ্যুত হচ্ছে,

আরেকটি শ্রেণী উপরে উঠে আসছে : কারো সন্ধ্যাই কারো প্রভাতকে আশীর্বাদ জানাবে না, কারো পূরবীই কারো বিভাসকে সম্ভাষণ করবে না। গান্ধিজির শতবার্ষিকী বৎসরে কথাটা বলতে ভালো শোনায় না, কিন্তু হৃদয়পরিবর্তন তত্ত্বটি যদি না স্বপ্রময় ভাবালুতা বলে পাশে সরিয়ে রাখা যায়, তাহলে বলতে হয় নির্ভেজাল বুজরুকি। শ্রেণীসংঘর্ষের ঠিক মাহেন্দ্রমুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি বলেই, আপাতত বাংলাদেশ জুড়ে এত নৈরাজ্যলক্ষণ শক্তিতে-শক্তিতে সম্মুখসমর, গোধূলিমুহূর্তে মনে হয় পৃথিবী যেন মাধ্যাকর্ষণহীন হয়ে ইতস্তত ছুটোছুটি করছে, নয় তো বিশৃঙ্খল বিষাদে থমকে দাঁড়ানো। ন যযৌ ন তস্থৌ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা আরো সকাতর : বুদ্ধির বিচারে তার আবেগ নিম্নগামী, স্বার্থের সংকেতে তা ঊর্ধ্বগামী, অতএব উভয়োল দ্বন্দ্বের যন্ত্রণাভোগ থেকে মুক্তি নেই।

১৯৬৯ সালের পশ্চিম বাংলা, শাদামাঠা বিচারে মনে হয়, এই অবস্থানে স্তম্ভিত। খবরকাগজ যাঁদের দখলে তাঁরা সর্বনাশের ক্রম অগ্রসরমান ভাবমূর্তি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, আত্মরক্ষার তাগিদে এরকম দিনের-পর-দিন ধরে তাঁদের প্রলয়-বিঘোষণা। নিজের নাক কেটে যদিই বা পরের যাত্রাভঙ্গের সম্ভাবনা, সুতরাং রবীন্দ্র সরোবরপ্রতিম কলঙ্ককাহিনী বুনন। কিন্তু সংকটের লক্ষণগুলি আরো নানা বিভঙ্গে পরিব্যাপ্ত। যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ কলহকোলাহল, পল্লীতে-পল্লীতে দামাল রক্তবন্যা, কারখানায় হিংস্র ইন্মত্ততা, ডালহৌসীতে বিস্ফোটিত উদ্ধতি, শিক্ষায়তনে অহরহ হামলা-হাঙ্গামা, খেলার মাঠে, বাসের ভিড়ে সান্দ্রান্তম সূত্র ধরে চরম পরিস্থিতির উদ্ভব, সমাজের সর্বত্র নিয়ম-নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পিত অবাধ্যতা : সবকিছুই ক্রান্তিমুহূর্তের নিহিত অস্থিরতাকে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করছে। সময় অস্থির, মীমাংসা অনিশ্চিত, তাই এত তত্ত্বের আরক্ততা, সকলের মুখেই একই ভাষণ : আমার-পথ-নির্ভুল-তোমার-পথে-মৃত্যু, আমার-ব্যাখ্যা-আর্ষ-তোমার-ব্যাখ্যা-মিথ্যা। অহম্ নিয়ে, অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি, সংকট একেবারে তুঙ্গে, তাই একদিকে অন্ধ বিশ্বাস, অন্যদিকে নিশ্ছিদ্র ঘৃণা। বোঝা-পড়ার ঋতু শেষ হয়ে এসেছে, একটু ছেড়ে, একটু দু'পা এগিয়ে গিয়ে প্রতি-দ্বন্দ্বীর সঙ্গে সন্ধি এখন থেকে অসম্ভব প্রস্তাব। বাংলাদেশ ক্রান্তির কন্দরে ঢুকে পড়েছে : এখন থেকে সুতরাং শুধুই যুদ্ধ।

এই-ই তাহলে ১৯৬৯ সালের, এবং আগামী বেশ কয়েক বছরের, বাংলাদেশ, যতদিন পর্যন্ত না অপর পক্ষ নিঃশেষ হয়ে যায়, অথবা পরাজিত বিনয়ে আত্ম-সমর্পণান্তে নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করে। প্রত্যহ হত্যা, প্রত্যহ ষড়যন্ত্র, প্রত্যহ ঘেরাও-আস্ফালন-আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ। সমাজের পুরনো ছোটোলোকেরা আস্তে-আস্তে দেশটাকে দখল ক'রে নিচ্ছে। যা ঘটছে, আগামী কাল ঘটবে, তা এই ক্রান্তির চিৎকার।

অন্ত কতগুলি প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায়। সংকটের সাঁড়াশিতে পিষ্ট হচ্ছি আমরা, অন্ত-এক চেহারা নিয়ে উত্তর-মুহূর্তে পরস্পরকে সম্ভাষণ করব, নীতিনিয়ম আচারকলা সমস্ত-কিছুই বদলে যাবে তখন। কিন্তু ইতিমধ্যে কী হাল হবে বাংলাভাষার, সাহিত্যের, সংগীতকলার, সংস্কৃতির অন্যান্য প্রশাখার? কবিতা কি অন্যরকম হয়ে যাবে তখন? রবীন্দ্রসংগীতের পুরনো ব্যঞ্জনা মিলিয়ে যাবে? বাঙালির বচনে-শব্দচয়নে-ক্রিয়াপ্রয়োগেও ব্যত্যয় ঘটবে?

পূর্বাহ্ণ থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকা ভালো, অনেক-কিছুই অনেক রকম ভাবে বদলাবেই, এই পরিবর্তনকে যাঁরা মূঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে বাধা দিতে যাবেন, ইতিহাসের নিয়মে ছত্রভঙ্গ হবেন তাঁরা। সংগোপন অলিন্দে আশ্রয় নিয়ে যাঁরা কবিতার নাম ক'রে একধরনের সমাজার্থহীন শব্দসর্বস্ব খেলা খেলছেন, কবিতার প্রতীক তাঁদের ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাবে, অলিন্দের প্রকোষ্ঠে তাঁরা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের গানের পুঞ্জিত আনন্দ অব্যাহতই থাকবে, কিন্তু গানের অনুষঙ্গ আমূল বদলে যাবে, ব্যবসাদারদের ভাড়াটে কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে পড়ে গান উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নেবে। বাংলাভাষার প্রকরণে মেঠো হাওয়া লাগবে; বিদেশী ভাষার প্রভাব, নিদেনপক্ষে কিয়ৎক্ষণের জন্য হলেও, কমবে। চিত্রে-নাটকে ঋজুতা আসবে, ন্যাকামির পালা হ্রস্বতর হবে। হঠাৎ যেন আমরা সংস্কৃত-র দুরুচ্চার্য তৎসমতা ছেড়ে পালি-র উপত্যকায় উত্তীর্ণ হব। দেশ যেখানে ছোটোলোক হয়ে যাচ্ছে, দেশের বচন-বিভঙ্গও লোকায়ততর হবে। এই কথা চিন্তা ক'রে যাঁরা এখন থেকেই শোকগ্রস্ত হতে চান হোন: ক্রান্তি বড়ো নিষ্ঠুর নিয়তি।

যে-প্রশ্নের আমি উত্তর খুঁজে পাই না, তা অন্যদের প্রসঙ্গে। বাংলাদেশে যদি ক্রান্তি এতদূর গড়িয়ে যায়, ধাপের-পর-ধাপ-বেয়ে, স্তরের-পর-স্তর-চিরে ইতিহাস এগিয়ে চলে, ভারতবর্ষের অন্যত্র কী প্রতিক্রিয়া হবে তার? নতুন দিল্লির প্রভুপাদরা কি সুবোধ বালকের মতো বাংলার প্রব্রজ্যা নিরীক্ষণই ক'রে যাবেন শুধু, না কি আতঙ্কে ফুঁসে উঠে প্রলয় সংহত করতে এগিয়ে আসবেন? যদি বাইরে থেকে আক্রমণের উদ্যোগ হয়, তা কোন উপায়ে প্রতিহত করা হবে? যদি আমাদের পুরোপুরি ছোটোলোক হয়ে যাওয়ার প্রবণতাকে বাইরের পৃথিবীর লোকেরা আটকে দিতে চায়, আমরা তাহলে কী করব? সংগ্রাম না সমর্পণ? প্রাগৈতিহাসিক যুক্তি যদিও সংগ্রামের কথাই বলবে, সংগ্রামে নিযুক্ত হলে আমাদের ইতিহাসের গতি কোথায় কী অবস্থায় কতদিন আটকা থাকবে, অঙ্ক কষে তা বলা একেবারেই সম্ভব নয়। ঠিক একই রকম অসম্ভব, সীমান্তের ও-প্রান্তে, আর যাঁরা আরো ছ'কোটি বাঙালি আছেন, তাঁদের সঙ্গে কোনো সাযুজ্যে কখনো উপনীত হতে পারব কিনা সে-জিজ্ঞাসার পূর্বমীমাংসা করা।

পিছনে কী ছিল ক্রমশ ভুলে আসছি, সামনের দিকে তাকালে চোখে ঘোর

লাগে, থমথম অবস্থানে আমরা : ক্রান্তি, শ্রেণীস্খলন, দ্বন্দ্বের বিদীর্ণ যন্ত্রণা ১৯৬৯ সালের বাংলাদেশের এরকম উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। যাঁরা ছোটোলোক হতে ভয় পান, পাকে-নোংরামিতে-ইতরামোতে যাঁদের বিবমিষা আসে, তাঁদের বিশেষ আশা নেই। আমার জ্যামিতিতে সব-কটি সম্ভাব্য রেখা সমান তীক্ষ্ণতায় আপাতত স্পষ্ট নয়, কিন্তু মনে হয় তেমন ক্ষতি নেই তাতে, নেতারা দ্বিধাথরো-থর হলেও ইতিহাস এগোবেই, বাইরে থেকে ভ্রূকুটি হলেও ইতিহাস অবিচল, বাংলাদেশের ছোটলোক ব'নে যাওয়া মনে হয় রোধ করা যাবে না।

* দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নদর্শন : বিজ্ঞানবিষয়ক

'সামনেই মাঠের ওপরে গাঁয়ের ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। আমি এইখানে শুয়ে অন্যমনস্কভাবে তাই দেখছিলুম। এমন সময় আকাশে হঠাৎ সেই ভয়ানক শব্দটা শুনলুম – যেন হাজার হাজার স্লেটের ওপরে কারা হাজার হাজার পেন্সিল চালিয়ে যাচ্ছে।...'

উপরের উদ্ধৃতিটি একটি শিশুপাঠ্য বাংলা উপন্যাস থেকে – নাম 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন'। প্রায় চল্লিশ বছর আগে উপন্যাসটি 'মৌচাক' পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে বেরিয়েছিল – লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়। সেদিন অনেক বাঙালি শিশুর সাধের সঙ্গী হয়েছে এ বই। বিশ্বরহস্য সম্পর্কে কোনো পরিণত আগ্রহ জন্মাবার বহু আগেই এ বইয়ের মধ্য দিয়ে মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে তাদের একটা কাল্পনিক পরিচয় ঘটে গিয়েছিল। তার কিছু পরেই এসেছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়', শিশুমনে দুরন্ত বিস্ময় জাগানোর মতো গল্প।

আজ অবশ্য বাঙালির শিশু অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। আজ তারা 'লুনা-অ্যাপলো'-র কাণ্ডকারখানা নিপুণভাবে নিরিখ করে, চলচ্চিত্রে 'স্পেস্-অডিসি'-র মহাকাব্য দেখে। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীসত্যজিৎ রায়ের কল্যাণে (অর্থাৎ ঘনা দা ও প্রোফেসর শঙ্কু-র কল্যাণে), তারা আজ বিজ্ঞানকাহিনীর সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত। তাদের গুরুজনেরাও উৎসাহের সঙ্গে তাদের জন্যে লেখা গল্পগুলি পড়েন, কারণ বাংলা ভাষায় গুরুজনদের জন্যে বিজ্ঞানকাহিনী লিখতে কেউ এখনও কলম ধরেন নি (সেই শুভদিন ত্বরান্বিত হোক)।

এ ধরনের কাহিনীগুলির একটি বিশিষ্ট স্বাদ আছে। সে স্বাদ অবশ্যই চমৎকারিত্বের, কিন্তু সে চমৎকারিত্বও যেন আবার একটু বিশেষ শ্রেণীর, গোয়েন্দা-গল্পের মতো নয়। গোয়েন্দাগল্পও চমৎকারী, আমাদের মনকে তাতেও খুব টানে—কিন্তু এভাবে নয়। সেখানে ঘটনার বিন্যাসে, যুক্তির প্রয়োগে খুব একটা লোভনীয় সংহতি আছে এবং সেদিক থেকে গোয়েন্দাকাহিনীগুলি অবশ্যই আধুনিক এবং প্রকৃতিনিষ্ঠ। কিন্তু আমরা যে চমৎকারিত্বের কথা এখানে বলছি তা প্রকৃতিকে আরও কিছুদূর ছাড়িয়ে। তা একই সঙ্গে কল্পলোকের মুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যনিষ্ঠার সমন্বয় করতে পেরেছে। এখানেই তার নূতনত্ব এবং সার্থকতা ; এবং উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা, অবালবৃদ্ধের কাছে।

বলাই বাহুল্য, আজকাল এ জাতীয় রচনার নূতনত্ব নিয়ে বেশ নাড়াচাড়া হচ্ছে। এর নতুন নামকরণও হয়েছে—'সায়েন্সফিক্‌শন'—বিজ্ঞানোপাখ্যান—সংক্ষেপে SF। এর জন্ম বেশ কিছুকাল আগে হয়ে থাকলেও খুব হালেই এর বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে। শুধুমাত্র এই জাতীয় রচনাকে কেন্দ্র ক'রে পত্রপত্রিকা দোকান-সমিতি অধিবেশন সারা দুনিয়ায় আজ অনেক গজিয়ে উঠেছে। আমেরিকার 'স্পেকট্রাম্' পত্রিকা বা রাশিয়ার 'মির্' প্রকাশসংস্থা প্রধানত SF পাঠকদের জন্যেই।

বিলিভিঁ গোয়েন্দা কাহিনীর পুরোদস্তুর পুরোধা যেমন স্যর আর্থার কোনান্ ডয়েল, তেমনি আজকের সায়েন্সফিক্‌শনের পিছনে মনে পড়বে অন্তত দুটি লেখকের নাম—জুল্ ভের্ন এবং এচ্. জি. ওয়েল্‌স। সেদিনে দেখা এঁদের অনেক বিজ্ঞানস্বপ্নই আজ রক্তমাংসে পরিণত হয়েছে এবং হতে চলেছে। এ প্রবন্ধ বেরোবার আগেই ওয়েল্‌স-এর 'চাঁদে প্রথম মানুষ' (দি ফার্স্ট মেন ইন্ দি মুন্', ১৯০১)-এর রোমাঞ্চকে পিছনে ফেলে যাবেন রুশ-মার্কিন গ্রহযানীরা। এবং সেদিনই ওয়েল্‌স-এরও গল্পের কদর কমে আসবে। এ ধরনের গল্পের বৈশিষ্ট্যই এই। এরা সবসময়ই একটি আপেক্ষিক ইঙ্গিত মেলে চলে—কায়ার সামনে ছায়াটির মতন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর এদের একান্ত নির্ভর, অথচ এরা তার অনুগামী নয়। ইতিহাসের নাগাল থেকে সবসময়ই এরা কিছু এগিয়ে চলে। তাই ওয়েল্‌স-এর 'চাঁদে প্রথম মানুষ'-এর আবেদন আজ ক্ষীণ হলেও তাঁর 'সময়ের যন্ত্র' বা 'অদৃশ্য মানুষ' এখনও অনেকদিন পাঠকের মনে শিহরন জাগাবে, কারণ আজকের বিজ্ঞান এখনও এ ব্যাপারে পিছিয়ে আছে। ঠিক তেমনি কথাই বলা যায় জুল্ ভের্ন-এর বেলায়। বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ অভিযান বা আশি দিনে বিশ্বপরিক্রমার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, আজ এই সুপার্সনিক জেট্‌বিমানের যুগে তাকে ছ্যাকরাগাড়ির মতোই মন্থর মনে হতে পারে ; তাঁর গল্পের ক্যাপ্টেন নিমো যে সাবমেরিন যন্ত্র গড়েছিলেন তাকে আজকের বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী কৌশল অনেক পিছনে ফেলে এসেছে ; কিন্তু তাই বলে তাঁর ভূকেন্দ্রযাত্রার যে কল্পনা, তার আকর্ষণের আজও কোনো কমতি ঘটে নি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে SF সাহিত্যের জনপ্রিয়তার মাপকাঠি অন্তত কিছু পরিমাণে ইতিহাসনির্ভর, তার আবেদন সর্বদাই বাইরের ঘটনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। অর্থাৎ ভালো SF রচনা সুলিখিত কিনা এ বিচারের চেয়েও জরুরি হল তা কতটা চিত্তাকর্ষক, আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তা কতটা অভিনব, সে কথা জানা। শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্য হলে হবে না, আবার ঝিছক আজগুবি গল্প হলেও চলবে না—একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য এখানে কাজ করছে। এবং সেই সূক্ষ্মতাই এ জাতীয় গল্পের উৎকর্ষের প্রধান মাপকাঠি। বাস্তবের মধ্যে অবাস্তব, আবার স্বপ্নের মধ্যে সত্যকে খোঁজাই সায়েন্সফিক্শনের ধর্ম। স্বর্গ থেকে অজানার আলো চুরি ক'রে এনে পৃথিবীর মানুষকে যে দিতে পেরেছিল, সেই প্রমিথিয়ুস্-ই এর সার্থক প্রতীক।

বিশ্লেষণ করতে বসলে দেখা যায় যে SF লেখকদের কল্পনা আজ দুটি মেরুর মধ্যে আন্দোলিত। একটি তার বহির্মুখী, অভিনব, সেখানে বিজ্ঞানের অনাবিষ্কৃত, কিন্তু প্রত্যাশিত, দিকটি নিয়েই খেলা। বিশেষত স্থানকালের রহস্য নিয়ে। ৩০০০ খ্রীস্টাব্দের পৃথিবী, বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ছবি—সেখানে আজ খুবই সুলভ। তেমনিই সুলভ অন্য গ্রহে অভিযান ও বসবাসের কল্পনা। 'স্পুটনিক' বা 'অ্যাপলো'-র গতিকে অনেক পিছনে ফেলে এসব গল্পের নায়কেরা নতুন নতুন গ্রহে উপনিবেশ গড়ছেন, কিংবা মঙ্গলগ্রহের যাদুঘরের শিল্পসংগ্রহ থেকে ছবি এনে-পৃথিবীতে তাঁর চোরাই কারবার চালাচ্ছেন। নু ইয়র্ক 'স্পেস্পোর্ট' থেকে তাঁদের গ্রহবিমান ছাড়ে, তাঁরা ব্যবহার করেন 'প্ল্যাস্টিল্'-এর (প্ল্যাস্টিক + স্টীল্) আসবাব। নিখিল গ্রহের একটি অসাধারণ ভাষার কথাও এসব গল্পে কল্পনা করা হয়েছে, সে ভাষার নাম 'প্রাইম্ গ্যালাক্টিক'। রুশ লেখক ইভান্ এফ্রেমভ্-এর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'অ্যানড্রমিডা' (১৯৫৭)-তে শুধু আন্তর্জাতিক ঐক্যের কথাই বলা হয় নি, গ্রহান্তরের অধিবাসীদের মধ্যে আলাপচারীর কল্পনাও করা হয়েছে। এবং কী ক'রে তা সম্ভব হল তার ব্যাখ্যাছলে ভেদা কং নামে এক ইতিহাসবিদ্ মহিলা সেখানে বলছেন : 'কাম্ আমাৎ নামে জনৈক ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রথম টেলিভিশনের সাহায্যে উপগ্রহগুলি থেকে পরীক্ষা চালান এবং অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বহু বছর ধরে সবরকম তরঙ্গদৈর্ঘ্য সংযোগের চেষ্টা করেন। অবশেষে তিনি ৬১ সিগ্নি নামে চিরপরিচিত বাইনারি তারকার গ্রহমণ্ডল থেকে প্রেরিত একটি সংকেত পান।'

মার্কিন লেখক ফ্রেডরিক্ ব্রাউন্-এর 'এরীনা' বলে একটি গল্প আছে, তাতে বুধগ্রহে একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে উগ্র উত্তাপ আর নীল বালুর রাশি—আর দুই যোদ্ধার মাঝখানে এমনই একটি অদৃশ্য দেওয়াল, যার মধ্য দিয়ে শুধু অচেতন বস্তুই ওপারে যেতে পারে, চেতনার পক্ষে যা অভেদ্য। জীব-বিজ্ঞানের নানা অভিনবত্বও এসব গল্পে মেলে। যেমন মার্কিন লেখক ক্লিফোর্ড

সিমাক্ তাঁর একটি গল্পে শুধু নারীপুরুষ নয়, সাত রকম যৌন শ্রেণীবিভাগের কল্পনা করেছেন।

দ্বিতীয় জাতের গল্প অন্য মেরুতে নিবদ্ধ। তার কেন্দ্রে আছে মানুষ ও যন্ত্রের প্রতিযোগিতার আভাস। একদিকে আজ যন্ত্রের অভাবনীয় নৈপুণ্য এবং উৎকর্ষ, অন্যদিকে মানুষের মনের সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য, যন্ত্রের পক্ষে এখনও যা অননুকরণীয়, এবং যন্ত্রের চেয়ে যা আমাদের অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। মনে হয় সেদিক থেকে যেন যন্ত্র কোনোদিনই মানুষের স্থান নিতে পারবে না, কারণ যন্ত্রের মন নেই, মানুষের মন আছে, আদর্শ আছে। আজ নানা ধরনের যান্ত্রিক মাধ্যম বা 'ম্যাস্‌মীডিয়া'-র প্রভাবে এই দ্বন্দ্বটি খুব জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। হান্স আণ্ডার্সেন্-এর বুলবুলের গল্পে বা অল্ডাস্ হাক্সলি-র 'ব্রেভ্ নিউ ওঅর্ল্ড' (১৯৩১) উপন্যাসে অবশ্য এই আভাসই ছিল—দ্বিতীয়টিতে বেশ একটু কটাক্ষও ছিল এচ্. জি. ওয়েল্স প্রমুখের বৈজ্ঞানিক আশাবাদের প্রতি। শুধু যন্ত্র দিয়ে কোনোদিন মানুষের সিদ্ধি-লাভ হতে পারে কিনা, সেদিনও এই ছিল সমস্যা। ১৯২৩-এ চেক্ লেখক কারেল্ চাপেক্‌ও এ-বিষয়ে ব্যঙ্গনাট্য লেখেন 'রসামস্ য়ুনিভার্সাল রোবট্স'—যার থেকে রোবট্ শব্দটি চালু করা হয়েছে যন্ত্রমানব অর্থে।

আজকের বিজ্ঞানকাহিনীর অনেকগুলিতে এই প্রসঙ্গেরই বিস্তার—সমৃদ্ধতর আঙ্গিকের সাহায্যে। মার্কিন লেখক এবং জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক আইজাক্ আসিমভ্ কিছুকাল আগে লিখেছেন 'আই, রোবট্' গল্প-(১৯৫০)। তাতে দেখানো হয়েছে ২০৫৭ খ্রীস্টাব্দের পৃথিবীকে রোবটেরাই চালাবে, মানুষের অধীন হয়ে। রোবট্‌নীতি বা 'রোবটিক্স'-এর মূল কথা হল, মানুষের স্বার্থে আঘাত না ক'রে পৃথিবীকে চালানো এবং নিজেদের প্রয়োজন মোটানো। তা ছাড়া আছে মার্কিন লেখক রে ব্র্যাড্‌বেরি-র বিখ্যাত উপন্যাস 'ফারেন্‌হাইট ৪৫১°' (১৯৬৭)—অর্থাৎ যে উত্তাপে কাগজ পুড়ে যায়। এ উপন্যাসে ভাবীযুগের এমন একটি ছবি আঁকা হয়েছে, যেখানে কাগজপত্র দেখলেই পুড়িয়ে ফেলা হবে, কারণ সে পৃথিবীতে সভ্যতা-সংস্কৃতির ধার কেউ ধারে না। সেই যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই এ-গল্পের নায়ক আত্মবলি দেয়—যান্ত্রিক ব্লাডহাউণ্ডের মুখে।

ইংরেজ, মার্কিন এবং রুশ তিনজন লেখকের থেকে আরও তিনটি উদাহরণ দিচ্ছি, যাতে এই দ্বন্দ্বকেই মূল বিষয় হিসেবে নেওয়া হয়েছে। প্রথম গল্পটি ইংরেজ লেখক ব্রায়ান অলডিস্-এর 'জেস্‌চার অভ্ ফেয়ারওয়েল্'—বিদায়ের ইংগিত। এর পটভূমি হল রিজিম্ নামে একটি গ্রহ—কোনও দূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর একটি উপনিবেশ। গল্পের নায়ক লেস্টার নিক্সন এ গ্রহের শাসনকর্তা। সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে সে একে বাসযোগ্য ক'রে তুলতে এবং এর আদিবাসী-দের বশে আনতে। তার গভীর আশংকা কিন্তু, যে বিদ্রোহী রিজিম্‌বাসীরা হার

মানবার আগে তাদের গ্রহকে ধ্বংস ক'রে দেবে, যেমন অন্ত কোনো কোনো গ্রহে ঘটেছে। এই নিয়ে তাদের দ্বন্দ্ব। অবশেষে এক চরম সংকটের দিনে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী এসে দাঁড়ায় রিজিম্-এর প্রাচীন মন্দিরের সামনে—সেখান থেকে বাণী এসে পৌঁছোয়—রিজিম্ এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে, যদি না কেউ একে ভালোবেসে আত্মাহুতি দেয়। লেস্টার তখনই তার প্রাণ দিয়ে দেয়।

বেশ দেখা যাচ্ছে এর পটভূমিটুকুর মধ্যেই যা কিছু বৈজ্ঞানিক অভিনবত্ব, কেন্দ্রীয় পরিস্থিতিটি আসলে একান্ত মানবিক—যে কোনও গ্রীক ট্র্যাজেডির মতোই, অদম্য মানবাত্মার প্রশস্তি। মনে করা হচ্ছে কোনো যন্ত্রই বীরোচিত আত্মত্যাগের তৃপ্তি আমাদের দিতে পারবে না।

দ্বিতীয় উদাহরণটি মার্কিন লেখক ফ্রেড্রিক পোল্-এর উপন্যাস 'ড্রাংকার্ডস ওঅক্'—হাতাল্লের রাস্তা। এর পটভূমি অদূর ভাবীকালের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে সমস্ত রকম যান্ত্রিক সচ্ছলতার মধ্যেও হঠাৎ এক-একসময় আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়। প্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা বক্তৃতা দিতে দিতে নিজেদের অজান্তেই নিজের গলায় ছুরি বিঁধিয়ে দিতে উদ্যত হন, এমন কি প্রেম বা সংসারও তাঁদের সব সময় নিরস্ত করতে পারে না। আশ্চর্য এই, যে এ ব্যাপারে যাকে যত বেশি শক্ত সংযত মনে হয়, সে-ই তত বেশি রাহুগ্রস্ত। মানুষের অবচেতন্যর দুর্জ্ঞেয় দিকটি এখানে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা ক'রে খুব স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরা হয়েছে। যন্ত্রের তো অবচেতন রহস্য নেই, মানুষের মন কিন্তু চিররহস্যময়।

এই বৈষম্যকে কৌতুকপ্রদও ক'রে তুলেছেন কোনও কোনও লেখক, যেমন ইভ্জিনি ভার্শাভ্স্কি তাঁর 'গভীর রাতের লুঠ' (ভ্লাদিমির তাল্মি-কৃত ইঙ্গানুবাদ 'এ রেইড টেক্স প্লেস্ অ্যাট্ মিডনাইট') গল্পে। এই মজার গল্পটিতে কল্পনা করা হয়েছে আধুনিক কম্পিউটর যন্ত্রের সাহায্যে গাণিতিক পদ্ধতিতে একটি ডাকাতি ধরবার চেষ্টার। মুশ্কিলের কথা হচ্ছে যে নামজাদা ডাকাতের আড্ডাতেও অনুরূপ একটি যন্ত্র বসানো হয়েছে। অতঃপর পুলিশ এবং ডাকাত, দুদলে শুরু হয়ে যায় বিজ্ঞানসম্মত ফন্দির লড়াই, প্রায় দাবাখেলার মতন। উভয়ই উভয়কে ব্যর্থ করতে বদ্ধপরিকর। গ্র্যান্ যখন বেশ জমে উঠেছে হঠাৎ তখন কোথা থেকে এক তৃতীয় শ্রেণীর ছিঁচকে ডাকাত মরচে-ধরা এক পিস্তল নিয়ে এসে ব্যাঙ্কটি লুঠ ক'রে নিয়ে যায় কথামালার সেই শেয়ালের মতন। এখানেও মানুষের ফিকিরের কাছে শেষপর্যন্ত যান্ত্রিক বুদ্ধির পরাজয়।

এই উদাহরণগুলি থেকে আর একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে। সেটা হল এই যে বিজ্ঞাননির্ভর কাহিনীগুলি অনেক পরিমাণে রাজনীতির অযথা সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। পুবপশ্চিম এবং বামদক্ষিণ—সবদিকেই SF-এর আজ সমান কদর। আমেরিকায় যেমন জনপ্রিয় রে ব্র্যাড্বেরি, আইজাক্ আসিমভ্ বা ফ্রেড পোল্, ইংলণ্ডে যেমন ব্রায়ান অলডিস্, ডেভিড লিওসে বা বৈজ্ঞানিক ফ্রেড হয়েল্,

রাশিয়াতেও তেমনি জনপ্রিয় আলেকজান্দর বেল্যায়েভ্ বা ইভান এফ্রেমভ্, ফ্রান্সে পিয়ের বুল্ বা মার্সেল্ এমে, ইতালিতে লিনো আল্দানি, জর্মানিতে ফ্রীড্রিখ্ ড্যুরেন্মাট্, পোলাণ্ডে স্তানিস্লাও লেম্, জাপানে কোবো আবে (এঁর 'চতুর্থ তুষারযুগ' উপন্যাস আজ রাশিয়াতে খুব সমাদৃত)। এঁদের রচনায় আবেদন তথাকথিত লৌহযবনিকার বাধা মানে না। সম্প্রতি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'SF সমিতি' জনপ্রিয়তা বিষয়ে পাঠকদের মতামত চেয়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছে যে রুশ পাঠকদের কাছে রুশ লেখক ইভান এফ্রেমভ্ যতখানি প্রিয়, ঠিক ততখানিই প্রিয় মার্কিন রে ব্র্যাড্বেরি বা পোলিশ লেখক স্তানিস্লাও লেম্। বিজ্ঞানকাহিনীর ভবিষ্যৎ এবং মানুষের সুরুচি সম্পর্কে এটা নিশ্চয় আশার কথা।

বিজ্ঞাননির্ভর সাহিত্য এখনও ক্লাসিকের পর্যায়ে যেতে পারে নি। অনেকের মতে কোনোদিন পারবেও না, কারণ এর পিছনে কোনও শাশ্বত সত্যের প্রেরণা নেই, নেই কোনও মহৎ আইডিয়া। দ্বিতীয়ত এ ধরনের গল্প লেখা বেশ শক্ত। এর লেখককে হতে হবে একাধারে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সমান জহুরি, দুই সংস্কৃতির নিপুণ সব্যসাচী। আজ পর্যন্ত কোথায় সাহিত্যের সেই দা ভিঞ্চি? বাংলাদেশে তো বটেই, সারা পৃথিবীতেই তেমন লেখকের সংখ্যা আজও খুব বেশি নয়। সুদক্ষ এবং চতুর লেখকের অভাব অবশ্য নেই। হয়তো তাঁদের মধ্যে থেকেই আবার দেখা দেবেন নতুন কোনও এচ্. জি. ওয়েল্স বা জুল্ ভের্ন। একমাত্র ভবিষ্যৎই এর সঠিক উত্তর দিতে পারে। ভবিষ্যৎই হল সকল SF লেখকের আরাধ্য দেবতা।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

গ্রাম্‌চি ও বুদ্ধিজীবী

জীবনযাপন করতে হলে মানুষমাত্রকেই তার দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে চলতে হয়, বিচারবোধ নিয়োগ করতে হয়। প্রত্যেক মানুষেরই জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আপন আপন ধারণা আছে, আপন আপন নীতিবোধ আছে। কারও হয়ত বেশি, কারো কম, কারো বুদ্ধি হয়ত খুব স্পষ্ট, কারও নয়—কারও প্রখর, কারও ধার করা। কিন্তু এই কমবেশি, স্পষ্ট-অস্পষ্ট, প্রখর-ভোঁতা বুদ্ধির বিচারে মানুষকে বুদ্ধিজীবী এবং বুদ্ধিজীবী নয়—এইভাবে ভাগ করা বোধহয় সম্ভব নয়। হয়ত উচিতও নয়। কারো স্ত্রী সেলাই করতে জানেন, কিন্তু লোকে তাঁকে দর্জি বলে গণ্য করেন না, রান্না ভালো করেন বলে তিনি রাঁধুনি বলে পরিচিত হন না। সুতরাং বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে চললেই তাঁকে বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য করা চলে না।

তাহলে বুদ্ধিজীবী নির্ণয় কী প্রকারে সম্ভব? আন্তোনিও গ্রামচি (Antonio Gramsci) বুদ্ধিজীবীর অন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সমাজে মানুষ কী কাজ করছেন তার উপরে নির্ভর ক'রে তিনি বুদ্ধিজীবী কি নন।

এই অর্থে শিল্পসংস্থায় ম্যানেজাররা, সরকারি আমলারা বুদ্ধিজীবী। তাঁরা পুঁজিপতিদের স্বার্থে সমাজকে গড়ে তুলছেন। তাঁদের মতো বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ছাড়া, তাঁদের বুদ্ধিবিচারের উপর নির্ভর করতে না পারলে পুঁজিপতিদের সমাজব্যবস্থার গঠন ও বিকাশ অসম্ভব। কিন্তু এঁরা শুধু বিশেষজ্ঞ, আপন আপন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে এঁরা সমাজের অংশগুলো গড়ে তুলছেন। এঁদের চাইতে বৃহত্তর কাজ করছেন রাজনীতিকেরা, যাঁরা সমাজের দিঙ্‌নির্ণয় করছেন। যাঁরা একাধারে বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিক, তাঁরা হলেন নেতা।

এইভাবে, বিশেষজ্ঞ ও নেতা, বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীভেদ করা ছাড়াও আরো একভাবে করা যায়, এবং সেই দ্বিতীয় শ্রেণীভেদের ব্যঞ্জনা আরো ব্যাপক। সেটা হল বুদ্ধিজীবীদের ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী আর কর্মী বুদ্ধিজীবী এই দুই ভাগে ভাগ করা। ম্যানেজার-আমলারা কর্মী বুদ্ধিজীবী। সমাজের বিদ্বান লোকেরা, সাহিত্যিক শিল্পীরা ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী। সমাজের সাময়িক চাঞ্চল্য, ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীদের ধারণা, তাঁদের স্পর্শ করে না। এঁরা সাময়িক বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে বিচরণ করেন বলে নিজেদের বিবেচনা করেন। রাজনীতি-অর্থনীতি এঁদের স্পর্শ করে না, এঁরা দেশের ইতিহাসের মূল ধারায় সাঁতার কাটেন বলে গর্ববোধ করেন। সমাজের রাজনীতিকেরা অর্থনীতিকেরা কী ভাবেন না-ভাবেন তা নিয়ে এঁদের চিন্তা নেই, তার কারণ এইসব সাময়িক চিন্তা অতি তুচ্ছ। তাঁরা আছেন চিরন্তনকে নিয়ে। কর্মী বুদ্ধিজীবীদের অবশ্য এই গর্ব নেই, তাঁরা একনিষ্ঠ হয়ে তাঁদের সাময়িক কাজ নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন, চিরন্তনকে নিয়ে মাথা ঘামালে কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে, জমির খাজনা আদায় করা যাবে না।

কর্মী বুদ্ধিজীবীরা অবশ্য প্রত্যক্ষভাবেই সজ্ঞানে গোষ্ঠীর সেবা করেন, কিন্তু ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা কি গোষ্ঠীর স্বার্থের ঊর্ধ্বে? তাঁদের সঙ্গে কি গোষ্ঠীর কোনো সংযোগ নেই? গ্রাম্‌চি ইতিহাস থেকে নজির তুলে দেখিয়েছেন, ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরাও গোষ্ঠীর কাজকে স্বার্থকে এগিয়ে দেবার সাহায্য করতে বাধ্য। ইয়োরোপের ইতিহাসে পাদ্রীদের কাজ তার প্রমাণ। সমাজের শক্তিশালী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দলের অনুকূলে কাজ করতে তাঁরা বারবার বাধ্য হয়েছেন, যদিও সেইসব অর্থনীতিক রাজনীতিকদের সব কাজেই তাঁদের সমর্থন ছিল না। ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে সমাজের শক্তিশালী গোষ্ঠীরা ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আপন স্বার্থ সিদ্ধ ক'রে নিয়েছে। যখন ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা একেবারে অসহযোগ করেছেন, তখন তাঁদের নির্মূল করার চেষ্টা হয়েছে, তাঁদের প্রভাব সঙ্কুচিত করার প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে। অবশ্য সবসময়ে নির্মূল করার প্রয়োজনই হয় নি। কর্মী বুদ্ধিজীবীদের দাপটে ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা, বেশির ভাগ সময়ে নতি স্বীকার ক'রে কর্মী ও ঐতিহ্যবাহীর সম্মিলন ঘটিয়েছেন। বিশেষ ক'রে, সমাজের সেই সব কর্মী বুদ্ধিজীবীরা যদি অগ্রসরমান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে তো এই সম্মিলন আরও সহজেই ঘটে থাকত।

বিপ্লবী সর্বহারাদের পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের এই শ্রেণীভেদ সম্পর্কে উপলব্ধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সমাজের প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর যেমন আপন আপন প্রতিনিধিমূলক বুদ্ধিজীবী আছেন, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো কর্মী বুদ্ধিজীবী, কেউ কেউ ঐতিহ্যবাহী, তেমনি প্রত্যেক শ্রেণীরও আপন আপন বুদ্ধিজীবী আছেন, যাঁদের

প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন্ বুদ্ধিজীবী কোন্ দলের সে বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে ভুল পথে চলার সম্ভাবনা অতীব প্রবল।

গ্রাম্‌চি ইতালির বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীভেদ ক'রে এই বিপদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বহারাদের বারবার হুঁসিয়ার ক'রে গেছেন। ইতালিতে নাগরিক বুদ্ধিজীবী এবং গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। নাগরিক বুদ্ধিজীবীরা সেখানে সাধারণত কর্মী, আর গ্রামীণ বুদ্ধিজীবীরা ঐতিহ্যবাহী। যদিও দক্ষিণ ইতালিতে কিছু কর্মী বুদ্ধিজীবী গ্রামের কৃষক এবং সহরের সরকারের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে দোআঁশলার কাজ করেছেন। এই দোআঁশলা বুদ্ধিজীবীদের নেতৃপদে বরণ ক'রে ইতালির শ্রমিকশ্রেণী আপন বিপদ ডেকে এনেছেন। গ্রাম্‌চি তাঁর সমস্ত জীবন চেষ্টা ক'রে গেছেন কীভাবে সর্বহারাদের মধ্য থেকেই কর্মী ও ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী গড়ে তোলা যায়।

সমাজের ইমারতে দুটি দিক আছে, একটি রাজনৈতিক আর একটি সাংস্কৃতিক। রাজনৈতিক ইমারত গড়ে তোলে সৈন্যবাহিনী, আদালত, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক ইমারত গড়ে তোলে ধর্ম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি। কর্মী বুদ্ধিজীবীরা গড়ে তোলেন এই রাজনৈতিক ইমারত, ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা গড়েন সাংস্কৃতিক ইমারত। এই দুই ইমারতে প্রধান পার্থক্য হল, রাজনৈতিক ইমারত জনসাধারণের সমর্থন আদায় করে গায়ের জোরে, সাংস্কৃতিক ইমারত সমর্থন আদায় করে তাদের স্বেচ্ছাসম্মতিতে।

সমাজের এই দ্বৈত ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত না থাকার ফলে রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে অনেক সময় অনেক মার্কসিস্ট ভুল ধারণা করেন। তাঁরা রাষ্ট্রের শুধু রাজনৈতিক চরিত্রটাই লক্ষ করেন, সাংস্কৃতিক চরিত্র উপেক্ষা করেন। কিন্তু রাষ্ট্র যদি শুধু গায়ের জোরেই জনসাধারণের সমর্থন আদায় করে, তাহলে সেই সমর্থন বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবের সাহায্য নিয়ে রাষ্ট্র জনসাধারণের সমর্থন আদায় করে বলেই সেই সমর্থন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

কর্মী এবং ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীদের দৌলতে সমাজের শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলো জনসাধারণের সমর্থন পায়, ফলে সমাজে তাদের অনুকূলে জীবনযাপন প্রণালী, চিন্তাধারা, দর্শনের বিকাশ ঘটে। এরই পুঞ্জীভূত শক্তি রাষ্ট্রশক্তি। সেইজন্যই সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্তে আনার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে সমাজের এইসব সাংস্কৃতিক ইমারতে আপন প্রভাব বিস্তার করা প্রয়োজন। আপন শ্রেণীর অনুকূলে দার্শনিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক চিন্তার জগৎ তৈরি করতে না পারলে কেবল রাজনৈতিক ইমারত দখল করা নিরর্থক, কেননা তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

শুধু রাজনৈতিক ইমারত দখল করার উপর জোর দিয়ে যেসব মার্কসিস্ট মার্কসের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ক'রে মার্কসবাদকে অর্থনীতিবাদে পরিণত করেছিলেন,

তার বিরোধিতা ক'রে লেনিন সাংস্কৃতিক ইমারতের দিকে সম্যক নজর দিতে বলেছিলেন। লেনিনের এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে বক্তব্যকেই আরো বিশ্লেষণ ক'রে গ্রাম্‌চি মার্কসীয় তত্ত্বকে আরো পরিস্ফুট করেছেন। যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল নীতিই হল এই। রাজনৈতিক ইমারত দখলের পূর্বে সাংস্কৃতিক ইমারত গড়ে তোলা। রাজনৈতিক ইমারত দখলের যুদ্ধ কৌশলে যুদ্ধ। সাংস্কৃতিক ইমারত দখলের যুদ্ধ অবস্থানের যুদ্ধ—এটা আরো ব্যাপক, সমাজের বিশিষ্ট কেন্দ্রগুলো করায়ত্ত করা এর লক্ষ। যেসব দেশে রাজনৈতিক ইমারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ইমারতের সুসামঞ্জস্য ঘটে নি, অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তি জনসাধারণের সম্মতির অপেক্ষা না করেই রাজনৈতিক শক্তির দাপটে চলছে সেখানে কৌশলের যুদ্ধ হয়ত সাফল্যলাভ করবে, কিন্তু যেসব দেশে, যেমন অগ্রসর পশ্চিমী দেশগুলোয় যেখানে রাজনৈতিক ইমারত এবং সাংস্কৃতিক ইমারত সুসংবদ্ধ অবস্থায় গ্রথিত হয়ে আছে সেখানে কৌশলের যুদ্ধ সফল হতে পারে না, সফল হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না, সেখানে দরকার অবস্থানের যুদ্ধ। সেই সুসংবদ্ধ অবস্থায় যেহেতু কৌশলের যুদ্ধ প্রথমেই কার্যকর হবে না, সেইজন্য দরকার যুক্তফ্রন্ট গঠন, যাতে জনসাধারণকে প্রগতিশীল ক'রে সচেতন ক'রে তোলা যায়।

গ্রাম্‌চি ইতালির ইতিহাস আলোচনায় মেকিয়াভেলিকে এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তার কারণ মেকিয়াভেলি রাষ্ট্রের এই রাজনৈতিক সত্তা ও সাংস্কৃতিক সত্তা উভয়কেই তুল্য মূল্য দিয়েছিলেন। মেকিয়াভেলির সেন্টর-এর এই পশুশক্তি আর মানবশক্তি, আদেশ ও প্রভাব, সবলে সমর্থন আদায় আর স্বেচ্ছায় সম্মতিদান—দুই দিকই ছিল।

রাষ্ট্রের এই রূপ অগ্রসর-পুঁজিবাদী দেশে পরিষ্কার। সেখানে ইমারতের সাংস্কৃতিক দিক এত প্রবল যে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দিকটা প্রায়ই ঢাকা থাকে। পুঁজিবাদী শ্রেণীর সমর্থনে সেখানে সব রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দল এগিয়ে গেছে, খবরের কাগজ, রেডিও, সাহিত্য-শিল্প সকলই রাষ্ট্রের বনিয়াদকে, তার অর্থনৈতিক ভিত্‌কে সুদৃঢ় ক'রে তোলে। এই সাংস্কৃতিক প্রকাশ সবসময়েই যে একলব্যের শিক্ষার মতো একমুখী হবে তা হয়ত নয়। আপাতদৃষ্টিতে অনেক সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাই হয়ত পুঁজিবাদী স্বার্থের বিরোধী। এইক্ষেত্রে গ্রাম্‌চি পরিষ্কার একটি সীমারেখা টেনেছিলেন। রাষ্ট্রের মূল শক্তি ধারণ ক'রে আছে বহু কর্মীর কর্ম, তার দুয়েকটি কর্মী ভুল করলেও করতে পারে, দুয়েকটি কর্ম মূলশক্তি-বিরোধী হতেও পারে, কিন্তু সেই বিরোধ সংহারমূলক নয়, সেই দ্বন্দ্ব মূল শক্তিকে ক্ষয় ক'রে দেয় না, বরং এই বিরোধী কর্মগুলো মূল শক্তির আধারকে অক্ষত রেখে পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নেয়। সেইজন্য পুঁজিপতি দেশে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী বুদ্ধিজীবী থাকলেও, সেইসব গণতন্ত্রে বহুর বিকাশ দেখা দিলেও, মূল

একের কোনো বিচ্যুতি ঘটে না। বহুর প্রকাশ দেখে যেসব মার্কসবাদী মূল এক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েন তাঁদের অবধারিত পরিণাম অর্থনীতিবাদী হয়ে যাওয়া।

অনেক সময় অবশ্য এই বিরোধী কর্মগুলি ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে, মূল রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংহারমূলক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। সেই সময় উপস্থিত হয় রাজনৈতিক মুহূর্ত। সর্বহারাদের সেই হল সুবর্ণসুযোগ। এই সময়ে, যখন সাংস্কৃতিক ইমারতের পুঁজিবাদী-বিরোধী কর্মগুলো রাজনৈতিক কর্মগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুঁজিবাদী ভিত্‌গুলো নড়িয়ে দেয়, তখনই বিপ্লবের মুহূর্ত। এই রাজনৈতিক মুহূর্তের জন্য যাঁরা অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নন তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ততাবাদীতে পরিণত হন।

ইতালির ইতিহাসে এই দুর্যোগই ঘটেছিল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পরে ইতালিয় মার্কসবাদীরা হয় অর্থনীতিবাদী, না হলে স্বতঃস্ফূর্ততাবাদী হয়ে পড়েছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা মোটেই সচেতন ছিলেন না। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবীদের বিশ্লেষণ না করার ফলে তাঁরা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইমারত সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন না। যার ফলে ইতালিতে বিপ্লবী মুহূর্তগুলো বিকাশ করার পুরো সুযোগ না দিয়ে, বিরোধী কর্মীদের নেতৃত্বমূলক কর্মী হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে ইতালিয় সোশ্যালিস্ট পার্টি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় ক'রে রেখেছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী যে সঙ্কট তখন ইতালিতে দেখা দিয়েছিল সেসময় সোশ্যালিস্ট পার্টি ইমারতে অবস্থানের যুদ্ধের কৌশল না নিয়ে হয় সুবিধাবাদী রাজনীতিতে মগ্ন হয়েছিল, অর্থাৎ, 'ইতিহাসের অমোঘ বিধানে এ-যাত্রায় বিপ্লব করা গেল না' বলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছিল। ১৯২১ সালে গঠিত ইতালিয় কমিউনিস্ট পার্টিও ঐ একই রোগে ভোগা শুরু করে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নির্দেশের বিরুদ্ধাচারিতা করার সাহস না ছিল সোশ্যালিস্ট পার্টির, না কমিউনিস্ট পার্টির। দুই দলই সবরকম কাজ বন্ধ ক'রে বসেছিল রাজনৈতিক মুহূর্ত আসে নি বলে। লেনিন এদের অবিমৃষ্যকারিতাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন, শুধু সংসদে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে কমিউনিজমকে নতুন চিন্তা গড়ে তুলতে হবে। সোশ্যালিস্ট পার্টির বিরোধিতা ক'রে গ্রাম্‌চি তুরিনে কারখানায় কাউন্সিল গড়ে তুলতে উঠে পড়ে লাগলেন, কমিউনিস্ট পার্টির যাবতীয় কর্ম থেকে স্বেচ্ছানির্বাসনের বিরুদ্ধপ্রচারে সমর্থন খুঁজতে লাগলেন। ১৯২৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এলেন, কিন্তু ১৯২৯-৩০ সালে কমিনটার্নের ভোল পাল্টানোতে বিস্মিত হয়ে লিখলেন: 'ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক অবস্থা কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় তা এরা বুঝতে পারছে না।' কিন্তু পার্টির ভ্রমে, ইতালিতে ফ্যাসিজম রোধ করা সম্ভব হল না—কারণ পার্টি তখনও কৌশলের যুদ্ধ নিয়েই ব্যাপৃত, অবস্থানের যুদ্ধে মাথা ঘামায় নি।

গ্রাম্‌চির বিশ্লেষণে, এখানেই বুদ্ধিজীবীদের অসাধারণ গুরুত্ব। শুধু পার্টি-কর্মী দিয়ে বিপ্লব করা যায় না, বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখা যায় না, তার জন্য চাই সমগ্র জনসাধারণের দীক্ষা। ঐতিহ্যবাদী বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে পারঙ্গম। তাঁরা জনসাধারণের চোখে সম্মানের আসনে আছেন, তাঁদের কথা জনসাধারণ ভক্তিভরে শোনে। গ্রাম্‌চি এইসব পুঁজিপতি ঐতিহ্যবাদী বুদ্ধিজীবীদের বলতেন, অন্যায়কে ন্যায় বলে প্রতিভাত করায় পারদর্শী। তাঁরা তাঁদের উন্নত শিক্ষাদীক্ষা আচার-ব্যবহারের ফলে জনসাধারণের শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকেন। সমাজের আমূল তোলপাড় না হলে এঁদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় না। এঁরা আছেন বলেই পুঁজিবাদীদের প্রতি পদক্ষেপেই জোর খাটানোর প্রয়োজন হয় না, জনসাধারণ স্বেচ্ছায় এঁদের ফাঁদে পা দেন। অবশ্য সমাজে বিক্ষোভ চরমে উঠলে, এঁদের প্রভাব সঙ্কুচিত হয়ে পড়লে, পুঁজিপতিদের পশুশক্তি প্রয়োগ করতেই হয়, যেমন ফ্যাসিজমের প্রকাশ। এমন সময়েই আবির্ভাব হয় সিজারদের মতো রহস্যময় চরিত্র, যাঁরা দেশের স্বার্থকে এগিয়ে নেবার ছলে, দেশকে বড়ো ক'রে তুলছেন, দেশের লোককে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করছেন এই ধারণার সৃষ্টি ক'রে আপন হাতে শক্তি তুলে নিয়ে আবার তাঁদের শ্রেণীশক্তি বৃদ্ধি করেন।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইমারত আর সাংস্কৃতিক ইমারত সুসংবদ্ধ অবস্থায় থাকে। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের আগ পর্যন্ত ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলি তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না, রাজনৈতিক ইমারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ইমারতের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। সাংস্কৃতিক ইমারত তখন অনেকটা স্বাধীনভাবেই গড়ে উঠত। কিন্তু আমলাতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করল, কর্মী বুদ্ধিজীবীদের একনিষ্ঠ সেবার ফলে। বর্তমান গণতন্ত্রগুলোয় সমাজের বিপুল প্রসারের ফলে—তা রাষ্ট্রের নানা অঙ্গের বিকাশের জন্যই হোক বা সাংস্কৃতিক জীবনের বহুবিচিত্র প্রকাশের জন্যই হোক—গণতন্ত্রের রক্ষার জন্য বহুবিধ দুর্গ পরিখা তৈরি হয়েছে। কৌশলের যুদ্ধ অবলম্বন করলে গণতন্ত্রের সামনের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানই ধ্বংস করা যাবে, কিন্তু দুর্গ বা পরিখার কোনো ক্ষতি করা যাবে না। কিন্তু উপনিবেশগুলোতে, অনগ্রসর দেশগুলিতে পুঁজিবাদী সমাজের আত্মরক্ষামূলক এইসব দুর্গ পরিখা নেই, কেননা সেখানে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সত্তাই প্রবল, তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক সত্তা সুসংবদ্ধ হয় নি। যেমন ১৯১৭ সালের আগেকার রাশিয়ায়। সেখানে তখন রাষ্ট্র তার রাজনৈতিক জোরেই শাসন চালাচ্ছিল, তাকে সাহায্য করার জন্য সাংস্কৃতিক সত্তা বিকশিত হয় নি, তাই দুর্গ পরিখাও তেমন গড়ে ওঠে নি। লেনিনের প্রতিভা সেখানে, গ্রাম্‌চির ভাষায়, একাধারে কৌশলের যুদ্ধ এবং অবস্থানের যুদ্ধ অবলম্বন ক'রে বুর্জোয়াদের প্রভাবের রাজত্ব ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছিল। কৌশলের যুদ্ধ অত্যন্ত দুরূহ,

তার পশ্চাতে যদি অবস্থানের যুদ্ধের প্রস্তুতি না থাকে তাহলে জনসাধারণের সমর্থন ও আস্থা পাওয়া যাবে না।

রাশিয়ায় সর্বহারা একনায়কত্ব অর্থাৎ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইমারত দখলের কাজটা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় সহজসাধ্য হয়েছিল, কেননা রাজনৈতিক ইমারতের পিছনে সুসংবদ্ধ সাংস্কৃতিক ইমারতের সহায্য ছিল না। সুতরাং ইয়োরোপের এইসব দেশে পুঁজিবাদী অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে আত্মসংহারের জন্য অপেক্ষা ক'রে বসে থাকা মূর্খতা, কারণ এখানে নিয়তই বুদ্ধিজীবীরা সাংস্কৃতিক ইমারত শক্তিশালী ক'রে তুলে তার রাজনৈতিক ইমারত সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলছে। এইসব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো ধ্বংস করতে হলে দরকার জনসাধারণকে সর্বহারাদের অনুকূলে গড়ে তোলা। এর দায়িত্ব নিতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকে, জীবনের সর্বস্তরে সাধারণ লোককে সর্বহারাদের অনুকূল আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এর জন্য আবার দরকার সর্বহারাদের আপন বুদ্ধিজীবী গড়ে তোলা। শুধু অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য বসে থাকা নয়, বিপ্লবের মুহূর্তে যাতে জনসাধারণ বিপ্লব সংঘটিত করতে পারে এবং সেই বিপ্লবকে দীর্ঘজীবী করতে পারে তার জন্য ব্যাপক সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি। গ্রাম্‌চি এইজন্যই স্বতঃস্ফূর্ততা, সিণ্ডিকালিজম, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নির্দেশিত প্রস্তুতি ছাড়াই জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইত্যাদি সবকিছু বর্জন করতে তাঁর পার্টিসদস্যদের অনুরোধ করেছিলেন। পার্টি, বুদ্ধিজীবী আর জনসাধারণের মিলন না ঘটলে সর্বহারার প্রভাব সমাজে বিস্তারিত হওয়া অসম্ভব, এই ছিল গ্রাম্‌চির সুনির্দিষ্ট ধারণা। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপরেও তাই গ্রাম্‌চির তেমন কোনো ভরসা ছিল না। কেননা ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিককে দেখে কেবলই রুজিরোজগারের কর্মী হিসেবে, তার সাংস্কৃতিক দিকে তার কোনো লক্ষই নেই। এদের দ্বারা রাষ্ট্রচালনার বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ অসম্ভব। এজন্যই তুরিনের কারখানার কাউন্সিলগুলো গ্রাম্‌চি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ট্রেড ইউনিয়নের অঙ্গ হিসেবে নয়, শ্রমিকের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়ক হিসেবে। তুরিনের শ্রমিক কাউন্সিলগুলো তাই ট্রেড ইউনিয়ন বা ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির শাখা হিসেবে গ্রহণ করতে গ্রাম্‌চি প্রস্তুত ছিলেন না। কারখানার উৎপাদনযন্ত্রের স্ক্রু-বল্টু না হয় উৎপাদনের ধারার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাদের দীক্ষিত করায় প্রয়াসী হয়েছিলেন গ্রাম্‌চি। এখানেই সিণ্ডিকালিজমের সঙ্গে তুরিন কর্মী কাউন্সিলগুলোর আমূল প্রভেদ।

বুদ্ধিজীবীদের গ্রাম্‌চি যে বিশেষজ্ঞ ও নেতা এই দুইভাগে ভাগ করেছিলেন, এইখানে তার সার্থকতা। শ্রমিকেরা যতদিন পর্যন্ত উৎপাদনের কাজে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকবে ততদিন তারা সমাজের শক্তিশালী গোষ্ঠীর তাঁবেদার হয়ে থাকবে। যখন বিশেষজ্ঞের কাজ ছাড়াও নেতৃত্ব পদে আসতে পারবে তখনই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে বিপ্লবের সম্ভাবনা। সেইজন্যই গ্রাম্‌চি চেয়েছিলেন, শ্রমিককে তার স্বার্থ

কিছু ত্যাগ ক'রে সমাজের সব লোকের স্বার্থে, বিশেষ ক'রে ইতালির মতো দেশে, কৃষকদের স্বার্থে সংগ্রাম করতে। আহলে এটা খুবই সম্ভব, বিশেষ করে উন্নত পুঁজিবাদী দেশে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশই সুবিধা পেতে পেতে মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থায় আসে। কৃষকদের স্বার্থে উদ্বুদ্ধ না হলে সেখানে শ্রমিকদের নেতৃত্বে বিপ্লব অসম্ভব। আবার কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী না করলে শ্রমিকরাও চিরকাল বিশেষজ্ঞ থেকে যাবে, পুঁজিপতিদের তাঁবেদার হয়েই থাকবে, উৎপাদনের নেতৃত্বে কখনই আসবে না। গ্রাম্‌চির এই বিশ্লেষণ গ্রহণ না ক'রে ইতালিয় কমিউনিস্ট পার্টি শুধু শ্রমিকদের উপর জোর দেওয়ায় ইতালিতে ফ্যাসিজমের বিকাশ সহজ হয়ে উঠেছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষজ্ঞ পদ থেকে নেতার পদে উন্নীত হওয়ায় সাহায্য করতে পারে একমাত্র বুদ্ধিজীবীরাই। তাদের হাতেই সংগঠনের দায়িত্ব। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা ছাড়া জনসাধারণ আপনা আপনিই সংগঠিত হয়ে উঠতে পারে না।

বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক। বুদ্ধিজীবী যেমন জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তোলেন, তেমনি জনসাধারণও বুদ্ধিজীবীকে শিক্ষিত ক'রে তোলে। সমাজে যে রাজনৈতিক দল দিক্‌নির্ণয় করে সেই দল শুধু মাত্র একটি দলই নয়, সেটা হল সমাজের সমবেত বুদ্ধির আধার, জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীর সার্থক সংমিশ্রণ।

বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে গ্রাম্‌চির এই বিশ্লেষণ তদানীন্তন ইতালিতে প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইতালিয় কমিউস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক বর্দিগার ধারণা ছিল, শিক্ষার মাধ্যমে কেউ সোশ্যালিস্ট হয় না, অবস্থার চাপে হয়। সোশ্যালিস্ট পত্রিকার সম্পাদক মারিয়া জিউদিসের মতে, যখন জনসাধারণ সোশ্যালিস্ট ধারণায় অনুপ্রাণিত হয় তখনই সোশ্যালিস্ট কর্মে নিযুক্ত হয়। গ্রাম্‌চি বললেন, এই দুটো ধারণাই ভুল। শ্রমিককে সোশ্যালিস্ট শিক্ষায় দীক্ষিত ক'রে তোলাটাই সবচেয়ে বড়ো কথা, অবস্থার চাপে বা আপনা হতেই মানুষ সোশ্যালিস্ট হয়ে ওঠে না। সোশ্যালিজম একটি বিজ্ঞান, তা অনুধাবন করার জন্য, অনুসরণ করার জন্য, দীক্ষার প্রয়োজন। তাই তিনি লিখেছিলেন, প্রত্যেকটি বিপ্লবের আগে দেখা গেছে তীব্র বুদ্ধিশীলতার চর্চা, সমাজে নতুন চিন্তার অনুপ্রবেশ। সংস্কৃতি শুধু বিশ্বকোষ অধ্যয়ন নয়, সংস্কৃতিবান লোক এই তথ্যপঞ্জি মুখস্থ-করা লোক নয়। সংস্কৃতির অর্থ, বুদ্ধিশীলতার অর্থ, পুরো সমাজকে নতুনভাবে ভাবতে শেখানো।

আন্তোনিও গ্রাম্‌চির জন্ম হয়েছিল ১৮৯১ সালে সার্দিনিয়ায়। গরীবের ঘরে জন্মে গ্রাম্‌চিকে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই টাকা রোজগার ক'রে কেরানি বাবাকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করতে হতো। অবশ্য পড়াশুনায় ভালো থাকার

জন্য তিনি স্কলারশিপ পেয়ে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়ার সুবিধা পেয়েছিলেন। তোগলিয়াত্তি এই সময় তাঁর সহপাঠী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বেনদেত্তো ক্রোচের দর্শন তাঁকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর তাঁর জীবনদর্শন সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ শুরু হয় তাঁর। এই সময়েই মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের লেখার সান্নিধ্যে আসেন তিনি, এবং তিনি মনে করতে থাকেন মার্কসবাদের মধ্যে সমগ্র জীবনের দর্শনালোচনা আছে।

১৯১৭ সালের পর সর্বহারা একনায়কত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হল সোভিয়েতের মাধ্যমে। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির উপায় সোভিয়েত, স্ব-রাষ্ট্রের উপায় সোভিয়েত। এই ধরনের সোভিয়েত গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় গ্রাম্‌চি ব্যাপৃত হলেন তুরিনে—তুরিন কারখানায় কাউন্সিল গড়ে তুলে। এর আদর্শ প্রচারের জন্য গ্রাম্‌চি ১৯১৯ সালে খবরের কাগজ বার করলেন, *Ordine Nuovo*, যার অর্থ হল নতুন বিন্যাস। কাউন্সিলগুলো শুরু হয়েছিল শ্রমিকদের চাকরির স্বার্থের উন্নতিকল্পে, কিন্তু গ্রাম্‌চির নেতৃত্বে সেগুলো কিছুদিন পরই কারখানা দখল; কারখানা চালানোর কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। অবশ্য মালিকপক্ষ থেকে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ এল, কাউন্সিলগুলো ভেঙে দেওয়া হল, তার প্রতিবাদে ইতালির শ্রমিকেরা ১১ দিন ধর্মঘট করলেন, কিন্তু ধর্মঘট সফল হল না। দুবছরের সাধনা নিষ্ফল হল গ্রাম্‌চির।

এই সময় ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টিতে স্বতস্ফূর্ততাবাদী মার্কসিস্টদের প্রাধান্য। তাঁদের ধারণা, ইতালিতে বিপ্লব এমনিতেই আসবে, আসতে বাধ্য, ইতিহাসের অমোঘ গতিতে। আরেক দল সোশ্যালিস্টের ধারণা বিপ্লবের সময় হয় নি, সুতরাং শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া যেন তুঙ্গে না ওঠে, সেদিকে নজর রাখাই একমাত্র কর্তব্য। এই দুই শিবিরের অশুভ নেতৃত্ব থেকে শ্রমিকদের বের ক'রে নিয়ে আসার জন্য গ্রাম্‌চি তাঁর খবরের কাগজে নতুন প্রোগ্রাম ঘোষণা করলেন। লেনিন তাঁকে সমর্থন করলেন। গ্রাম্‌চি ঘোষণা করলেন, এই মুহূর্তে যদি শ্রমিক এবং কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার চেষ্টা না করে তাহলে ফ্যাসিজমের আক্রমণে সোশ্যালিস্ট পার্টি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এটা হল ১৯২০ সালের মে মাসে।

এর পর গ্রাম্‌চি সম্পূর্ণ মন দিলেন তাঁর খবরের কাগজের মাধ্যমে শ্রমিকদের গড়ে তোলায়। শ্রমিকদের বুদ্ধিশীলতার উপর তাঁর পুরো আস্থা ছিল, সুতরাং মাস্টারমশাই হয়ে তাঁদের গুরুবচন শোনানোর কোনো তাগিদ তাঁর ছিল না। বরং রাশিরাশি চিঠি শ্রমিকদের কাছ থেকে আসতে লাগল তাঁর কাছে, তাঁর সংবাদপত্রের অফিস হয়ে উঠল শ্রমিকদের আলাপ-আলোচনার জায়গা। গ্রাম্‌চি ইতালির শ্রমিক-সমাজে সবচাইতে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হয়ে উঠলেন।

এরই সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্‌চি সোশ্যালিস্ট পত্রিকা *Avanti*র স্থায়ী নাট্যসমালোচক ছিলেন। পিরানদেল্লোর নাটকের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনিই প্রথম লেখেন। জেলে থাকার সময় দান্তের ইনফার্নোর উপরও তাঁর আলোচনা আছে। কিন্তু গ্রাম্‌চি যা লেখেন বায়ুভুক বুদ্ধিজীবীদের মতো তা সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের। তাঁর লেখা শ্রমিকদের-প্রতিনিধি বুদ্ধিজীবীর লেখা।

১৯২১ সালে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হল। পার্টির নেতৃত্বে এলেন বর্দিগা। বর্দিগার সঙ্কীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে গ্রাম্‌চি প্রথম থেকেই খড়্গহস্ত। বার্দিগার ধারণা ছিল ফ্যাসিজম নতুন কিছু নয়, বুর্জোয়া শাসনের আর একটা রূপ, সুতরাং এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন কোনো অস্ত্রের দরকার নেই। কিন্তু ফ্যাসিজম রোধ করার জন্য যাবতীয় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শক্তির মিলিত যুক্ত-ফ্রন্টের দুর্বার প্রয়োজনের কথা গ্রাম্‌চি প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন। ১৯২৪ সালে গ্রাম্‌চিকেই পার্টি সম্পাদক করা হল। কিন্তু ততদিনে ফ্যাসিস্ট অত্যাচার শুরু হয়ে গেছে। *Ordine Nuovo* বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। সোশ্যালিস্টদের খুন করা শুরু হয়েছে, সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এরই মধ্যে পার্লামেন্টের নির্বাচন হল, সোশ্যালিস্ট এবং কমিউনিস্টদের পার্লামেণ্ট সংখ্যাধিক্য ঘটল। গ্রাম্‌চিও নির্বাচিত হলেন। পার্লামেণ্ট বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। গ্রাম্‌চি ফ্যাসি-জমের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের ডাক দিলেন, কিন্তু ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা এল। কমিউনিস্টদের একঘরে ক'রে দেওয়া হল। এমন কি সোশ্যালিস্টরাও গ্রাম্‌চির ফ্যাসিজম-বিরোধিতাকে বাড়াবাড়ি মনে করতে লাগলেন। গ্রাম্‌চি তখন শ্রমিক-কৃষক সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন। এমন সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯২৬ সালের ৮ই নভেম্বর গ্রাম্‌চি গ্রেপ্তার হলেন। বিচারের প্রহসন হল। পাবলিক প্রসিকিউটর গ্রাম্‌চির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওঁকে প্রকাশ্যে চিন্তা করতে দেওয়া যাবে না, অন্তত কুড়ি বছর ওই ব্রেনকে থামিয়ে রাখা প্রয়োজন। কারাগারজীবনের যাবতীয় অত্যাচার চলল গ্রাম্‌চির উপর, ভদ্রভাবে, অভদ্রভাবে। মৃতপ্রায় গ্রাম্‌চিকে ছাড়া হল ১৯৩৭ সালে। জেল থেকে বেরিয়ে সাতদিনের মধ্যে গ্রাম্‌চি মারা গেলেন।

এই এগার বছর জেলের মধ্যে গ্রাম্‌চি খোপনে বত্রিশটা নোটবইয়ে ২৮৪৮ পৃষ্ঠা তাঁর ভাবনাচিন্তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ইতালিয় সমাজকে নতুনভাবে কী ক'রে গড়ে তোলা যায়, বিশেষ ক'রে তার সাংস্কৃতিক সত্তাকে, এবিষয়েই তিনি বেশি ভাবতেন। ইতালির ইতিহাস তিনি নতুন ক'রে লিখেছিলেন। মেকিয়া-ভেলি সম্পর্কে তাঁর ধারণা, উনিশ শতকে ইতালির স্বাধীনতালাভের যুদ্ধ, ইতালির মানুষের সংস্কার ও উপকথা, ক্যাথলিক চার্চের স্থান, ক্রোচের দর্শন, বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন, সাংবাদিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর মতামত এইসব লেখায় গুরুত্বপূর্ণ

স্থান নিয়েছে। গ্রাম্‌চি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লিখতেন, পুনর্বিবেচনা করার সময় পেতেন না, বাক্য শেষ করার অবকাশ ছিল না, সেন্সরের ভয়ে সবকথা খুলে লিখতে পারতেন না, মার্কস বা লেনিনের নাম করার উপায় ছিল না।

গ্রাম্‌চির এই লেখাগুলো প্রকাশিত হতে শুরু করে যুদ্ধ থেমে যাবার পর। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পর এবং ১৯১৭-২০ সালে যুদ্ধ-পরবর্তী ইয়োরোপীয় বিপ্লবের সম্ভাবনা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয়তার পর ইয়োরোপে সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলোতে সংশোধনবাদীদের আধিপত্য, পার্টিগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র দলাদলির ফলে ইয়োরোপে নতুন তাত্ত্বিক এবং কর্মীর প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। পরিবর্তমান জগতে মার্কসবাদের বুলি আঁকড়ে না থেকে নতুন পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের নতুন ক'রে প্রয়োগ করায় যাঁরা সার্থক হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইতালির অন্তোনিও গ্রাম্‌চি সর্বপুরোভাগে। তত্ত্বে এবং কর্মে, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মধ্যে বিপ্লবী কর্মের ও বিপ্লবে কর্মীদের একনিষ্ঠ সাধনার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিতে গ্রাম্‌চি যুদ্ধপরবর্তী মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের অগ্রগণ্য। নতুন সমস্যার নতুন সমাধান, মার্কসবাদের নতুন প্রয়োগ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নতুন অন্তর্দ্বন্দ্ব, মার্কসবাদকে অর্থনীতিবাদে আটকে না রেখে পুরো জীবনদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা—এইসব গ্রামচি লেখার মূল লক্ষণ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অন্তত তিনটি তত্ত্ব গ্রাম্‌চি আরো বিশ্লেষণ ক'রে, বিশদ ক'রে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এক, রাজনৈতিক দলে আমলাতন্ত্র। দুই, সমাজে বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব। তিন, ইতিহাস দর্শন। অগ্রসর-পুঁজিবাদী সমাজে সর্বহারা বিপ্লবের চরিত্র বিশ্লেষণে গ্রাম্‌চি মার্কসবাদীদের পুরোধা।

লেনিন এবং লেনিনবাদ সম্পর্কে গ্রাম্‌চির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, যদিও লেনিনবাদের সঙ্গে গ্রাম্‌চির বক্তব্যের একটি বিরাট পার্থক্য আছে। গ্রাম্‌চি বলেছেন, শ্রমিকদের মুক্তি পেতে হবে তাদের আপন চেষ্টায়, আপন বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবে। লেনিন যে নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের কথা বলেছেন তাঁরা শ্রমিকদের মধ্য থেকে না এসে বুর্জোয়াদের মধ্য থেকেও আসতে পারেন, কিন্তু গ্রাম্‌চি জোর দিয়েছেন শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীদের উপর। গ্রাম্‌চির egemonia (hegemony, প্রভাব) তত্ত্বের বক্তব্যই এই : শ্রমিকশ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠে পুরো সমাজের চেহারাই শ্রমিকশ্রেণীর অনুকূল ক'রে দেবে। এই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে লেনিন-কথিত ভ্যানগার্ড-এর আমূল পার্থক্য। এবং লেনিন-কথিত সর্বহারা একনায়কত্বের সঙ্গেও গ্রাম্‌চির egemonia-র পার্থক্য আছে। গ্রাম্‌চির আদর্শ সর্বহারা একনায়কত্ব নয়, সর্বহারাদেরই জগৎ, সেখানে অন্য কারও স্থান নেই। সেটা একটা সম্পূর্ণ সভ্যতা। সমাজতান্ত্রিক দল বহুদলের একটি দল নয়, সমাজতান্ত্রিক দলই একমাত্র দল।

গ্রাম্‌চি-র রচনায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ও বাংলা ভাবানুবাদ : ইন্টেলেকচুয়াল—বুদ্ধিজীবী ; অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল – কর্মী বুদ্ধিজীবী ; ট্র্যাডিশনাল ইন্টেলেকচুয়াল – ঐতিহ্যবাদী বুদ্ধিজীবী ; স্পেশালিস্ট – বিশেষজ্ঞ ; ডিরেকটার – নেতা ; হেজিমনি – প্রভাব ; পোলিটিকাল সোসাইটি – রাজনৈতিক ইমারত ; সিভিল সোসাইটি – সাংস্কৃতিক ইমারত ; ওয়ার অফ ম্যানুভার – কৌশলের যুদ্ধ ; ওয়ার অব পজিশন – অবস্থানের যুদ্ধ।

---

*Antonio Gramsci, *The Prince & Other Writings*, International Publishers, New York, 1967.

John Merrington, 'Theory and Practice in Gramsci's Marxism', *The Socialist Register 1968*, The Merlin Press, London, 1968.

John M. Cammett, *Antonio Gramsci and the Origins of Italian Communism*, Stanford University, California, 1967.

কবিতা

দুর্লভ

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

যেন অলৌকিকভাবে থেমে গেছে হঠাৎ এ দুপুর।
কিছু করো এসময়
এই তো সময়
অভিযাত্রা অথবা মৃত্যুর।
তুমি কি সন্ধির শর্তে আস্থাবান?
খোলো তবে শিরস্ত্রাণ
নামাও বন্দুক।

খুব থেমে গেছে এ দুপুর
এ সময় আত্মসমর্পণ এত সোজা
লক্ষ্যভেদ সুনিশ্চিত, দিগ্বিজয় অবশ্য অমোঘ
এই তো সময় খুলবার
অনির্বার রহস্যের মুখ।

আচম্বিতে স্থির এ দুপুরে
মনে হয় শোনা যাবে—
শোনা যাবে পদশব্দ
আর সেই আশ্চর্য নূপুর।

ঠিক শূন্যতা নয়

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

গোলাপ আর রজনীগন্ধা, এই দুরকম ফুলের গন্ধের মাঝখানে সামান্য ফাঁক থাকে
তা ঠিক শূন্যতা নয়, হয়তো বিশ্রাম কক্ষ
কিংবা হাত বাড়াবার জন্য নিরাপত্তামূলক ভূখণ্ড।
এখানে প্রভাত এবং গোধূলি দুই-ই আসে
এবং শিশির পতনের মতো নিঃশব্দ কথাবার্তা হয়।

নিদ্রা এবং জাগরণ, এর মধ্যবর্তী এক অদ্ভুত জ্যোৎস্নায়
আয়না তুলে যে ক'জন মুখ দেখেছে
তারা জল এবং শীতলতার মাঝখানের পথ খুঁজে নিয়ে
নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ।
ক্বচিৎ বাতাসে তাদের সুখ-অসুখের সংবাদ আসে
আমরা কেউ তাদের চিঠি দেই নি
সংবাদপত্রে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনও নয়।
মাতৃগর্ভ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী নিরালায়
এদের জন্ম বলেই এ-সব ঘটছে।
গোলাপ আর রজনীগন্ধা, এই দুরকম ফুলের গন্ধের মাঝখানে সামান্য ফাঁক থাকে
তা ঠিক শূন্যতা নয়।

আকাশ আমার কাছে

কাজল ঘোষ

আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল
সূক্ষ্ম এক তারের সোপান বেয়ে
অনেক উপরে
অনেক নীলের দেশে
আকাশ দেখেছি।

দেখেছি অনেক তারা
দু'চোখের মায়া ত্যাগ ক'রে
আকাশে মিশেছে ;

পরিবর্তে দু'টি বিন্দু
হতাহত ক্লিষ্ট স্কন্ধে চড়ে
রামায়ণ পার হয়ে
আরো দূরে, আরো দূরে —
বিস্তারিত মাঠঘাট
নিশ্চুপ পর্বতের চূড়া
অনায়াসে — অতিক্রম করে।

হৃদয়ের খুব কাছে
বড় এক গভীর জ্যোৎস্না
তারা কেউ হাতে তুলে
দেবে না আকাশ।

বিলম্বে মনসুন

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে দু'টি মাস
আকাশের আড়ালে কম্বলে গা ঢেকে
ওৎ পেতে ছিলেন মনসুন ;
আটুই জুলাই মধ্যরাত্রে তিনি আতর্কিতে সমরে নামলেন।

ঘোড়ার খুরের উৎক্ষিপ্ত ধুলোয় ভরে গেল রাজধানী
রাজধানীর অনেক উত্তপ্ত কোটর ;
সারি-সারি প্রহরী বৃক্ষেরা
একে-একে ধরাশায়ী হোল, ঘর্মাক্ত মানুষ
ও অন্যান্য প্রাণীরা বৃষ্টির প্রহারে জর্জর
ও পলাতক মাটির গহ্বরে।
সমস্ত রাত যুদ্ধ ক'রে, জিতে, মনসুন অন্য দেশে পাড়ি দিলেন।

অনেক ছোট-ছোট কলহ ও তিক্ততা
ঘামাচির মতো বিরক্তির অনেক যন্ত্রণা ও বিদ্বেষ
ভুলে গিয়ে — পরের দিন, নই জুলাই সকালে
এক দল পরাজিত তৃপ্ত ঠাণ্ডা মানুষ
আততায়ী মনস্থনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় উপরে চোখ মেললো।

হয়তো সমস্ত কল্যাণ আসে মধ্যরাত্রে এমনই অদ্ভুত ছদ্মবেশে।

অনেক দিন পর

শিবশম্ভু পাল

অনেক অনেক দিন পর
সমস্ত শরীর কের যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে গেছে
প্রখর সূর্যের মধ্যে কখন আঁধার ঘনিয়েছে
আঁধার কখন হয় কঠিন পিঞ্জর
তোমার মুখশ্রী থেকে সরে আসে ভয়ে ভয়ে বৈশাখের ঝড়
ক্রমশ গুটিয়ে যায়, সরলীকরণ নিল বেছে
জলপড়ে-পাতানড়ে পারম্পর্যে বেঁচে
ভুলেছে প্রান্তর।

আবার ঝড়ের চাপা শব্দ শুনি, প্রান্তরের স্মৃতি
আছড়ে পড়ে পিঞ্জরের লোহার গরাদে
আবার তোমাকে দেখি ছাদে
পিছনে প্রকৃতি
চালচিত্র মেলে ধরে, দুর্গমতা, পর্বতের সানু
স্বাস্থ্যের গোপনে তুমি ছড়িয়েছ পরাক্রান্ত রোগের বীজাণু।

প্রহরী

নিমাই চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃত চৈতন্যের পথে কেউ নেই।
আমরা কয়েকজন লেঠেল
পাহারা দিচ্ছি শস্যের মাঠ।
অথচ অজন্মার শোষ সারা গায়ে তার—
শুধু ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে বহুরূপী গিরগিটি,
আর আসে বর্ণময় রোদ, চলে যায়,
আসে চাঁদ প্রেতিনী সহচরী নিয়ে, চলে যায়,
ডাইনি-পাওয়া নাচ শেষে রেখে যায় আগুনের ফণা,
অঢেল চুম্বন তার সারাক্ষণ ক্ষতমুখে।
ভূতগ্রস্ত পাহারা তবু লুঠেরার ভয়ে,
অথবা মৌসুমী হাওয়ার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে প্রথমেই—
ঘূর্ণিঝড় থেমে গেলে
ধুলোর সড়ক ধরে বৃষ্টি এসে মাঠ ঘিরে নেবে,
বজ্রাঘাতে মরা গিরগিটি লুটোবে কাদায়,
আগুন পাতালে যাবে।
অনন্তর বীজময় মাঠে অঙ্কুর অস্থির হবে ;
কোষেকোষে ভীষণ দামামায় বেড়ে
শস্যের শীষ রঙ্গিনী বাতাসে ;
তারপর গোঁয়ার ষণ্ডদের ভয়
নিবিড় আবাদী ক্ষেতে।
তাই লাঠি, তাই স্বপ্নেও সজাগ পাহারা,
বিস্ময়ের অগাধ কোণে বিপন্ন পা-ডুবিয়ে বসা।

পর্ণমোচী অরণ্য

কবিভূষণ আচার্য

প্রতিবারই পুনর্জন্ম পাতার মুকুট ছেড়ে ছেড়ে
পর্ণমোচী অরণ্যের। প্রতিবারই মনে হয়
আজকের কবিতাই পৃথিবীর শেষ কথা বুঝি
আর কোনো চক্রবাক্ প্রিয়তর আর কোনো
দিক্‌চক্রে দস্যুর মতন সোনা খুঁড়বে না
এবার বিশ্রাম অন্ধকার হিম মর্গে
হাত-পা ছড়িয়ে বেশ তেজালো দুধেল স্মৃতি
উদ্‌গিরণ করা যাবে বেশ
হেঁলে সাপ, গিরগিটি, পেঁচা ও ইঁদুরদের সাথে
এক জয়েন্ট ফ্যামিলি।

হেমন্তের ফেরিঅলা নাম ধরে ডাক দেয় অমোঘ নির্মম
বীজের গভীরে ভ্রূণ বিজ্ঞস্তনে চেয়ে থাকে ডালভাঙা ক্রোশ
আরো দূর অরণ্যের শব্দহীন বনরক্ষী ছাড়পত্র হাতে তুলে দ্যায়
তারপর সংরক্ষিত অরণ্যের দ্বার খোলে
শব্দ হয় শব্দের ভিতরে।

আঁধারে হরিণ ডাকে, জল খাবে – পিপাসার জল
উপকণ্ঠে শাদা নুন, আমাদের হৃদয়ে হরিণ
বাতাসে উচ্ছিষ্ট পাতা আজ রাতে ছাই হবে
হঠকারী অরণ্য-চিতায়।

প্রতিদিন মৃত্যু হয় এবং প্রতিটি মৃত্যু পরিণত
সুপরিকল্পিত
প্রতিদিন জন্ম হয় আমাদের প্রতি জন্ম অনবধারিত
প্রতিপ্রেম আমাদের হৃদয়ের চেয়েও মহান্
নাটকের প্রতি দৃশ্যে আমরা খোলস ছাড়ি
সাপেদের মতো কিংবা
পর্ণমোচী অরণ্যের মতো।

বিবিজানের মূর্তি

সুব্রত চক্রবর্তী

কপালে সিন্দূর-টিপ, – বসে আছো সমুদ্র-বাতাসে
ধাতুর মূর্তির মতো, বিবিজান, তোমার নূপুর
প্রবাসের নোনাজলে ডুবে আছে ; নিবিড় কোরাসে
রাত্রির সিন্দূর

গান। আর ভবঘুরে পাখি একা, দীন
অন্ধকারে ডাকে অই, – অন্ধকারে চাঁদ নেমে আসে
জলস্রোতে ; ভেসে যায় উজ্জ্বল কফিন –
কালো-নৌকা আড়াআড়ি ভাসে !

এক-ঝাঁক নীল মাছি উড়ে এলো। সমুদ্রের শোক
সমুদ্রের সব সৌখিনতা
টের পেয়ে থেমে গেছে ওদের দু'চোখ।
নিভন্ত চিতার

ছাই ওড়ে, অগ্নিকণা – মৃতের সম্বল !

প্রবাসের নোনাজলে চরণ ডুবিয়ে তুমি বসে আছে স্থির ;
ধাতুর মূর্তির মতো এমন ঝল্‌মল্ –
বিবিজান, তোমার শরীর।

সম্রাজ্ঞী

রত্নেশ্বর হাজরা

পুতুল তোর ঘরে আছে কিংবা তুই-ই পুতুলের ঘরে
বলা মুস্কিল—
এটাও হতে পারে ওটাও অসম্ভব না
যদি বলি : তোর মন উড়ছে
বেলুন স্থির
কিংবা আকাশ বা সমুদ্র কোনোটাই নীল নয়
তোর চোখের রঙই অমনি
তাহলেও বোধহয় ভুল হবে না।

মধ্যরাত্রে কে আগে জাগলো তুই না বাঁশি
বুঝলাম না আজও
সময়মতো কার ঘুম ভাঙে
কে কাকে জাগায়—
তখনকার গন্ধটা বাতাবীলেবুর ফুল থেকেই এসেছিল—
না বাতাসই ছিল ওরকম—
কেন চিৎকার করলি : হাওয়া বন্ধ ক'রে দাও
আমার অঙ্গ জ্বলছে!

পর্বতশৃঙ্গ দেখেই তোর বুক গড়ে উঠলো বিশ্বাস করি না
বরং তোর বুক দেখেই পাথর ভেবেছিল
অমনি হবো—
বলছি তো : সমুদ্র নয় আকাশও না
তোর চোখের রঙই অমনি
কিন্তু কে কাকে চেনায়
বলা মুস্কিল।

বীজমন্ত্র ঝরে যায়

দেবারতি মিত্র

পাহাড়চূড়ার দিকে একা ছুটে উঠতে উঠতে
পাথুরে হয়েছে মাটি কখন রুক্ষ হয়েছে আলো
আমি তো দেখি নি আমি তো শুনি নি গান হাওয়ায়
হলুদ ফুলের বীজ কার মুঠো থেকে ভেসে এল।

আমাকে ডেকেছ তুমি জানো ঠিক কবে
আমার জীবন কোথা থেকে শুরু হবে,
ছড়িয়ে দিয়েছি তাই তাই চারিদিকে বীজমন্ত্র
পাকে পাকে ধীরে ধীরে আমাকে জড়ায় বন্ধ্যা অভ্র
তোমার পায়ের কাছে ঝরে সারাদিন ঝরঝর্—
সেখানে কোথায় মাটি, আজ দেখি সে সব পাথর।

দুপুরে

ভাস্কর চক্রবর্তী

দুপুরে এমনভাবে জানলার কাছে আর কখনও বসি নি
বৃষ্টি নেই, পাতা ঝরে
তিনটে পিঁপড়ে এসে আমার খবর নিয়ে চলে যায় ফের
জ্বলে ওঠে শূন্য ঘর, জিভ, আর
এই যে হঠাৎ
সব শব্দ থেমে যায়—কর্কশ দুপুরবেলা ভরে যায় পাপে—

টবের মাটিতে আজও দুই পা ডুবিয়ে, হাত ছড়িয়ে দাঁড়ালে
শরীরে কি ফুল হবে ?
আঙুলের থেকে পাখি, উড়ে যাবে, দুরূহ আকাশে ?
আরও দূরে, যায় প্লেন — পাখা বন্ধ
হয়ে আসে, দুপুরে এখন —
সব দূরে গেছে আজ উপমাও যায় দূরে, উৎকীর্ণ দিন।

মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে

দেবী রায়

তোমার কাছে আসতে হলেও সম্পূর্ণ নিরাবরণ স্বাধীনতা চাই
চোখ থেকে চশমা খুলে মন খারাপ ভাবাও একধরনের
গোলমেলে অস্থির মন ও খারাপ অভ্যাস, আমি অ-ব্যস্ততা
ও ব্যস্ততার মধ্যে
ঝুলে আছি, সুস্থতা-অসুস্থতার মাঝামাঝি
কেবলি নিজের দিকে প্রেতচোখে তাকিয়ে, ঘরফাটানো বিশাল
শিরদাঁড়া-সোজা-পুরুষ হাসি বিস্মরণ বহুদিন, এখন আমার
মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে 'বেঁচে থাকা বেঁচে থাকা খেলা' —
ঘড়ির শব্দে চমকে যাই খুউব, একবুক অসন্তোষও উপেক্ষা ক'রে
পুড়ে যায় হাতের সিগারেট
এবং শব্দ নেড়েচেড়ে ফুরিয়ে-সময় কাটাই
অবৈধ-অন্ধকারে কোণঠেসে মুখোমুখি নিঃশ্বাস বিনিময়ের
নামই ভালোবাসা, ভুল বোঝাবুঝির অর্থ মাঝখানে বালিশ
চোখচেয়ে ভালোভাবে তাকালেই বোঝা যায় মানুষের সঙ্গে মানুষের
এবং মানুষীর এবং আমার অপ্রিয়-ঋবধান, এভাবে এই সবি লক্ষ্য ক'রে
আমারো স্তম্ভিত-সময় গুরুত্ব বুঝে নির্বিবাদে কেটে যায় ॥

এখানে এখন

যোগব্রত চক্রবর্তী

গভীরতা ছিঁড়ে খায় প্রাচীন মাছের সেই টোপ
হারিয়ে গিয়েছে কবে ছেলেবেলা—
ঢেউহীন সাজানো পুকুর !

লটাইয়ের সুতো ছিঁড়ে চলে গেছে
বয়স্ক বাতাস
এমন শুধুই অবসর
যখন যেখানে থাকি সেই তো সংসার
অথবা বৈরাগী অন্তমতে—
পাতালের বুক চিরে উঠে আসে
সবুজ নিশান
কবে অন্ধকারে একা জামতাড়া যেতে গিয়ে
চলে গেছি সোজা বর্দ্ধমান—

এই ক্রমবর্দ্ধমান সুখ
নিম্নস্বরে বলা যায় সাজানো অসুখ
সময়ের হাতে বাতিদান—

পার্ক স্ট্রীট জেগে উঠে চড়া দাম হাঁকে
দু মিনিট এখানে দাঁড়ান—

দুই স্তবক

সামসুল হক

এক চশমার দুটি কাচের মধ্যে একই
বুকের পুতুল আজন্মকাল কেবল দেখি,
এক চশমার দুটি কাচের মধ্যিখানে
এক জননী দাঁড়িয়ে আছে অভিমানে।

শুধু প্রেমের এক কবিতা, ভালোবাসা
বুকের ভিতর গুমরে ওঠে দুই স্তবকে,
একটি সুরের দিন-রজনী যাওয়া আসা
গানের মতো ছড়িয়ে থাকা দুই শোলোকে।

পাহাড়ের স্মৃতি থেকে

অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়

বেগুনী সন্ধ্যার ক্রোড়ে ইচ্ছার পরিত্যক্ত শিশু
কখন ঘুমিয়ে পড়ে। কখন জটিল রাত আধভাঙা লণ্ঠন দুলিয়ে
ঝুলিয়ে ক্রূর চোখে জেগে থাকে আকাঙ্ক্ষার জানালার নীচে।
চিহ্নহীন কুয়াশায় হৃদয়ের স্মৃতি হয়তো কোথাও আছে
এই ঘর পর্বত ঝাউবন মৃত্তিকা গভীরে। অথবা বিচ্ছিন্ন
পাখা পাখিদের মতো সুদূর সাভানা বনে প্রতীক্ষিত
ফসিলের অবিকল রূপে।

তারপরে যাদুঘর হিমান্বিত পরিচ্ছন্ন
স্মৃতি-দেহ নিয়ে সমতল জীবনের প্রচণ্ড উল্লাসে
কখন বিলীন হবে : একদিন হারাবে নিজেকে।

পত্রিকার কথা

১৩৭৬-এর শারদীয় এক্ষণ প্রকাশিত হল।

এই সঙ্গেই পত্রিকার সপ্তম বর্ষের আরম্ভ। এই সংখ্যার মধ্যে একাধিক সংখ্যাকে সংযুক্ত করা হয়েছে—তা শুধু সময়গত ব্যবধান পূরণ ক'রে নেওয়ার প্রয়োজনেই, এ জন্য গ্রাহকদের কোনো ক্ষতি স্বীকার করতে হবে না।

ছাপাখানার বিশৃঙ্খলায় শারদীয় সংখ্যার লেখকদের কাছে এবার প্রুফ সংশোধন করতে পাঠানো সম্ভব হয় নি,—তাই কোনো কোনো রচনায় মুদ্রণপ্রমাদ ঘটে থাকলে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণই আমাদের।

এক্ষণের পরবর্তী সংখ্যা নভেম্বরের শেষে প্রকাশিত হবে আশা করা যাচ্ছে। যে সমস্ত গ্রাহকের চাঁদা শেষ হয়ে গেছে তাঁরা পুনরায় চাঁদা পাঠিয়ে পত্রিকা পাঠানো অব্যাহত রাখতে সহায়তা করুন।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, গত কয়েক বছর যে সমস্ত উৎসাহী পাঠক সময়মতো এক্ষণ সংগ্রহ করেন নি, তাঁদের পত্রিকা দেওয়া পরে আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই পত্রিকার গ্রাহক হওয়া বা প্রকাশমাত্রই সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়।

এক্ষণের সমস্ত সহযোগী, শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর্গ এবং গ্রাহক ও পাঠক-বর্গকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই।

—

মুদ্রণে সহায়তা

ইণ্ডিয়ান ফোটো ইনগ্রেভিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

বাঁধাই করেছেন

গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স

৭১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯

শ্রীপ্রবীর ঘোষ কর্তৃক বাণিজ্য প্রেস ৩।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।